নয়ান বৌ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৩৫৩

—পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীঅখিল গাঙ্গুলী

মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকা।
[illegible] প্রেস, ৩০, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিঃ ৬ হইতে শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মু

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু।

ব. ভ. ম.

ঃ গ্রন্থকারের অন্যান্য বই ঃ

রাণুর প্রথম ভাগ
রাণুর দ্বিতীয় ভাগ
রাণুর তৃতীয় ভাগ
রাণুর কথামালা
কথাচিত্র
বর্ষায়
বসন্তে
চৈতালী
শারদীয়া
হৈমন্তী
বরযাত্রী
নীলাঙ্গুরীয়
স্বর্গাদপি গরীয়সী
বাসব
দৈনন্দিন
লঘুপাক
রূপান্তর
হাতে-খড়ি
অষ্টক
আগামী প্রভাত
দুয়ার হতে অদূরে
সরস গল্প
—ইত্যাদি

ব্যাপারটা আরম্ভ হোল ঠাট্টা-বিদ্রূপে, তারপর একটু জেদাজেদীতে গিয়ে দাঁড়াল; তারপর হঠাৎ কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল দুজনার কেউই ভেবে ঠাহর ক'রে উঠতে পারছে না।

ননদ টগর বলল—"সুন্দর হওয়াও এক বিপদ—একটা যেন দায় প'ড়ে যায় মুখটা সবাইকে একবার দেখিয়ে দিতে হবে।"

কনে-বৌ নয়ান কোন উত্তর দিল না, উত্তর দিলেই তো কথাটা ঘাড় পেতে নিজের ওপর নেওয়া: ঠোঁটের কোণে একটু যে হাসির আভাস ফুটে উঠছিল সেটাকে পিষে নিয়ে যেমন সুপুরি কুচুচ্ছিল, কুচুতে লাগল।

টগর বলল—"তোমায়ই বলা হচ্চে গো ঠাকরুণ। উঠোনের মাঝখান দে' গাঁয়ের রাস্তা, ঘোমটাটুকু একটু টেনে দিয়ে বোস'।"

কপালের মাঝামাঝি ঘোমটার পাড়টা নেমে এসেছে, সেটুকুও সিঁথির ওপর তুলে দিয়ে, একটু মুচকি হেসে সুপুরি কুচুতে লাগল কনে-বৌ। টগর বিস্মিত দৃষ্টি তুলে বলল—"ওমা, ঝাঁপ যে আরও ভালো ক'রে উঠে গেল!"

"দায়ে খালাস হতে হবে তো? ভালো ক'রে না দেখে নিলে আবার ঘুরে ফিরে আসতেই থাকবে যে।"

এবার একটু হেসেই উঠল।

টগর একটু যে চুপ করল, তাতে যেন মনে হোল কথাটুকু বেশ মিষ্টি লাগে নি; তবু ঠাট্টার ভাবটাই বজায় রেখে ভাজের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতেই ঘোমটাটুকু ভালো ক'রে টেনে দিলে, বলল—"ইস, দেখলেই হোল! ঠাকুরের মুখদেখানি কড়ি দিতে হবে না?"

ওর হাতেও জাঁতি, সেটা আবার তুলে নিতে না নিতে কনে-বৌ ঘোমটার সমস্ত কাপড়টুকুই মাথা থেকে খসিয়ে মাথাটা আদুড় ক'রে দিলে, বলল—"ঠাকুর বলে—ভক্তিই আমার কড়ি; যে যতো পারে দেখে নিক তাই দিয়ে।"

"ভক্তের ভিড় ঠ্যাকাবে কে?"

"কেন, পূজুরী রয়েচে কি করতে?—তোমার দাদা…"

"পূজুরী না বলে—এমন ঠাকুর'তবে বিসর্জন দিয়ে আসাই…"

ঠাট্টা হিসেবে কথাটা বেশ শেষ করা যেত, কিন্তু ভেতরে একটু গলদ আছে বলেই গলায় যেন আটকে গেল। কনে-বৌ কিন্তু হেসেই উত্তর দিল—"তাহ'লে তো ঠাকুরও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, যাবার সময় দু'হাত তুলে বর দিয়ে যাবে।"

একটু চুপচাপ গেল; শুধু সুপুরি কুচোনোর খুটখুট শব্দ। কনে-বৌ দু'তিনবার চোখের কোণে চেয়ে চেয়ে দেখলে ননদের মুখটা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। তারপর একবার চোখোচোখি হয়ে যেতে বেশ গম্ভীর স্বরে টগর বলল—"বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নয়ান-বৌ···তাহ'লে যদি না বলিয়ে ছাড়বি না তো বলতেই হোল—কথা উঠেচে পাড়ায় এই নিয়ে, ইরই মধ্যে ·

"জানি।"

টগর আবার অতিরিক্ত বিস্ময়ে মুখের দিকে চাইল, বলল—"সে কি লো! কানাঘুষো হচ্ছে জেনেও বদ অব্যেসগুনো ছাড়বি নি ?"

এবার ক'নে-বৌয়ের মুখটা একটু কঠিন হয়ে উঠল, বলল—"অব্যেসগুনো যে বদ তা যদি মনে করতুম তো ছেড়ে দিতুম ; আমার কেমন যেন মনে হয় উলটোগুনোই বদ অব্যেস। তোমাদের একটু ভুল হয়েচে ঠাকুরঝি, এমন ঘর থেকে মেয়ে আনা ঠিক হয়নি। কে একটু দেখে ফেলবে সেই ভয়ে বাড়িতেও একটু ঝাড়া-হাতপা হয়ে চলা-ফেরা করতে পাব না, কে গলায় আওয়াজ শুনে ফেলবে এই জন্যে রাধামাধবের একটু নাম করতে পাব না—এ আমাদের ধাতে পোষায় না।"

"ধাত একটু বদলানো যায় না ?···উচিত না—দরকার পড়লে ? কাকীমা যে বড্ড কড়া, কাকাকেও তো দেখচিস।"

কনে-বৌ আবার হেসেই উত্তর করল—"বদলেচিও তো। বাপের বাড়িতে মাথায় কাপড় থাকত না, এখানে উঠেচে ; বাপের বাড়িতে হেঁকেই রাধামাধবের নাম করতুম, এখানে গুনগুনুনিতে দাঁড়িয়েচে। একেবারে আর কত বদলাবে লোকে ? এখন সে গুনগুনুনিটুকুও কার কানে পৌঁছল সেই ভয়ে যদি আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়···"

"আচ্ছা, ভক্ত পরে শোনা হবে গোসাঁই-ঠাকরুণের, এখন যা বলি করো।" —বোধ হয় ওর হাসিটুকুতেই সাহস পেয়ে টগর আবার ঘোমটা তুলে দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, কনে-বৌও মাথাটা নিয়েছে টেনে, এমন সময় যদু পালের ছেলে ভূষণ খিড়কি দিয়ে ঢুকে সদরের দিকে যেতে যেতে জিগ্যেস করল— "কি রে টগী, দাদা কোথাকে ?"

"বেইরে গেচে।"

ভূষণ যেতে যেতেই বার তিনেক ঘুরে ঘুরে দেখলে, তারপর অবশ্য বেরিয়েই গেল। টগর ঐ দিকেই চেয়ে ছিল, বলল—"দেখলি তো, এই জন্যে ঘোমটাটুকু দিয়ে রাখতে বলি।··বড্ড বখা, কেবলই যাত্রা-পাঁচালি নিয়ে আচে।"

"করেও বেশ চমৎকার।"—ছোট্ট ক'রে বলল কনে-বৌ।

রাগতে গিয়ে হেসে ফেললে টগর, বলল—"ধন্যি মেয়ে যা হোক্! ঐ কথার এই উত্তুর?··এখনও মাথায় কাপড়টা তুলে দেওয়া হয় নি। থাক, আমারই বা কি গরজ? এদিকে ভূষণদার খোঁজ নেওয়াও যেন বেড়ে গেচে।"

কনে-বৌও হেসে উঠল, বলল—"ধন্যি মেয়ে যাহোক! ঐ মানুষকে জেনেশুনে বাড়ির মধ্যে দিয়ে পথ দেয়! মুখের কথায় না হয় ভূষণদাদাই হোল।"

টগর হেসে বলল—"মুয়ে আগুন তোমার।"

সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার নিজের হাতেই মাথার কাপড়টা টেনে দিলে, বলল—"ওরে, সব্বনাশ! কাকীমা আসচে···উদিকে যেন কাকারও গলা!·"

বোধ হয় এই হঠাৎ আক্রমণেই কনে-বৌ একটু বিরক্তির সঙ্গেই "ছেড়ে দ্যাও"—বলে কাপড়টা মুখ থেকে দিলে তুলে। ঠিক এই সময় ভিজে কাপড়ে কাঁকালে একটা পেতলের ঘড়া নিয়ে শাশুড়ী শঙ্করী উঠোনে এসে দাঁড়াল; মুখটা অন্ধকার, জিগ্যেস করল—"হ্যাঁলা টগী, বাড়ির উঠোন বেয়ে কে এক্ষুনি যেন গেল না?—বেদো পালের ব্যাটা ভূষণোই কি? পেছন থেকে অত ঠাহর করতে পারলুম না।"

টগর হঠাৎ ভয়ে যেন কিরকম হয়ে গেল, আর তাইতেই, প্রশ্ন করা না হোলেও দুটো কথা বেশিই বেরিয়ে গেল তার মুখ দিয়ে—

"হ্যাঁ, ভূষণোই তো···আর এই দেখো না কাকীমা, তোমার বৌ···"

সাড় হ'তে থেমে গেল বটে, কিন্তু তখন ঐ দু'টো কথাতেই অনেক এগিয়ে গেছে, কোন ফল হোল না; শঙ্করী কলসীসুদ্ধ দুলতে দুলতে পৈঠার সামনে এসে দাঁড়াল, জিগ্যেস করল—"হ্যাঁ—বৌ—তা কি হয়েচে? থামলি, যে?···আর তুই অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েচিস কেন বৌয়ের মাথায় হাত দিয়ে?"

টগরের আর কোন উপায় রইল না ; একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে জেনেও নালিশের টোনেই ব'লে ফেলল—"দেখো না, তোমার বৌ—কত বলচি সেই থেকে—কোন মতেই দেবে না ঘোমটা · ।"

শঙ্করী কলসীটা নামিয়ে পৈঠার ওপর রাখলে, তারপর দুটো হাত কাঁকালে দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল—"ঘোমটা দেবে না! ··বোদোর ব্যাটা গান গাইতে গাইতে উঠোনের মাঝখান দে' যাচ্ছে চোখে দেখেও ?"

টগর বলল—"অবিশ্যি গান গাইছেল না।"

শঙ্করী ক'ষে এক ধমক দিয়ে উঠল—"তুই চুপ কর্।···গাইছেল, একশ'বার গাইছেল—না গাইছেল, শিস দিচ্ছেল—একটা ওঁব ঠোঁটে নেগেই আচে! ·· উনি ননিতে সখী সেজে ভেজেব হয়ে ওকালতি করতে এলেন!"

গলাটা পর্দায় পর্দায় উঠে যাচ্ছিল, সংযত করে নিয়ে বৌয়ের দিকে চেয়ে বলল—"ঘোমটা তুলে দিক্ মাথায়।"

টগর সরে দাঁড়িয়েছিল, হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে আবার ফেটে পড়ল শঙ্করী—"ও নিজের হাতে দেবে। বাঁদী অমনি পা বাড়ালেন!·· তোরও বড় রস হয়েচে রসময়ীর সঙ্গে থেকে থেকে, নৈলে একটা আকাট্ উঠোনের মাঝখান দে' চলে যাচ্ছে, তা দেখেও ঘোমটার কাপড় নিয়ে টানাটানি হোত না ননদ-ভেজে। ··যা, তুই নিজের পাট্ করগে যা, গেলি, না, ধরব মুড়ো ঝ্যাঁটা ?"

টগর ঘুরে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে এগুল। শঙ্করী আবার গলা নামিয়ে বৌয়ের দিকে চেয়ে বলল—"কথাটা কানে গেল না ভালোমানুষের মেয়ের? বলি, মতলবখানা কি শুনতে পাই একবার? হায়া-নজ্জা কাকে বলে বাপ-মায়ে কি একেবারে শেখায় নি? পাড়ায় যে কানপাতা দায় ইরই মধ্যে! কনে বৌয়ের মাথায় কাপড় থাকবে না, রাস্তা দে' কে গান গেয়ে যাচ্চে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে,—ছেলেরা কোথায় ছিপ পেতে মাছ ধরচে, পুকুরে গা ডুবিয়ে তাদের হদিস বাত্‌লে দিতে হবে, তার সঙ্গে হাসি মস্করা। · আর কানী বোষ্টুমীর সঙ্গে এত গলায়-গলায় হোল কি ক'রে—হাত ধরে যে গৌরাঙ্গর মন্দিরে পৌঁছে দিতে গেছল?···কথাটা সত্যি?"

কোন উত্তর না দিয়ে বৌ গোঁজ হয়ে ব'সে রইল। শঙ্করীর কণ্ঠস্বর চাপা রাগে আরও গাঢ় হয়ে এল—"সত্যিই। মিথ্যে বানিয়ে লোকে বলতে যাবেই বা কেন? নিজে দেখেচিও তো।···তা বাপমায়ে না শেখাক এবার শিখতে

হবে।···ত্থাও, ঘোমটা টেনে স্থাও মাথায়, উঠোনের মাঝখান দে' গাঁয়ের পথ। আর, পথ না হোলেও কনে-বৌ, অষ্ট-পহর মাথায় ঘোমটা থাকবে।"

বৌ একেবারে অনড়; ঘোমটা দূরে থাক্, টানাটানিতে কাপড়টা যে মাথা থেকে খসে পড়েছিল, সেটাও তুলে দিলে না।

"ত্থাও টেনে বলচি!"

শঙ্করী কাঁপতে আরম্ভ করেছে। বৌয়ের কিন্তু একই ভাব, একটা পাষাণ-মূর্তি বসে আছে।

শ্বশুর ভিখারী মণ্ডল এসে উপস্থিত হোল, মাঠের ফেরত।

"ব্যাপারখানা কি—আবার নতুন কি হোল?"

শঙ্করী বলল—"স্বচক্ষেই দেখো'সে—বৌ তোমার হায়া-লজ্জার ধার ধারে না; দেবে না ঘোমটা। ননদ হেরে গেল, আমিও···তা আমি কিন্তু হারব না, আমার নাম শঙ্করী দাসী!"

শেষের কথাগুলো বলতে গলাটা আরও কর্কশ হয়ে উঠল। ভিখারী ঠিক এগিয়ে দেখতে এল না, তবে গোয়ালের পানে যেতে যেতে একবার ঘুরে চাইলে দাওয়ার দিকে। শ্বশুর আসতে বৌ মাথাটা একটু শুধু ঘুরিয়ে নিয়েছিল, সেই ভাবেই বসে রইল।

বাড়িটাতে একটা থমথমে ভাব জমে উঠতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ভিখারী গোয়ালের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে বলল—"তুই হারবি নি, আমি কিন্তু হেরে বসে আচি, সহ্যির সীমানা ছাড়িয়ে গেচে একেবারে, এই ব'লে থুলুম।"

ঠিক এই সময় ছেলে অনঙ্গ মস্করার সঙ্গেই কতকটা হৈ হৈ করতে করতে সদরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাড়িতে ঢুকল—"ওরে টগী, তোদের ননদ-ভেজে আবার কি বাধল?—ভূষণো যে বললে···"

ভিখারী একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে দুহাতের জাবনা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল গোয়াল থেকে—

"রেখে আয়, আজই রেখে আয় বৌকে বাপের বাড়ি। চলবে না আমার এখেনে ওসব। পাড়ার একটা জাট্ বখা, তার মুখে গেরস্তর বৌয়ের নাম—এমনি অবস্থা দাঁড় করিয়েচে!···ও হতভাগা গাড়োল আবার তাই নিয়ে বড়াই করতে আসে! আজ এই সাঁঝের পিদিম দেখাবার আগেই বিদেয় করতে হবে পাপ, নিজে গিয়ে দিয়ে আসবি। নৈলে তোরা দুজনে

থাক্ তোদের ঢলাঢলি নিয়ে, আমরা বুড়ো-বুড়িতে বিদেয় হই, প্রাচিত্তির হোক পাপের !

— রাগ কারুরই পড়ল না, অবশ্য বৌয়ের দিকে ওটা রাগ কি কি বোঝা যায় না,—ঘোমটা টানলে না, একটা কথা কইলে না, এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না, অনঙ্গ তোয়ের হতে একবাব চোখ তুলে দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রাগ না পড়লেও শ্বশুরশাশুড়ী ইচ্ছে করেই একটু ঢিলে দিয়েছিল, বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে এরা একটা গা ঢাকা অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়ল।

গ্রাম ছাড়িয়ে যখন মাঠে পডবে, মনসাতলার চালাঘরের পাশ থেকে টগর বেরিয়ে এল। খুড়তুতো-জাঠজুতো ভাইবোন, বোনই ছোট; প্রায় সমবয়সী ব'লে ভাজকে কিন্তু বড়র মর্যাদা দেয় নি এখন পর্যন্ত। এবার কিন্তু বেরিয়ে এসেই পা তুটো জড়িয়ে ধরলে, বলল—"আমি তোকে তাড়ালুম নয়ান বৌ···কী হোল, কী সব বেরিয়ে গেল পোড়া মুখ দিয়ে! তুইও তো একটু নরম হলি না।··আর দাদা! ধন্যি পুরুষ, রামচন্দ্রকেও হার মানালে! ·· না, ফিরে চলো, বাপমায়ে অমন বলেই, রাগ কিছু বরাবর থাকবে না।··· ফিরে চল্ বৌ ··"

নয়ান-বৌ একটু হাসলে, একটু চোখ ঘুরিয়ে কি ভেবে নিয়ে বলল— "আমি থাকলে বরাবর থাকবেই ঠাকুরঝি—কেননা জাত-বোষ্টমের ঘরের মেয়ে, আমি যে বরাবর এইরকমই থেকে যাব···"

তুই

তুটো গাঁয়ের মধ্যে ক্রোশ তিনেকের পথ। মাঝখানে প্রায় ক্রোশ তুই জেলাবোর্ডের সড়ক। ·এ গ্রাম থেকে একটা পথ গিয়ে তাইতে উঠেছে, তারপর আবার এই সড়ক থেকে গ্রামের পথটা গেছে নেমে। ওদিককারটাই বেশি, কাছাকাছি গিয়ে একটা নদীও পেরুতে হয়। এ-গাঁয়ের নাম জিরেন, ও-গাঁয়ের নাম পলাশবাটী, নদীর নাম বারুণী।

এ-দিকের দূরত্বটা আরও কমিয়ে ফেলা যায়, যদি বরাবর পথ ধরে না গিয়ে মাঠের আল ভেঙে যাওয়া যায়। মাঠটুকু শুরু হয়েছে টগরের সঙ্গে যেখানে

দেখাটা হোল তার থেকে আর একটু এগিয়ে। রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে গেছে। ডান দিকে মাঠ। সেটা ছেড়ে অনঙ্গ মাঠের আলে উঠে পড়ল।

একটি কথা হয়নি এখন পর্যন্ত দুজনে। কথা হওয়াটাকে অনঙ্গ যে এড়িয়ে চলছে, এড়িয়ে চলবার যে চেষ্টা করছে এটা তো বেশ বোঝা যায়, নয়ান-বৌও গায়ে পড়ে তুলতে যায়নি কোন কথা; বেশ একটি ব্যবধান রেখেই পেছনে পেছনে চলেছে। আর সবই বাড়িতে যেমন ছিল সেই রকমই, প্রভেদের মধ্যে কপালে একটু ঘোমটা; অবশ্য ততটুকুই, অন্ধকারে পথ দেখে যেতে হ'লে যতটুকুর বেশি হবার উপায় নেই; কপালটুকু ঢেকেছে মাত্র। এটা দেখেছে অনঙ্গ; কতটা দূরে আসছে ঘুরে ঘুরে তো দেখতে হচ্ছে মাঝে মাঝে; তবে বলেনি কিছু, মনে যাই-না ভাবুক।

আরও একটা ব্যাপার হয়েছিল; টগরের সঙ্গে দেখা হবার আগে। হৃদয়-ঠাকুর যাচ্ছিলেন গাঁয়ের দিকেই, ওদের পাড়ার পুরুত হৃদয় আচার্যি। বললেন—"মোড়লের পো না? এ সময় কোথায়? সন্দে যে পেরিয়ে গেল কখন্।"

জড়োসড়ো হয়ে গিয়ে একটু অপ্রতিভ হাসি হাসবার বেশি মাথায় কিছু আসেনি অনঙ্গর, তবে আবার ওঁর কথাতেই সামলেও গেল; বললেন—"ও! মনসাতলায় কিছু নেম-পদ্ধতি আচে বুঝি?··· তা বেশ, সেরে আয়; তবে থাকি না থাকি, আমার নেয্য পাওনা থেকে যেন বাদ না পড়ি, তোর বাপ ভিকুকে বলবি।···আসব আমি।"

তখনও চোখ দুটো নয়ানের ওপর গিয়ে পড়েছিল, প্রশ্ন তো ওকে নিয়েই। নয়ান ঘুরে রাস্তার দিকে পেছন ক'রে দাঁড়িয়েছে পিঠের আঁচলটা টেনে, যেমন দাঁড়ায় মেয়েরা, দাঁড়াবার কথা যেমন।

ঘোমটা দেখেও যেমন কিছু বলেনি, এটা দেখেও বললে না কিছু। অথচ বলতে তো পারত; বেশ কামড় দিয়েই বলতে পারত—সেই ঘোমটা এল, সেই লজ্জাও, তাহ'লে বাবা-মা দোষটা কি করেছিল?

তবে এ-পুরুষ বলবে না, নিশ্চিন্ত আছে নয়ান; বলবার সুযোগ পেলে বলবে না, টগর খোঁটা দিলে উত্তর দিতে পারবে না, পুরুত মশাইয়ের সামনে পড়লে হাঁ ক'রে থাকবে।···পেছন থেকে দেখবার সুবিধা, আলে ওঠার পর থেকে সুবিধাটা আরও বেড়েছে, কেননা সরু আলের ওপর চলতে চলতে তত ঘুরে ঘুরে চাইতে পারছে না অনঙ্গ,—নয়ান দেখছে। শ্যামবর্ণ, দোহারা গড়নের

মানুষটি, মাথায় বাবরি চুল, বাঁ হাতে নয়ানের টিনের বাক্সটা ঝুলিয়ে নিয়েছে, ডান হাতে লাঠি। বেশ সিধা চাল ·· দেখে দেখে কি মনে হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছে না নয়ান, কেননা আজ রাতটা তো অদ্ভুত—পাওয়া আর হারানো একসঙ্গে কি ক'রে মিশে রয়েছে—বুঝতে পারছে না ঠিক, তবে একটু একটু হাসি কোথায় যেন গুরগুরিয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটিও কুঁচকে উঠছে। ···উঃ, চলনে পুরুষ বটে! আবার বাবরিটা আঁচড়ে নেওয়া হয়েছে ওরই মধ্যে, গায়েও পাটভাঙা ফতুয়া! বাবু যে শ্বশুরবাড়ি চলেছেন, সোজা কথা! শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বলবেন কি সেটা নিয়েছেন ঠিক ক'রে? খাতিরটা কি রকম হবে দেখেছেন ভেবে জামাইবাবু? ··

নিজের মনেই ইনিয়ে-বিনিয়ে কথার ফিকরি বের ক'রে যাচ্ছে নয়ান, নিজের মনেই হেসে যাচ্ছে।

যতক্ষণ রাস্তা ধরে আসছিল এ ভাবটা ছিল না। গ্রামের ভেতর গাছপালা বনবাদাড়ের মধ্যে অন্ধকারটা ছিল আটকে, সেই সঙ্গে এদিকে তার মনের অন্ধকারটাও। মাঠে উঠে অবধি অন্ধকারটা গেছে পাতলা হয়ে, যেটা আছে সেটাও চোখ-সহা হয়ে গেছে, তাতে টানা মাঠটা এক নজরে যায় দেখা; রুদ্ধ বাতাসটাও পেয়েছে ছাড়া; নয়ানের বুকটা যেন হালকা হয়ে উঠেছে। কী যে ইচ্ছে করছে ঠিক ধরতে পারছে না, তবে মনে হচ্ছে, একজন কথা কইছে না বলে আর একজনকেও মুখ গুঁজে থাকতে হবে এও তো কম মজার কথা নয়। আর, কথা কইবার মধ্যেও যে মজা আছে—এমন চমৎকার একটি নাকাল করবার মানুষ!

একটু পা চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তারপর কি মনে হ'তে গতি আগের চেয়েও ঢিলে করে দিলে, শেষে দাঁড়িয়ে পড়ল। এ-পথটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এর পরে যে বড় সড়কটা সেটাও এই রকম ফাঁকা, দুদিকে মাঠ; কিসে যেন মনের কৌতুকরসটা অযথাই ছলছলিয়ে উঠছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল নয়ান, আগে ফিরে না দেখুক, বড় রাস্তায় উঠে দেখতেই হবে অনঙ্গকে। কথাটাও আগে ওর মুখ দিয়েই বের করুক না কেন।

বড় রাস্তায় উঠে অনঙ্গ ঘুরে দাঁড়াল। এতদূর থেকে অন্ধকারে মুখের খুঁটিনাটি দেখা যাচ্ছে না, তবে দাঁড়াবার ভঙ্গিতেই বোঝা যায় বেশ বিস্মিত। ঘোমটাটুকু আর একটু টেনে দিয়ে বিস্ময়টা বাড়িয়ে দিলে নয়ান। মুখের ভাবটা আন্দাজ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

অনঙ্গ হেঁকে বলল—"দাঁড়িয়ে পড়লি যে !···আয়···"

নড়ল না দেখে নিজেই নেমে আসছে। নয়ানের শুধু দুঃখ হচ্ছে ঘোমটার মধ্যে থেকে অন্ধকারে মুখের ভাবটা দেখতে পাচ্ছে না। কাছে এসে অনঙ্গ আবার প্রশ্ন করল—"দাঁড়িয়ে পড়লি যে··· ঘোমটা দিয়ে ?"

এখানে এ-ভাবে ঘোমটা দেওয়ার মানেই হয় না। তবু একটা মানে তো হ'তে পারে, অনুশোচনা; একটু নিরুত্তর থেকেই সেই ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করলে নয়ান, তারপর বলল—"বলছিলাম, ফিরে গেলে হয় না ?"

"কোথায় ?"—অনঙ্গের কণ্ঠে আবেগ যেন উছলে পড়ছে।

"কোথায় আবার, বাবা-মার কাছে ; নেবেন না ফিরে ?"

"যাবি !···যাবি তুই ?"

ঘোমটাটুকু একেবারে উলটে দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠতে যাচ্ছিল নয়ান, হাসিটা কিন্তু মাঝপথেই এলিয়ে গেল। একটু আগে অনঙ্গের মুখের ভাবটা কি রকম ছিল দেখেনি, তবে এ যেন একেবারে ছাইপানা হয়ে গেছে ; স্খলিত কণ্ঠে বলল—"ঠাট্টা !···এ নিয়েও !"

একটি দীর্ঘশ্বাসও পড়ল।

হঠাৎ আনন্দের জোয়ার এলে মানুষ এই ভুলগুলো ক'রে বসে, আন্দাজ পায় না পরিণামের। খোলা মাঠে সেই বেহিসাবী আনন্দটা হঠাৎ এসে গিয়েছিল নয়ানের।

অত্যন্ত নিষ্টুর হয়ে গেছে, নিজের কাছেই যেন গুটিয়ে যেতে লাগল নয়ান। তারপর সাধ্যমতো সামলে নেবার চেষ্টা করলে, নিজের ওপরই দোষটা তুলে নিয়ে। একটু যেন ভাবলে, ফিরবে কি না-ফিরবে একটু যেন দ্বিধা—অবশ্য অভিনয়ই—তারপর পা বাড়িয়ে বলল—"নাঃ, চলো, ফেরবার কি আর মুখ রেখেচি ?"

রাস্তায় উঠে এই ভাবে চলল খানিকক্ষণ। একটা লজ্জা, যাকে আঘাত করলে তার ওপর একটা অনুকম্পাও, তারও সঙ্গে একটা গ্লানি। কি অধিকার ছিল ওর সঙ্গে আর এভাবে রহস্য করবার ?—সম্বন্ধ কি ছিন্ন ক'রে আসছে না নিজের হাতেই ?··· গ্লানিটা যেন ফেনিয়ে উপছে উপছে উঠছে।

এইটাই আবার কি ক'রে একটা যেন আক্রোশে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলল—"একটু আস্তে যাওয়া যায় না গোসাঁই ? একটা রাত্তির বৈত নয়।···না হয় দোষই করেচি একটা।"

অনঙ্গ দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশে এসে নয়ান বলল—"চলো।…রাগ করেচ? অবিশ্যি রাগের আর দোষই বা কি?"

"না; রাগ করব কেন?"

"হ্যাঁ, রাগ তো নেইও দেহে; নইলে…যাকগে সেকথা…আমি একটা কথা ভাবছিলুম,—বাড়িতে গিয়ে বলবে কি? তাড়িয়ে দিয়েচেন আমায়? অবিশ্যি সেটা তো টের পাবেনই, তবে সদ্য সদ্য গিয়ে আজ বলা…"

"যদি নদীর এপার থেকেই চলে আসি—তোকে নায়ে চাপিয়ে?"

নয়ান একেবারেই মুখে আঁচল চেপে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল, বলল—"পালিয়ে আসবে? সাজগোজ দেখে মনে করলুম মদ্দ বুঝি শ্বশুরবাড়ি চলেচেন! লাঠিও রয়েচে হাতে…"

"ওদিকটুকু যেতে যদি তোর ভয় করে তো যেতুমই না হয়, নেমে আর কতটুকু!"

হেসেই চলল নয়ান, বলল—"আমার ভয়ের জন্যে যাওয়া ঠিক হবে কি নিজের ভয়ের জন্যে ফিরে আসা, বুঝতে পারচি না।"

"যাবই তাহ'লে।"

"বলবেটা কি সেই কথাই জিগ্যেস করচি।"

"বলব…"

চুপ করেই একটু এগিয়ে চলল, তারপর শেষ করল—"বলব এমনি এলুম। আসতে নেই?"

"গেছলুম ক'দিন?"

চুপ করেই রইল অনঙ্গ। খানিকটা গিয়ে নয়ান বলল—"আজ মন্দিতলার হাটে পূর্ণিমার মেলা ছেল…"

একটু থেমে জিগ্যেস করল—"কিছু মাথায় আসচে?"

অনঙ্গ ঘাড় ফিরিয়ে মুখের দিকে চেয়ে কিরকম একটু হাসলে, বললে—"ঐ মেলায় প্রথম দেখা তোর সঙ্গে।"

একটা যে কৌতুকের ভাব আবার ফুটে উঠছিল নয়ানের মুখে, সেটা মিলিয়ে গেল। একটু থেমেই বলল—"প্রথম দেখা শেষ দেখার কথা নয়। আমি বলছিলুম—বাড়িতে গিয়ে বললে কেমন হয় যে হাটের মেলায় এসেছিলুম দুজনে—বাবা-মাকেও টানলে হয়—তারপর ওঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন, আমরা চলে এলুম ইদিকে। কেমন হয়, এইরকম ক'রে বললে?"

"বেশ হয়; সত্যি বেশ হয়।"—দৃষ্টিতে প্রশংসা ফুটে উঠেছে অনঙ্গর।"

"বেশ তো হয়, তারপর?"

"তারপর—কি?"

"সে উত্তুর দেবার আগে জিগ্যেস করি—ক'দিন থাকবে? ··ওঁরা তো বলবেনই থাকতে—নতুন জামাই।"

"ও বাবা! থাকব কি ক'রে? · তাহ'লে আমি এপার থেকেই চলে আসব না হয়।"

হেসে উঠল নয়ান, বলল—"বেশ, থাকতে হবে না তোমায়। কিন্তু কথা হচ্চে—যখনই চলে এস—কাল সকালে, বিকেলে, কি আজ ধুলোপায়েই, আমায় রেখে তো একলাই আসবে? সমিস্তেটা তাহ'লে আর মিটল কোথায়? বলবে কি তাঁদের? অন্তত মানানসই একটা কিছু বলে বেরিয়ে আসতে হবে তো গো?"

"হ্যাঁ, তাও তো বটে।"

"আমি দেবো বুদ্ধি?"

"দে না দেখি।"

"দু'কোশ এগিয়ে মামার বাড়ি তো; বললেই হবে, একবার ঘুরে আসি, ফেরার পথে নিয়ে যাব।"

"হ্যাঁ, এও মন্দ হয় না।"

চলতে চলতে সামনে চেয়েই বলছে অনঙ্গ, নয়ানের ঠোঁটে যে একটা হাসি ফুটল আস্তে আস্তে সেটা দেখতে পেলে না। একেবারেই নির্জন রাস্তা; চোখে স'য়ে স'য়ে অন্ধকারটা আর বাধা না হ'য়ে আবও যেন সহায় হয়েছে; ওদের দুটিকে আর সব কিছু থেকে আলাদা ক'রে দিয়েছে; নয়ান চলতে চলতেই একটু ঘেঁষে গেল অনঙ্গের দিকে, বলল—"বাক্সটা দেও না আমার হাতে।"

"ভারী, তুই কখনও পারিস বইতে?"

"নিজের ভার তো এবার নিজেকেই হবে বইতে।···আচ্ছা থাক্‌, লাঠিটেই দেও।"

"লাঠি!"—কৌতুকভরে একটু হেসে ফিরে চাইলে অনঙ্গ এবার।

"কেন, নিজেকে আগলাতেও তো হবে এবার নিজেই।"

হাতটা ধরল। এইটেই ছিল উদ্দেশ্য, ও-দুটো ছুতো, হাতটাকে এগিয়ে

নিয়ে যাবার জন্যে। এগিয়ে চলল দুজনে। হাত ধরা রয়েছে বলে আর সব যেন বেশ সহজ হয়ে আসছে। নয়ান বলল—"একটা কথা ভাবচি আমি।"

"কি ?"

"দুটো বুদ্ধিই তো আমার কাছ থেকে নিতে হোল। ভাবছিলুম, চলে কি ক'রে · চলবে কি ক'রে এরপর ?"

এর পরে নিস্তব্ধতাটুকু যেন আর ভাঙতে চায় না। মনটা হালকা হয়ে এসেছে বলেই কথাটা বের করেছে মুখ দিয়ে, নয়ানের কিন্তু ভয় হোল আবার আঘাত দিয়ে বসল নাকি তখনকার মতো !

এই আশঙ্কাটুকুর জন্যেই না টুকে পারল না—"কিছু বললে না যে ?"

অনঙ্গ এবারেও কতকটা তখনকার মতোই হেসে ঘুরে চাইলে, উত্তর করল —"বুদ্ধি দিলি বটে নয়ান-বৌ, তবু তোর বুদ্ধির সুখ্যেত করা গেল না।"

ওর মুখে কথাটা খুবই নতুন লাগল, নয়ান সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল —"কেন ?"

"বুদ্ধিটা আজই খোলবার দিন বেশি ক'রে, না ?—যা সব হোল···"

শুধু নূতন নয়, আশ্চর্য বোধ হচ্ছে নয়ানের ; সেই জন্যেই আবার আঘাত দিচ্ছে কি না-দিচ্ছে সেকথা না ভেবেই উত্তর করল—"যা হোল সবই তো না-হ'তে পারত গোসাঁই—একটা কথাও তো বললে না তখন।"

"বলা মানে মাপ চাওয়া তো ওঁদের কাছে ? কার জোরে চাইতুম নয়ান-বৌ ? যতটুকু দেখলুম তাতে কি এইটেই মনে হবার কথা নয় যে ঘর ছাড়বার জন্যেই তুই তোয়ের হয়ে উঠেচিস ?—কোন চারা নেই আর। নৈলে অন্তত বাবার কাছে মাপ চাওয়া যে কত সহজ তা সঙ্গে সঙ্গেই পেতিস দেখতে।"

আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—"আমি ওর মধ্যে পড়তে গেলে বোধ হয় আসতেও হোত না সঙ্গে, একাই চলে আসতিস।"

বিস্ময় বেড়েই গেছে। তবে রাগ নয়, রাগ নয়ান চেনে। রাগ ক'রে বললে বোধ হয় হাতটা ছেড়ে দিতে হোত, রাগে তো রাগই টেনে আনে।···এ যা হোল তাতে হাতটা আরও যেন এঁটে ধরলে ; অবশ্য তখুনি নয়—যেতে যেতে —অনেকখানি গিয়ে।···যা দিয়ে ঘা দিয়েছে অনঙ্গকে তা-ই এসেছে ওরও মন থেকে বেরিয়ে। আশ্চর্য এইটেই যে এ মানুষও এ-রকম কথা বলে, এই রকম ঘা দিতে জানে !

এর পরও কথাবার্তা হোল, তবে অল্প, তার ধরণও অন্য রকম। ঘাটে গিয়ে

দেখলে খেয়ার নৌকো ওপারে। বর্ষার নদীতে ভরা জল, টান ; সাড়া পেয়েছে ডাক দিয়ে, তবে সময় নেবে।

ঘাসে ঢাকা ঢালু কিনারায় বসল দুজনে। বাঁকা চাঁদের হালকা জ্যোৎস্না উঠেছে।

নয়ান বলল—"বাঁশিটা বাজাও না গোসাঁই, শুনি।"

"বাঁশি কোথায় পাব এখানে ?"

নয়ান আঁচলের মধ্যে হাতটা সাঁদ করিয়ে বাঁশিটি বের করে হাসতে হাসতে হাতে তুলে দিলে। অনঙ্গেরই বাঁশি পেটের কাছে গুঁজে রেখেছিল।

অনঙ্গ গম্ভীর হ'তে গিয়ে একটু হেসেই ফেলল, বলল—"চুরি!"

নয়ানও হাসি-হাসি চোখ তুলেই বলল—"বাঁশি চুরি তো আমাদের ব্যবসাই গোসাঁই, এতে দোষ লাগে না।...শিখব মনে করেছিলুম...তা ঘোমটা নিয়েই যা কাণ্ড, বাঁশির স্বর উঠলে মুড়ো ঝাঁটার তাল পড়ত মাথায়..."

ডুকরে হেসে উঠল।

নৌকো ফিরে এলে বাঁশি যখন থামল, উঠতে উঠতে হেসেই বলল—"কেউ যে গাইতে বললে না, নৈলে গাইতুমও আমি।"

"তা গা না এবার, আমি আরও বাজাচ্চি।"

"থামো গোসাঁই। শ্বশুর-শাউড়ির কাছে লজ্জা রইল না ব'লে খেয়ার মাঝিটার কাছে থাকবে না!"

চাপা গলায় ব'লে আবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

বাড়ি এসে দু'জনে দেখলে কেউ নেই, তালা বন্ধ।

তিন

বেশ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল বটে, তবে এটাও ঠিক যে একটি সন্ধ্যার অশোভন জিদে কেউ কনে-বৌকে বাড়ির বের করে দেয় না ; ওর একটু ইতিহাস আছে। টগর যে যদুপালের ছেলে ভূষণকে ধ'রে বললে—কেবল যাত্রা-পাঁচালি নিয়ে থাকে, তা তার নিজের ভাইও বড় একটা বাদ যেত না ; আর রোগ হোক, দোষ হোক, ওটা ছেড়েছেও নয়ান-বৌ হ'তে, অন্তত তার জন্যেই, সে-ই উপলক্ষ্য।

মন্দিরতলার রাসে কৃষ্ণযাত্রা হচ্ছিল ; বছর খানেক আগেকার কথা। গাইছিল জিরেনের শখের দল, কৃষ্ণ সেজেছে অনঙ্গ, রাধিকা ঐ ভূষণ। মন্দির-তলাকে বলে এদিক'কার ফুলিয়া, বিশেষ ক'রে রাসে যে পনের দিনের মেলাটা হয় তাতে দূরে-কাছের বহু দল এসে গাওনা ক'রে যায় মদনমোহনের সেবায়, জিরেন থেকে নতুন দল ক'রে এবার এসেছিল এরা।

বোষ্টমপাড়ার ছেলেছোকরারা মিলে দলটা গড়েছে ; মাথার ওপর একজন মাতব্বর নেই, অতি কষ্টে একদিনের জন্যে আসরটা পেয়েছে। জিরেনের গৌরাঙ্গমন্দিরের সামনে কয়েকবার পালা গেয়ে ওদের সাহস বেড়েছিল ; কিন্তু সে ছিল নিজেদের গাঁ, চেনামুখের আসর, তাও আগে ডেকে লোক জড়ো করতে হোত ; তারপর এদিকে না হয় একটু জমে এসেছিল ; এ যা আসর, সাজ ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখেই সবার বুক কেঁপে উঠেছে, বেরুনো তো পরের কথা। শুধু তো সাধারণ দর্শকই নয়, আসর ঘিরে ব'সে আছে একসে এক গাওনার দল সব—শখের, আবার পেশাদারও। তুড়িতে উড়িয়ে দেবে ; আসরে বসেই বোলচাল তো শুনছে কয়েকদিন থেকে। কাল গেয়েছিল সা'নগরের শ্রীকৃষ্ণ অপেরা, ফাটিয়ে দিয়েছিল আসর, আবার কাল গাইবে। সেই জমাট আসরে আজ নামছে জিরেনের গৌরাঙ্গ পার্টি।·· কানে গেছে কৌতূহলীদের প্রশ্ন, মন্তব্য—"কারা হে ?···জিরেনটাই বা কোন্ মুল্লুকে ? নামও শুনিনি ··মন্দিরতলার আর সে আঁট নেই, রামাশ্যামা যেই হোক দুটো সাজ চেয়েচিন্তে একটা দল খাড়া ক'রে দিলেই হোল, আসর পেয়ে যাবে···"

বেরুতে সাহস হচ্ছে না। তবু বেরুতেই হোল। গৎ খান তিনেক বাজানো হয়ে গেছে। এসব আসরে একখানার বেশি দুখানা হলে লোকেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, গোলমাল আস্তে আস্তে বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

মোহড়াটা সামলাতে হবে অনঙ্গকে।

কৃষ্ণ যমুনাপুলিনে বাঁশি বাজাবেন, ওদিকে গোপীদের গৃহস্থালিতে হয়ে যাবে মৌন বিপর্যয়, 'কন্যা, বধূ যার হাতে যে কাজ তা মাঝপথেই যাবে থেমে। জল ভরার অছিলায় সবাই যমুনায় জুটবে, একে একে, দুয়ে দুয়ে, দলে দলে ; তারপর···

গৎ ওরা আর বাজাবে না, সাজ-ঘর থেকে বেরুতেই হোল অনঙ্গকে, হয়তো ঠেলেঠুলেই বের করে দিয়ে থাকবে। ওখান থেকেই বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসবে ও ; বড্ড মিঠে ফুঁ, ঐখান থেকেই জিরেনের আসর

যেতো জমে; কিন্তু জন-সমুদ্রের ওপর নজর পড়তে ওর হাত যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তার একটা কারণ হয়তো এই। যে কল্লোলটা জেগে উঠছিল জনসমুদ্রে সেটা হঠাৎ গেছে থেমে। দেরির জন্যে সবাই অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে সাজঘরের দিকে চেয়ে ছিল, ওকে হঠাৎ বেরুতে দেখে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। আর সব দলও তো গাইলে, সাজগোজে জমজমে ক'রে বের করে তাদের শ্রীকৃষ্ণকে, পেন্টিঙের বাড়াবাড়ি আজকাল, শহর-ঘেঁষা কোন কোন দল আবার নীল রং মাখিয়েও বের করছে। এ অল্প সাজগোজে, শুধু সুঠাম দেহের স্বাভাবিক শ্রীতে যেন সত্যিকার নন্দগোপালই এল বেরিয়ে; অঙ্গে পীতধড়া, মোহনচূড়ার ওপর তিনটি শিখিপাখা, নগ্ন বুকের ওপর দিয়ে একটি মোটা বনফুলের মালা নেমে এসেছে, স্নিগ্ধ কালো রং, ঢলঢলে পুরন্ত মুখে ভ্রূর ওপর দিয়ে শ্বেত-চন্দনের টিপের সার এসেছে ঘুরে।...এত সহজ-সুন্দর, গানে-উপাখ্যানে নিত্যদিনের কল্পনার শ্রীকৃষ্ণের এত কাছাকাছি, সবাই অবাক হয়ে গেছে।

অনঙ্গ কিন্তু সেটা ধরতে পারলে না। ওর মনে হোল বড়নদীর ঢেউ যেন হুঙ্কার ক'রে আছড়ে পড়বে বলেই স্তব্ধ হয়ে পেছনে গেছে গুটিয়ে। হাতের মতো পাও হয়ে আসছে আড়ষ্ট, একটা আতঙ্কে সারা দেহটাই যেন ঝিম ঝিম করে আসছে।

এগুতেই হোল তবু, কি করে যে এল সাজঘর থেকে সমস্ত পথটা, নিজেই বুঝতে পারছে না। আসরের মাঝখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর কি করতে হবে? আসুক না কেউ বেরিয়ে সাজঘর থেকে...ঘন ঘন চাইছে ঐদিক পানে...

তাইতেই নজরটা গিয়ে পড়ল মেয়েরা যেখানে আছে ব'সে; তারপরেই, যেন দৈবচালিত হয়েই একটি পরিচিত মুখের ওপর।

টগর রয়েছে ব'সে। খুব দূরেও নয়। মেয়েদের দল অনেক পেছন পর্যন্ত আছে ছড়িয়ে, টগর কিন্তু অল্প দূরেই, রাঙা বনাতের ঘেরাটার একটু ওদিকেই রয়েছে বসে, হাসি-হাসি কৌতূহলদীপ্ত চোখ দুটি ভাইয়ের মুখের ওপর তুলে।

চেনামুখ, তায় টগরই, ধড়ে যেন প্রাণ আসছে ফিরে।

দেখার প্রথম বিস্ময়টা কেটে গেছে সবার, মৃদুগুঞ্জরণের মধ্যে দিয়ে

গোলমালটা আবার ফিরে আসছে আসরে—কৃষ্ণ যে খালি সাজঘরের দিকেই চায় ঘন ঘন !

এই সময় আরও একটি মুখের ওপর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অনঙ্গের। নয়ানকে সেই প্রথম দেখল।

পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিল তখন, এবার দৃষ্টি পড়তে অনঙ্গ দেখে বোনের সঙ্গে চোখ-মুখের ইশারায় যেমন কথা হচ্ছে তাতে শুধু পরিচিত নয় মেয়েটা, অন্তরঙ্গও; তারপরেই টগরের একটা ভ্রূভঙ্গিতে যেন আসরের ভব্যতায় সচেতন হয়ে দুটি ঢলঢলে চোখকে সংযত করে নিয়ে এদিকে চাইলে।

কী হোল সে কি বোঝা যায়?·· বাঁশি তুলে নিয়ে অনঙ্গ ফুঁ দিলে, দেখতে দেখতে আঙুল ক'টি চঞ্চল হয়ে উঠল।

আর দেখেনি ওদিকে ফিরে, তবু দুটি চোখ তার মৌনভাষা নিয়ে ওর ঘোরাফেরার সঙ্গে ওর মুখের ওপর যেন এসে পড়েছে। মৌন প্রশংসার, মৌন বিস্ময়ের ভাষা, ঘুরে ফিরে দেখছে না বলেই তার মৌন আবেদন নিয়ে যেন।···রাধার দুটি ভীরু-বিহ্বল চোখ·· সমস্ত শরীরটিও যেন সংগীতে সংগীতে পূর্ণ হয়ে উঠছে, অপ্রকাশের ব্যথায় বাঁশির স্বর হয়ে উঠছে উদ্বেল।

যাত্রা জমে গেল। ত্রুটিটুকুও আপনিই গেল সুদরে।···শ্রীকৃষ্ণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় নি তো—এমন শ্রীকৃষ্ণ! বাঃ, শূন্য যমুনাপুলিন দেখে একটু বিহ্বলভাব দেখাবে না?—তবে আর হোল কি? · এই মোহড়াটুকুর ওপর নির্ভর, সাজঘরের জড়তাটুকুও গেছে কেটে। গোপিনীরা এল একে একে বেরিয়ে, কেউ হাতের ডালা রেখে দিয়ে, কেউ দুধের কেঁড়ে, কেউ ননীর ভাঁড়; কেউ প্রসাধনের দর্পণ থেকে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আনমনা হয়ে রইল চেয়ে; কেউ রঙিন উড়ানিটা মাথায় তুলে দিতে গিয়ে। তারপর কলসী তুলে নিয়ে চলল সব যমুনাতটে।

গরীব পার্টি, তবে ছেলেছোকরা নিয়ে, সাজের যেটুকু অভাব, নূতন বয়সের কমনীয়তায় বরং বেশি করেই গেছে পূর্ণ হ'য়ে। ঠিক সাজঘরের বাইরে ঘরের কাজ ঝেড়ে রেখে, প্রসাধন ছেড়ে, অবগুণ্ঠন ঘুচিয়ে কলসী কাঁখে সবাই আসরে এসে উপস্থিত হতে লাগল, কেউ চঞ্চল, কেউ সংযত। ছেলেদের দল, নূতন ক'রে দেখাবার শখ আছে, নূতন স্টাইল সব দেখে দেখে আসে বাইরে থেকে, যা করে মানায়ও; গোড়া থেকেই বাহবা পড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত। ঠিক এ-ধরণে কৃষ্ণযাত্রা এদিকে কেউ শোনে নি।

হয়তো ধীরেসুস্থে আলোচনা করে মত বদলাবে অনেকের, তবে সন্থ সন্থ মনে যা ছাপ নিয়ে উঠল সেটা এই। অন্তত এমন আসর-মানানো রাধাকৃষ্ণ তো দেখেইনি কখনও। না শুনেছে অমন মন-মাতানো বাঁশি।

যাত্রা ভাঙলে সাজঘরের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। মিড্‌ল্‌ স্কুলের খানপাঁচেক বড় বড় ঘর, একখানা টানা চালার নিচে; তারই এদিককার সব শেষেরটায় সাজঘর হয়েছে, বাকিগুলোতে আছে যে-সব দলের গাওনা চলছে, তারা। আপাতত শ্রীকৃষ্ণ অপেরা, যারা কাল গেয়েছে আবার আসছে কাল গাইবে; জিরেনের এরা; সিদ্ধকালী থেকে এদেরই মতো একটা শখের পার্টি, আর একটা কীর্তনের দল। বাইরে ভিড়, দোরের সামনে, আবার জানালাগুলোর সামনে, আবার ভেতরেও খানিকটা ভিড়ের মতনই হয়েছে। দেয়ালের পাশে পাশে চারিদিকে বেঞ্চি পাতা; একপাশের কতকগুলোতে সাজগোজ রয়েছে, জমাও হচ্ছে; সামনের দুখানায় বেশ মাতব্বর গোছের কয়েকজন রয়েছে ব'সে। তামাক চলছে কয়েকখানা হুঁকোতেই, রাধা, ললিতা এরা সব সেজে সেজে দিচ্ছে। যারা বসে রয়েছে তাদের মধ্যে যাত্রার মাতব্বরই বেশি; শ্রীকৃষ্ণ অপেরার অধিকারীও রয়েছে। জিরেন সবার একটু মাথা হেঁট করেছে, তবে পেশাদারী তো আবার পরাজয়ের মধ্যে থেকে বিজয় খুঁজে বের করে, শ্রীকৃষ্ণ অপেরা এসেছে সেই স্বার্থে, কৃষ্ণ-রাধা দুটিকে যদি হাত করা যায়। অবশ্য এখন তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে শুধু দেখছে, খোঁজ নিচ্ছে; প্রশংসাও ওজন ক'রে ক'রে—

"হ্যাঁ, তালিম দিয়েচেন, একথা মানতে হবে বৈকি, একশ'বার। শখের দলের কেষ্ট-রাধা বের ক'রেছিল মানকরের দল, আর হ্যাঁ, সেবারে শিউড়িতেও,—শখের দলের কথা হচ্চে, আমাদের পেশাদারীর নয়,—ওদের মতন ঠিক ততটা নয়, তবে হ্যাঁ, কাছাকাছি বৈকি—একথা না বললে অধর্ম হবে। তালিম দিয়েচেন বৈকি, সাথক তালিম দিয়েচেন।"

কথা হচ্ছে ভিখারী মণ্ডলের সঙ্গে।

ছেলে যাত্রা ক'রে বেড়ায় এটা পছন্দ নয় ভিখারীর। তা' ভিন্ন গাঁয়ের মধ্যে থেকে করে কচিৎ-কখন, এদিকে গৃহস্থালির কাজও করছে, ওদিকে শখও মেটালে একটু-আধটু, অপছন্দের হোলেও সে তবু চোখ-কান বুজে খানিক থাকা যায়; এবারে বাইরে এসে করাটা তার একেবারে মনঃপুত হয়নি, এক রকম পালিয়েই এসেছে অনঙ্গ। রগ-চটা, খামখেয়ালী মানুষ

ভিখারী, বাড়ি থেকে রাগে কাঁপতে কাঁপতেই কোঁচ করে বেরিয়েছিল—কানে ধরে টেনে নিয়ে আসব হারামজাদাকে, না আসে, যাঃ, ত্যাজ্যিপুত্তুর করলুম।···কিন্তু টানা তিন ক্রোশ পথ রাগ ধ'রে রাখা ওর কর্ম নয়। মেলায় এসে ঘুরে-ফিরে দেখে শুনে কাটাল খানিকটা, কানে ধরে টেনে নিয়ে যাওয়াটা হালকা হ'য়ে, 'অমন কুপুত্তুরের মুখ দেখব না'তে এসে দাঁড়িয়েছে। যাত্রার দিকেই গেল না অনেকক্ষণ পর্যন্ত, তারপর এক সময় ভিড়ের এক পাশটিতে গিয়ে বসল। যাত্রা তখন জমাট একেবারে, 'বাহবা'র চোটে শামিয়ানা ছিঁড়ে পড়বে; কয়েকবার ঝোঁকের মাথায় "সাবাস বেটা!" বলে চেঁচিয়ে উঠে একটু গোলমালেরও সূত্রপাত করেছিল; যে-জায়গায়, যে-ভাবে এসে বসেছে, পিতৃত্ব সাব্যস্ত করা তো শক্তই। তারপর যাত্রা ভেঙে যেতে সাজ-ঘরে এসে আসরে ছেলের চেয়েও জমিয়ে বসেছে,—ও-ই শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম করেছে, ও-ই নিয়ে এসেছে দল, ও-ই সর্বেসর্বা, ও-ই যা করবে তাই হবে।

"পেশাদারী দলে যদি টানতে চায় ছেলেকে?···কিসের অভাব রেখেচি ছেলের, মশাই, যে ঘর ছেড়ে, টো-টো ক'রে বেড়াবে? ··আপনি নিজের দলের কথা বলচেন?···সে কি কথা, শ্রীকৃষ্ণ অপেরার কথা জানব না? ·· আপনার দল যখন, এমনি নিয়ে যাবেন ডেকে, যখন খুশি, আবার পয়সা কিসের?···ও আপনারা জোড়াকে জোড়াই নিয়ে যাবেন, রাধাও আমার এক্তিয়ারে, ওর বাপ যোদোকে হুকুম করলে 'না' বলবে তার সে সাধ্যি আচে? ··তবে আর কিছুদিন দাঁড়ান, আর একটু তালিম দিয়ে দিই—নাম ডোবাবে শেষকালে আমার, বাইরে ছাড়ার কথা হচ্চে কিনা···"

মনটা দরাজ হয়ে গেছে। ছেলে জানে তো বাপকে; এর ঠিক উল্টটিও হ'তে পারত, সাজ-ঘরে ঢুকে নড়া ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যেতেও বাধত না।···সন্তর্পণে দৃষ্টি-বিনিময় করে ভূষণের সঙ্গে, সাজগোজ গোছাতে গোছাতে।

অধিকারী বলছে—"তা আপনি দিতে থাকুন না তালিম, তালিমের কি অন্ত আচে? কিন্তু কী তালিমটা পেলে তাও আবার মাঝে-মধ্যিখানে এক-একবার যাচাই ক'রে দেখতে হবে তো? আমি সেই কথাই বলচি।·· পেশাদারী আপনার ছেলেকে করবেন না, উত্তম কথা, আপনারই যুগ্যি, তবে পয়সা নেওয়া না নেওয়ার কথা—নিলেন না হাত বাড়িয়ে, কিন্তু মা-লক্ষ্মী যখন

জোর ক'রে আগল ভেঙে ঢুকবেন, পারবেন রুখতে? সে কথাটা বলুন আমায়!"

হুঁকোয় মুখ দিয়েই আড়চোখে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

ভিখারীর হাতেও হুঁকো, হাসা উচিত কি আরও গম্ভীর হয়ে যাওয়া উচিত বুঝে উঠতে পারছে না।

"জিগ্যেস করবেন—এ কথা কেন বলচেন অধিকারী মশাই।...বায়না দিয়ে গেচে রূপগঞ্জের রাজবাড়ি থেকে। বোষ্টম রাজা, ওদের বাহবা তো ফাঁকা কথার বাহবা নয়, উতরে গেল তো টাকাটা সিকেটা বর্ষাচ্চে তো বর্ষাচ্চেই, পুরুষদের দিক থেকে, আবার চিকের আড়াল থেকেও। তাই, যে আসর মাত করবে তারই তো পোয়াবারো। আর, সে-টাকায় আমি হাত দিই? রাম বলো, অন্যের হকের টাকা, ভাদ্দরবৌ। তারপর, কাল এ-দেউড়ি থেকে ডাক তো পরশু ও-দেউড়ি থেকে, একবার ঢুকলে গাঁ থেকে বেরিয়ে আসতে মাস কাবার। আর, রূপগঞ্জও কি একটা? ওদিকে সারা অঞ্চলটাই যে বোষ্টমে বোষ্টমে ছয়লাপ।...তাই বলছিলুম, মা-লক্ষ্মী যদি আগল ভেঙে ঢোকেন তো..."

"কৈ গো বিন্দে সখী, কলকেটা একবার পালটে নিয়ে এসো দিকিন ভাই।"

বেশ খোলাখুলি ভাবে হেসে উঠল ভিখারী রসিকতাটুকু ক'রে; অধিকারীর দিকে চেয়ে টিপ্পনী করল—"ও যে নাতি, বুঝলেন না? ওর বাপ বিনোদ হোল আমাদের ছিদামের ছেলে, দাদা-দাদা করে তো ছিদাম আমায়?...কি পেলে না পেলে ভিকিরী মণ্ডল সেটাকে হিসেবের মধ্যে আনে না, তবে হ্যাঁ, ঐ যা বললেন—তালিমটা পেলে কি রকম সেটা মাঝে-মধ্যিখানে একবার ক'রে..."

হঠাৎ থেমে যেতে হোল।

"হ্যাঁ গা, সাজ-ঘর তো এইটিই?"—ব'লে একটি স্ত্রীলোক দরজার চৌকাঠের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। দলের ছেলেরা লম্বা ঘরটার একটু ভেতরের দিকে। কেউ সাজ পরেই, কেউ খুলে ফেলেছে, কেউ খুলছে, একটু উঁকি মেরে দেখে নিয়ে নিজেই বললে—"হ্যাঁ, এই তো; যা ভিড় চারিদিকে, গুলিয়ে যায়।...তা আসব একটু ভেতরে? ক্ষেতি নেই তো?"

সবার নজর গিয়ে পড়েছে। মাঝবয়সী, একটু স্থূলাঙ্গীই, রং টকটকে না হোলেও বেশ মাজা, নাকের মাঝখানে একটি রসকলি, পরনে গেরুয়া রঙের

রাঙাপেড়ে শাড়ি, ডান হাতে একটি হরিনামের ঝুলি। সুন্দরীই বলতে হয়, পেট্রোম্যাক্সের কড়া আলোয় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, তার ওপর এই রকম হঠাৎ,—সবাই নির্বাক হয়ে গেছে।

অধিকারীই প্রথমে সামলে উঠল, বললে—"আসবেন বৈ কি।...তা—এখানে—"

"এমন কিছুই নয় গোসাঁই, বংশের একটা আচার—চলে আসচে কতদিন থেকে।...তাও কি হোত?—একটু সুবিধে হয়ে গেল, তাই "

বাইরের দিকে ঘুরে হাঁক দিল—"কৈ গো, তোরাও আয় না..."

ডিঙি মেরে গলাটা তুলে একটু দেখল, বলল—"দাঁড়ান গোসাঁই, এলুম ব'লে..."

একটু বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল—"দেখো কাণ্ড! যার ভরসায় আসা...।"

একটু বোধ হয় বিরক্তি, তারপরে মুখটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, একটু কৌতুক-প্রশ্রয়ের হাসি হেসেই বলল—"যাক্, এনেচে তো টেনে গোপাল, তা হ'লেই হোল।...রঙ্গ তো ওর পদেপদেই।"

একটু ভেতরে এসে ছেলেদের দিকে চেয়েই প্রশ্ন করল—"কৈ গো, কোন্‌টি?"

তারপরেই এগিয়ে গিয়ে অনঙ্গর মাথায় হাত দিয়ে স্নেহভরে মুখটা একটু নামিয়ে বললে—"ওমা, এই যে গোপাল আমার, ভুল হবার জো আচে? ...একবার উঠতে হবে যে বাবা, ধড়াচূড়াটা আর একবার পরতে হবে—মায়ের জন্যে একটু ক্লেশ ক'রে। রাধিকের তো রয়েচেই সাজগোজ; একটু পরে খুলো বাছা, আমার দেরি হবে না কিছু।"

ঘুরে এগিয়ে এল অধিকারী আর ভিখারী যেদিকটায় আর কয়েকজনের সঙ্গে ব'সে ছিল। বললে—"কুলের একটা পদ্ধতি গোসাঁই, যুগলমূর্তি একবার নজরে পড়লে পূজো না ক'রে নিলে দোষ হয় আমাদের। যাত্রায় দেখলেও। ...তা, দোষ কি হয় না?—নিত্যিই হচ্চে, যাত্রার সময় তো হবার উপায় নেই, ভাঙলে সাজ-ঘরে গিয়ে। তাও আবার দল বুঝে। নয়তো আসরেই দূর থেকে মনে মনে সারতে হয়। এ দেখলুম দলটা যেন একটু অন্য রকম—সবই কচি ছেলে, তাই কেমন মনে হোল অধিকারীকে বললে হয়তো মুখ বেঁকাবেন না—ঝামেলাই তো এই গোটাবার সময়টা। তাই দাঁড়িয়ে ভাবচি

তাঁর কাছে যাই কি না যাই—এমন সময় একটা মস্ত বড় সুবিধে হ'য়ে গেল।···তা সুবিধেটা হোলই বা কোথায়? সামনে ঠেলে দিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল!"

একটু হেসে কথাটা ব'লে প্রশ্ন করল—"দেখুন ভুল, হুকুম তো ওদিকে ক'রে দিলুম, অনুমতি না নিয়েই···তা অধিকারী তো আপনিই?"

অধিকারী সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরটা দিতে পারল না; শক্ত তো এ অবস্থায় লোভটা সামলানো! হুঁকোয় দুটো টান দিলে, তারপর ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু জুৎ ক'রে নিয়ে অল্প হেসে বলল—"অধিকারী নয়, আবার কতকটা হ্যাঁ-ও; অধিকারী হচ্ছেন দাদা·· এই যে।"

স্ত্রীলোকটি ফিরে চাইলে ভিখারীর দিকে, বোধ হয় চুপ করে একটু গম্ভীর হ'য়ে রয়েছেই ব'লে বলল—"তা···আমি ভাবছিলুমই আসাটা ঠিক হবে কি হবে না ··তা—ঐ যে বললুম—আমায় একরকম ঠেলেই···"

অনঙ্গ সাজছিলই, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে সেদিকে চাইতেই অধিকারী হেসে বললে—"দাদা শুধু অধিকারীই তো নয়—আবার এদিকে বসুদেবও যে।"

"ছেলে!"

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভেবে নিলে, একবার দৃষ্টিটা আপনা হোতেই বাইরে গিয়ে পড়ল, সামলে নিয়ে বলল—"বসুদেব বৈকি। কী রূপ ছেলের! আর সার্থক বাঁশি ধরেছিল ছেলে আপনার গোসাঁই।"

"তবু তো দাদার নিজের বাঁশি শোনেন নি,—তালিমটা দিলে কে?"

হুঁকোয় মুখ লাগিয়ে আড়চোখে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। ভিখারী হঠাৎ চটেই উঠল। হুঁকোই টানছিল, মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেশ কড়া আওয়াজেই বলে উঠল—"বলি তোর হোল? একজন মেয়েছেলে ত্যাখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—বলি হুঁশ আছে শরীরে, না সারা রাত সাজগোজই হতে থাকবে?"

পূজো নয় তেমন কিছু।—সে-কথাও বলল—"পূজোর অধিকার দিয়ে তো আসেন নি আমার কাছে, গোসাঁই, এসেচেন গোপাল হয়ে।···তাঁর যেমন লীলা।"

ওরা দুজনে সেজে দাঁড়ালে দুটি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বরণ করলে—দুজনকেই; মায়ে যেমন ছেলে-বৌকে করে বরণ। আশীর্বাদ করার মতো করেই এক এক করে দুজনের মাথায় দুটো হাত চেপে কপালে একটি

ক'রে চুম্বন দিলে। তারপর দুজনের হাতে দুটি টাকা দিয়ে আর একবার ডান হাতটা মাথায় একটু করে চেপে সরে এল।

মুখে যেন মাতৃত্বের পূর্ণতার একটু হাসি লেগে রয়েছে; চোখ দুটি সিক্ত। বোধ হয় অধিকারীর সঙ্গেই বেশি কথা হয়েছে বলে তার দিকেই চেয়ে বলল—"পূজো নেয় না, নেয় আশীর্বাদ; তা ওর লীলা ওই জানে।... আসি গোসাঁই।"

ভিখারীর দিকেও চেয়ে নিয়ে বলল—"গোসাঁই, আসি তাহ'লে।"

সেই রাত্রেরই কথা। মেলা খুব পাতলা হয়ে গেছে। দলের খাওয়া-দাওয়া সারা হ'লে বাইরে এসে একটু স'রে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বসল অনঙ্গ। এইরকম বসে কখন-কখনও, বাড়িতে থাকলেও; কী মনে হয়, যেন নিজের বাঁশিই টেনে নিয়ে আসে ঘর ছাড়িয়ে। বাজায় বাঁশি—এক-একদিন রাত পড়ে ঢ'লে। আজ মনটা আরও কিরকম—আসর থেকে দেখা সেই দুটি চোখ, এই এত অভিনন্দন, তারপর এই বরণ—কী অদ্ভুত একটা যে হচ্ছে মনে, ইচ্ছে করছে বাঁশিতেই দিই ঢেলে আপনাকে।.. কিন্তু কোথায় যেন একটা বাধাও মস্ত বড়, বিশেষ ক'রে আজই।

নীরব বাঁশি হাতে ক'রে উঠে পড়ল অনঙ্গ। একবার হ'য়ে আসুক মন্দির থেকে রাস দেখেই। কিছু একটা করতে চাইছে যেন মন। ভিড় পছন্দ হচ্ছে না আদৌ।

দেখে ফিরছে, মন্দির থেকে খানিকটা এসে একটা ছোট চালাঘরের পাশ থেকে টগর এল বেরিয়ে।

বলল—"আমিও এয়েচি দাদা।"

বিস্মিত হ'ল না অনঙ্গ, বলল—"দেখেছিলুম।...বাবার সঙ্গে?"

"নিয়ে আসবার পাত্তোর কিনা, তায় ছিলও আগুন হয়েই। সহদেবের মা, ঘোষগিন্নী, রাঙাপিসি এরা সব এল, এদের সঙ্গেই চলে এলুম, খুড়ীমাকে ব'লে।...তোমাদের সাজঘরের দিকে তো গেছলুমও।"

অনঙ্গ ভ্রূ কুঁচকে চাইল; জিগ্যেস করল—"কখন্?"

"গেছলুম, সেই বোষ্টম ঠাকরুণ গেছলেন না?—তাঁর সঙ্গে। আমিই তো বললুম—চলুন, আমার দাদাই কেষ্ট সেজেচে।"

"বলছিল বটে, কে ঠেলে নিয়ে এল। তা গেলিনি যে?"

"রক্ষে করো! ভিড়ের মধ্যে থেকেই দেখি কাকা, ভাগ্যিস দোরের কাছ থেকেই নজরে পড়ে গেছল!"

"বাবা ঠাণ্ডা হয়ে গেচে টগী, জল একেবারে!"—হাসল একটু।

"শুনলুম। বোষ্টম ঠাকরুণ বলছিলেন—কী সুন্দর কাকা তোমার মা, দেরি হচ্চে দেখে চটে উঠল ছেলের ওপর! আমি মরি অপ্রস্তুত হয়ে!... জানে না তো কী ঠাণ্ডা! তোমায় ত্যাজ্যপুত্তুর করবে বলে শাসাচ্ছেল বাড়িতে, তারপর কখন্ বেরিয়ে এয়েচে।"

চাপা গলায় একটু হেসে উঠল।

অনঙ্গ প্রশ্ন করল—"তা ফিরে যাবি তো? আচিস কোথায় সব?"

"ফিরছিলুমই, তারপর শুনলুম তোমাদের কালকে আবার গাওনা হবে, মোহান্তর নাকি খুব ভালো লেগেচে।"

অনঙ্গ একটু ভারিক্কে হয়েই বলল—"আবার গাওনা! রাজী হলে তো? পেশাদার নাকি?...মরুকগে, তা তোরা আচিস কোথায়?"

"ঐ ওঁর সঙ্গেই দাদা। ওমা, কী বোলবোলাও এখানে ওঁর! মন্দিরের পাশে একটা ঘর নিয়ে আচেন, উনিই তো রুখে নিলেন আমাদের।...যাক সেসব কথা, যার জন্যে এয়েচি দাদা, ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়ে আচি। তোমায় আর একবার পূজো নিতে হবে।"

"পূজো!"—চটে উঠল অনঙ্গ,—"আমায় ফুলবেড়ের বাঁজাষষ্ঠী পেয়েচিস নাকি সব? ঝাঁপ ঠেলে ঢুকে পড়লেই হোল, কলাটা মূলোটা নিয়ে?...ঐ এক পূজো গেল,—ইচ্ছে করছিল..."

"ও-রকম নয়; আর এ সত্যিই পূজো। আর ভালোও লাগবে খুব; দিব্যি করিয়ে নাও না আমার কাছে।"

মিঠে-মিঠে হাসি নিয়ে চেয়ে রইল মুখের দিকে।

"চেনও ভক্তটিকে—অন্তত দেখেচ...আজ রাত্তিরেই।"

অনঙ্গর ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ...যা ভাবচ তাই...আমার পাশেই।"—মাথা দোলাতে দোলাতে চোখ নাচিয়ে হাসতে লাগল।

"সর্ টগী, যেতে দে আমায়।...কে তা শুনি?—বেহায়াপনায় তো মনে হচ্ছিল তোকেও টেক্কা দিয়ে যায়।"

"ঐ বোষ্টুমীর মেয়ে।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল—"তোমার সঙ্গে বকবক করতে পারি না এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওদের রেওয়াজ, হয় পূজো করতে, কি করবে বেচারী ?··· না, দাঁড়াও বলচি দাদা, মাথার কিরে রইল। এই এলুম ব'লে।"

ঘরটার পেছনেই ছিল নয়ান। বোধ হয় অনঙ্গর ঐ শেষের মন্তব্যটার জন্যেই পালাতে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, টগর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এল। টেনেই আনলে, তবে যখন এল বেশ সপ্রতিভ ভাবে এসে দাঁড়াল নয়ান। হেঁট হয়ে যখন প্রণাম করছে, অনঙ্গই কতকটা বিব্রত হয়ে বলে উঠল—কিছু না বললেই যেন নয়—"বাঃ, সাজগোজ কিছু নেই, আর এ যে একলা শুধু আমি ! · "

নয়ান উঠে দাঁড়িয়েছে। টগর বলল—"বাঃ, একলা বললেই যেন হোল ! ···দাঁড়াও, আমার পূজোটাও সেরে নিই।"

একসঙ্গে দু'জনকে প্রণাম ক'রে উঠে দেখে নয়ান ঘাড়টা ফিরিয়ে নিয়েছে। বলল—"চলো, যাই এবার।"

পরদিনও অনঙ্গদের দলই গাওনা করলে। দেবসেবার খাতিরের গাওয়া, শ্রীকৃষ্ণ অপেরা পেশাদার পার্টি, নির্বিবাদেই ছেড়ে দিলে আসর, একটু পিঠ ঠুকে মুরুব্বিয়ানা ক'রে। তারপর আরও দু'দিন হোল।

দ্বিতীয় দিনটা ছিল ভিখারী, তারপর চলে গেল। গৃহস্থালির কাজকর্ম আছে। আর, এই যে হঠাৎ যশ-প্রতিপত্তি, তার কাহিনীটা গাঁয়ে চারিয়ে দিতে হবে না ? ছটফট করছিল।

পূজাও রোজ হচ্ছে ; নয়ানের মা সাজঘরেই এসে করে যায়। নয়ান করে সেই চালাঘরটির পাশটিতে। মা অবশ্য জানে না। নয়ান বলে—অত লোকের মাঝখানে গিয়ে পূজো করতে কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করে আমার, তার চেয়ে থাক্ ; একজন তো করচে ; সবাইকে যে করতেই হবে তার মানে কি।

দ্বিতীয় দিন টগর ছিল, পূজা অবশ্য ঐ একটি সংক্ষিপ্ত প্রণাম।

তৃতীয় আর চতুর্থ দিন টগর ছিল না।

তারপর গাওনা করে যখন জিরেনের দল ফিরে গেল তার মধ্যে অনঙ্গ ছিল না। ওরা বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে, বলেছে পূর্ণিমার পরে আসবে একেবারে রাস শেষ করে। পনের দিনের মেলা প্রতিপদ থেকে, ওরা যখন ফিরল তখন আরও দিন আষ্টেক বাকি।

গিয়েছিল ভিখারী ; নিশ্চয় ত্যাজ্যপুত্র করার ভয় দেখিয়ে কান ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেই। অনঙ্গ গা ঢাকা দিলে। ভিখারী খবর পেলে রাস শেষ হলে, অনঙ্গ পলাসবাটীর আখড়ায় গিয়ে উঠেছে। সেখানে পৌঁছাতেও হোল না ভিখারীকে। অনঙ্গও বোধ হয় বাপের গতিবিধির খোঁজ রাখছিল, পলাশবাটীতে দু'টো দিনও কাটাল না। ত্যাজ্যপুত্র যখন একটা সাজা, তখন সে এক অন্য ব্যাপার ; ছেলে নিজেই যখন চায় ত্যাজ্যপুত্র হ'তে তখন তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে আগলে রাখতে হয়। সেই অবস্থাই হয়ে এসেছিল ভিখারীর, কিন্তু অনঙ্গর আর কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। শ্রীকৃষ্ণ অপেরায় নেই, বোঝা গেল ঘর ছাড়ার সঙ্গে যাত্রাও ছেড়েছে। তারপর যখন ফিরল আবার পলাশবাটীতেই ফিরল।

বিয়ে না দিয়ে উপায় রইলো না ভিখারীর। জাতকুল বজায় রেখে যারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব তাদের একটা আভিজাত্য-বোধ থাকে নিজেদের কাছে ; সেটা আর টেঁকল না ভিখারীর। এক ছেলে হওয়ার বিড়ম্বনাও তো অনেক।

একটা অন্তর্দাহ রয়ে গেল, একটা অভিমান ; ভিখারী আবার গাঁয়ের মোড়ল।

এরপর বধূ যখন এল, তার যেমন রূপ আছে তেমনি অনেক কিছুই নেইও আবার। জাতবোষ্টম ঘরের অবাধ মুক্তিতে লালিত উনিশ কুড়ি বছরের একটা মেয়ে—কত তীর্থে-তীর্থেই ঘুরল—চলার সঙ্গে সঙ্গে তার জড়তা খ'সে খ'সে পড়েছে, দেখে দেখে দৃষ্টি হয়েছে নিঃসঙ্কোচ, মিলেমিশে বাক্য হয়েছে সহজ। প্রতিদিন গরমিলটাই হয়ে উঠতে লাগল স্পষ্ট। তারপর যার রূপ আর নিষ্ঠার গুমর করে গাঁয়ে একদিন ঢাক পিটিয়ে বেড়িয়েছে ভিখারী, তারই মেয়ে তো ; ব্যঙ্গে বিদ্রূপে কথাগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার লোকও আছে,—সোজা না আসে, মুখে মুখে এসে পৌঁছায়ই কানে।

সেদিন নয়ান-বৌও হঠাৎ ক'রে বসল বাড়াবাড়ি, তবে একটি সন্ধ্যার ঐ অশোভন জিদেই ভিখারী ছেলে-বৌকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় নি।

চার

দোরে শুধু তালা দেওয়াই নয়, যখন পৌঁছল দু'জনে, বেশ রাতও হয়ে গেছে। বাড়ীটা একটা আখড়া, গ্রাম থেকে খানিকটা সরে, গ্রাম আর নদীর মাঝামাঝি বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে। চারিদিকে নিচু মাটির দেয়াল, তার মাথার ওপর টানা এক ফালি খড়ের চাল, দেয়ালটিকে বৃষ্টি বাদল থেকে বাঁচাবার জন্য।

দেয়ালের ভেতর বড় উঠান ঘেরে গুটি চার ঘর। বাঁ দিকে তিনটি, তার মধ্যে দু'টি একসঙ্গে। উঁচু দাওয়ার ওপর গোলপাতার চাল নেমে এসেছে, একটি একটু তফাতে, নিচুও ; ডানদিকের ঘরটি একটু দূরে এবং একেবারেই অন্য ধরণের। পাকা, আর বেশি উঁচু, চারিদিকে পাকা বারান্দা, ওপরে খড়েরই চাল। সিঁড়িটিও পাকা, দুদিকের পাড় আস্তে আস্তে গোল হয়ে নেমে এসেছে। এইটি হচ্ছে মন্দির, ঠাকুরঘর বলাই ঠিক, বিগ্রহ রাধাশ্যাম। সমস্ত জায়গাটাতে বৃক্ষ-লতার প্রাচুর্য; কদম, তমাল, অশোক, কাঞ্চন; মন্দিরের সামনে বড় বড় দুটি বকুল গাছ, একটা মালতী লতা উঠে অজস্র ফুলে গাছ দু'টোকে শাদা করে রেখেছে। ঠাকুরঘর থেকে একটু সরে ওপরে আচ্ছাদন দেওয়া একটা পাকা চাতাল, চারিদিকে গাছে লতায় একটা কুঞ্জ গড়ে উঠেছে। গাছগুলোর বিশেষত্ব, প্রত্যেক গাছেই একটি দু'টি করে লতা উঠিয়ে দেওয়া, যেন যুগ্ম ভিন্ন থাকতে নেই। সমস্ত জায়গাটা, বিশেষ করে ঠাকুরঘরের দিকে বড় মনোরম। বাঁয়ে তিনটে ঘর থাকবার জন্যে।

চারদিকে মাটির দেয়াল রয়েছে, কিন্তু কোনখানে দরজা নেই। নদী থেকে উঠে একটি পায়ে-হাঁটা পথ এঁকেবেঁকে যেখানটিতে এসে শেষ হয়েছে সেখানে খানিকটা ফাঁক, গরু-ছাগল না ঢুকতে পারে তার জন্যে দুদিকের দেয়ালে গর্ত করে আড়াআড়ি ভাবে তিনটে বাঁশ সাঁদ করানো।

এরা প্রথমে বাড়ীর দিকটায় গেল। থাকবার দুটো ঘরেই তালা ঝোলানো, নিচেরটা রান্নাঘর, সেটাতে খালি শেকল চড়িয়ে দেওয়া। শেকল খুলে ভেতরে গিয়ে দেখলে ঘরটা শূন্য ; শুধু তাই নয়, যে রকম ঝুল আর ধুলো জমে আছে, মনে হোল বেশ কিছুদিন পরিত্যক্ত।

ঠাকুরঘরের দিকে এসেও দেখলে তালা ঝোলানো।

অনঙ্গ বেশ একটু বিমর্ষ। নয়ানের চলায়-বলায় সে রকম কিছু বোধ হচ্ছিল না, কথা বলবার সময় মুখটা যেমন একটু করে মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল, তার ভাবটা যেন অন্য রকমই। একটা কথায় সেটা ভালো রকমেই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ঠাকুরঘরের কপাটটা দেখে নিয়ে ওরা দুজনেই সিঁড়ির ওপর এসে বসল। অনঙ্গ বলল—"মুস্কিল হোল।"

নয়ান চোখ তুলে জিগ্যেস করল—"কিসেব মুস্কিল গোসাঁই?"

"গ্যাও, কিসের মুস্কিল ওকে এখন বোঝাও! তিন কোশ পথ হেঁটে এসে…"

নয়ান খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল—"কিন্তু তিন কোশ পথ নিয়ে তোমার যা ভাবনা, সেটা তো গেল। কম মুস্কিল আসান!"

"ভাবনা কি?"

"ও মা! ভুলে গেলে? যাদের মেয়ে তাদের কি বলবে, ভাবনা ছিল না? —এখন তো নিশ্চিন্দি। জিগ্যেস করবার কেউ রইলো না। নয় মুস্কিল আসান?"

"তোর ফুর্তি হয়েচে, বৌ!"

"শোন কথা—গোসাঁইয়ের। বাপের বাড়ি এসেচি, ফুর্তি হবে না?… অবিশ্যি যার শ্বশুড়বাড়ি তার আরও ফুর্তি, তবে যা অভ্যথনাব ঘটা!"

আবার হেসে উঠল। একটু চুপচাপ গেল। নিজের ভাবনা নিয়ে রয়েছে দু'জনে। নয়ান এক একবার আড়ে চেয়ে দেখে নিচ্ছিল অনঙ্গর মুখটা। একবার বলল—"আমারও মুস্কিল আসান।"

"কিসে?"

"দাঁড়াও, তার আগে কথাটা জিগ্যেস করে নিই। কেউ যখন কিছু বলবার নেই, জামাই বলে আটকে রাখবে দু'দিন তারও ভয় নেই, তখন তো ধুলো পায়েই ফিরে যাচ্চ?"

এবার নিস্তব্ধতাটুকু আবও বেশিক্ষণ রইল: কয়েকবারই নয়ান চোখের কোণে ঘুরে ঘুরে চাইল। সেই হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেছে, তার জায়গায় কি-শুনবে কি-শুনবে একটা উৎকণ্ঠা।

উত্তর না পেয়ে একটু পরেই জিগ্যেস করল—"কৈ, কিছু বললে না তো?"

"ঐ কথাই বলতে হয় বৌ—তোর ফুর্তি বেড়েচে।"

একটু থেমে বলল—"আরও একটা কথা বলা যায়, তবে থাক, তোর মিষ্টি লাগবে না।"

সেই উৎকণ্ঠার ভাবটা রয়েছিলই লেগে নয়ানের, তবুও ঠোঁটের কোণে একটু নিষ্প্রভ হাসির চেষ্টা করে বলল—"থাকবে কেন, বলোই না। সমস্ত দিনটা তো খুবই মিষ্টি মুখে কাটল, শেষ দিকে একটু না হলেও চলে যাবে।"

"বৌ, ঠিক এক বছর থেকে তুই আমায় ঘর-ছাড়া করে রেখেচিস। তোর মুখেই এই খোঁচা দেওয়াটা মানায় বটে যে আমি তোকে এই তালা-আঁটা ঘরের উঠোনে একলা ফেলে রেখে ধুলো পায়ে বিদায় হব।"

নয়ানের রুদ্ধ নিশ্বাসটা বেশ শব্দ করেই মুক্ত হয়ে গেল, এসে পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে তো ওর ঐ চিন্তাই। অবশ্য ধুলো পায়েই যেতে পারবে পুরোপুরি এ আশঙ্কাটা থাকতে পারে না। তবুও, পুরুষের মন, কে বলতে পারে? আরও ভালো হোল, উত্তরটা তেতো করতে গিয়ে আরও মিষ্টিই করে দিয়েছে অনঙ্গ, শুধু কি ধুলো পায়ে বিদায় হবার আশঙ্কাই?

তবুও মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে বলেই, রহস্যের লোভটা সামলাতে পাচ্ছে না, তাতে যদি আরও স্পষ্ট হয় কথাটা।

একটু এগিয়ে বসেই হাতের ওপর একটা হাত তুলে দিলে, শরীরের একটু ভরও দিয়ে বলল—"রাগ করলে গোসাঁই? মাপ চাইচি।·· হ্যাঁ, তার চেয়ে বরং কালকে ঘর খুলিয়ে একটা বিলি ব্যবস্থা করে গেলেই হবে। আ-হা, সেই নয়ান-বৌ তো—যার জন্যে বছরখানেক ধরে ঘরছাড়া হয়ে আচি।"

"কথাটা দেখচি খুব তেতো করতে পারিনি তোর কাছে বৌ।"

"কোন্ কথাটা?···ঘর ছাড়ার? তাহলে আমিও তেতো করতে জানি গোসাঁই, শুনবে?"

"বল, কানে তো তুলো গুঁজে রাখিনি!"

আর একটু লতিয়েই পড়ল নয়ান—

"বলচি—আমাদেরই যত মাথাব্যথা গোঁসাই?—কলঙ্কিনী রায়পিয়ারীকেই চিরদিন ঘরছাড়া হয়ে থাকতে হবে—শ্যামের কি কোন দায় নেই?—তিনি বাড়ি-ঘর, সখা-মিতা, বাপ···নাঃ, গুরুজনদের নামটা আর করব না—একে তাঁদের ছেলেটিকে কেড়ে নিলুম···"

মুখে আঁচল চেপে হাসতে হাসতে উঠে বলল—"নাঃ, বস তুমি, আমার কাজ আছে, তোমার সঙ্গে মস্করা করলে চলবে আমার ?"

অনঙ্গ বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে চাইলে।

"কোথায় চললি, দোরে তো চাবি দেওয়া।"

"গাঁয়ের সব দোরেই তো চাবি দেওয়া নয়।"

"গাঁয়ে যাচ্চিস ? সে তো খানিকটা দূর, আর যাচ্চিসই বা কি করতে ?"

"পেটে হাত দিয়ে দেখ না ! উত্তর পাবে।"

"খাবার জিনিস চাইতে যাচ্চিস ?"

"ক্ষতি কি ? বোষ্টম মানুষ, মাধুকরীতে তো অধিকার আচেই। তবে তোমার সে ভয় নেই।"

"ধার করতে, এই রাত্তিরে ?"

"সেটা তো আরও চলে,—সবারই। তবে সে ভয়ও নেই তোমার গোসাঁই।"

"তবে আর কি হতে পারে ?—চুরি ? সে গুণও তো আচে দেখলাম।"

কথাটা বলে এবার অনঙ্গ হেসে উঠল। নয়ানও উঠল হেসে, বলল—"বাঁশি চুরির শোধটা বেশ ভালো করে নিলে গোসাঁই। তা যদি করিই—চাল-ডালও ?—তিন কোশ হাঁটিয়ে এনে আমার জন্যে তোমারই করা উচিত ছিল, তা যখন করলে না···যাক্, সেসব ভয়ও নেই, আরও উপায় আচে তো !"

"শুনতে বাধা আচে ?"

"জানাই উচিত ছিল, এত দিন তো আখড়ায় ছিলে। কথাটা হচ্চে, রাই কাঙালিনী, কিন্তু সে শুধু শ্যামেরই জন্যে, নয়তো এদিকে রাধারাণীও আবার।"

ঘুরে দেখে একটু গাম্ভীর্যের অভিনয় করে বলল—"সেই চললেন রাণী।"

রাণীর চালেই পা বাড়াতে অনঙ্গ উঠে পরে বলল—"ওরে শোন, আমিও আসচি।"

বাঁশের আগলটার কাছে চলে গেছে নয়ান। ঘুরে বলল—না, "রাণী একাই একশ', পাইক-বরকন্দাজের দরকার নেই।"

"আমি ব'সে ব'সে করবই বা কি ? দেখো কাণ্ড !"

"রাণীর হুকুম দেউড়ি আগলাবে।"

একটা আগল সরিয়ে ছুটো ডিঙিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে ঘুরে বলল—"ওগো ভয় নেই, হেদিয়ে যেও না। গ্রামে নয়, এই নদীর ধারে; এলুম বলে।"

নদীর ধারে দু'ঘর প্রজা, দেবোত্তর-সম্পত্তির। চাল, ডাল, নুন, তেল যোগাড় করে নিয়ে এল নয়ান। একটা কালিঝুলি-পড়া লালঠেনও; আর একটা কড়া, খন্তি আর ঘটি। তরকারির মধ্যে পেলে শুধু পটল। অনঙ্গ আগল ডিঙিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েই দাঁড়িয়েছিল, নয়ান কাছে এসে বলল—"বাবাঃ বাবা! গোসাঁইয়ের ভয়, বাপ-মা যেমন ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, মেয়েও বুঝি সেইরকম করবে! তা নয় গো, জামাই মানুষকে দিয়ে মসলা পেসাতাম—তাই ওটা সেরেই এলাম ওদের দিয়ে—ক্ষেত থেকে পটল তুলে আনতে একটু সময় গেল তো ওদিকে।...চলো।"

অনঙ্গ বলল—"এতগুনি ব'য়ে নিয়ে আসতে হলো তো? আমি গেলে..."

নয়ান বিরক্তির ভান করে বলল—"আঃ, তুমি এগোও তো! ব'য়ে নিয়ে আসবার লোক ছিল; আমিই আসতে দিলাম না।"

"কেন?"

"আসতে চাইছিল লক্ষণ বৈরিগীর সেই যুবী বউটা।...খাল কেটে কুমীর ঢোকাই আমি!"

রান্নাঘরের শেকল খুলে ঘরটায় ঝাঁট দিয়ে উনুন ধরিয়ে নিলে। অনঙ্গ বাইরের বারান্দায় সামনাসামনি বসেছিল, উনুন ধরলে কড়াটা চড়িয়ে দিয়ে বলল—"খিচুড়ি ভোগ—গোসাঁই কি বলো? আর পটল ভাজা আর একটু চচ্চড়ি।"

"তাই কর, রাত গড়িয়ে যাচ্চে।"

অনঙ্গর একটা জিনিস চোখ এড়াল না, প্রজাবাড়ী থেকে ফিরে অবধি নয়ানের ভাবটা বেশ একটু বিষণ্ণ। রান্নার যোগাড়-যন্ত্রের মধ্যে হাসিঠাট্টা সবই আছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, লুকনো তো থাকে না, হাসিঠাট্টার ধার যেন মরা; যেখানে কথার জলুস আছে সেখানে বলায় যেন চমক নেই। বাইরে একবার ওখান থেকে পৌঁছুবার মুখেই আঁচল দিয়ে যেন চোখ ছুটা মুছলেও। তারপর রান্নাঘরে অনেকবারই; ধুঁয়ার অজুহাতও পাওয়া গেল

তো। অনঙ্গ কিছু বললে না, আজ চোখের জলের তো দিনই, হাসির বাঁধে কতক্ষণ আটকাবে—বেরিয়ে যাক।

রান্না হয়ে গেলে নয়ান কড়াতেই সবগুলো গুছিয়ে কড়ার আংটা দুটো ধ'রে বাইরে এসে বলল—"চলো গোসাঁই।"

অনঙ্গ একটু বিস্মিত হয়ে বলল—"আবার কোথায়? পাতা তো কেটে এনেচি।"

নয়ান হেসে উঠল, বলল—"তা জানি; হ্যাংলা ভাত খাবি?—না, পাত পাতবো কোথায়? সেই রকম কতকটা। চলো, শেকল দেওয়া ঠাকুর-ঘরের সামনে ধ'রে দিয়ে দুটো ফুল ফেলে দিই। নইলে রাইপিয়ারী ভাববে, দেখেচ! নিজের শ্যাম নিয়েই ব্যস্ত, আমার শ্যামকে উপোসী করিয়েই রাখলে।···চলো।"

ভোগ দিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ হোলে দু'জনে ঠাকুরঘরের সিঁড়ির ওপর বসল।

চাঁদ প্রায় ডুবে এসেছে। বকুল গাছের পাশ দিয়ে সামান্য একটু জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দু'জনের ওপর। ঝিঁঝির ডাক আর নিতান্ত দূরে গ্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে কুকুরের পাহারাদারি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

একসময় অনঙ্গ বলল—"চল্, এবার শুইগে বৌ। আচ্ছা, তালাটা ভাঙ্‌বার চেষ্টা করলে কেমন হয়?···পরখ করে তো দেখাও হোল না।"

গা ঘেঁষে একটু লতিয়েই বসেছিল নয়ান, ছড়া কাটল—

"ও ললিতে চাঁপা-কলিকে একটি কথা শুনসে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়োবাঁধা মিনসে।

তা তোমার রাধা তো সঙ্গেই গোসাঁই···আবার কার জন্যে তালা ভাঙা?"

এই সুযোগেই মনের কথাটা প্রকাশ করে দিল অনঙ্গ—

"ওখান থেকে এসে পর্যন্ত তোর মনটা যেন ভার ভার দেখচি বৌ, চোখও মুছেচিস—ধুঁয়ার কথা আমি শুনব কেন? হাসি-মস্করা অবিশ্যি চালিয়েই যাচ্চিস।"

"হ্যাঁ, চোখ মুছেচি, তোমায় সাক্ষী রেখে!"

তারপরেই কিন্তু মুছতে হোল চোখ, একবার, দু'বার, [illegible] স্বামীর কোলে বেশ ভালো ভাবে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে [illegible]।

"ও গোসাঁই, একি সব্বনাশ হোলো! আমার ব্যবস্থা ক'রে বাবা-মা যে নিশ্চিন্দি হ'য়ে বেরিয়ে গেচেন—দু'দিন চারদিনের জন্যে নয়-আর ফিরবেন না—কোনোও উদ্দেশ রেখে যাননি কারুর কাছে। কী সব্বনাশ করে বসলুম, গোসাঁই, কি মতিচ্ছন্ন হোলো! কেন তুমি খুঁটিতে চুলের গেরো দিয়ে বেঁধে রাখলে না গোঁসাই? আমি দু'কুল খুইয়ে কী সব্বনাশ করে বসলুম—তোমায় শুদ্ধ অপরাধের মধ্যে টেনে নিয়ে!"

সমস্ত দিনের যত গ্লানি বিনিয়ে-বিনিয়ে চোখের জলে বের করে দিতে লাগলো।

পাঁচ

মন্দিরের বারান্দাতেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেশ রাতও হয়ে গিয়েছিল, অনঙ্গ যখন উঠল অনেকখানি বেলা হ'য়ে গেছে।

ঘুম ভাঙতেই নূতন পরিবেশে মনটা ছাঁৎ ক'রে উঠল, তারপরেই রাত্রের সব কথা মনে পড়ে গেল।

একটু আশ্চর্য লাগল, বারান্দার ধারে একটা দড়িতে একটা ডুরে শাড়ি লম্বালম্বি ক'রে টাঙানো। এটা কোথা থেকে এল?—রাত্রে ছিল না তো।

এর পরের চিন্তাটুকুতে সমস্ত মনটি একটি মিষ্টি রসে উঠল ভরে। নয়ানের ব্যবস্থা—রোদ লেগে ঘুমের ব্যাঘাত হবে যে অনঙ্গর। বকুলশাখায় রোদ-ছায়ার ঝিলিমিলির দিকে দৃষ্টি ফেলে চুপ করে বসে রইলো অনঙ্গ, ঘুম-ভাঙা আলস্যের সঙ্গে সেই মিষ্টি রসটুকু মনটাকে যেন মাতিয়ে তুলছে আস্তে আস্তে। ··নয়ান··নয়ান··ওর নয়ান··ও যে এই রকমই, আজকের এই দশাও ওর জন্যেই, আবার, ঘুমন্ত গায়ে যদি রোদের আঁচ লাগে, তাই শাড়ি ঝুলিয়ে আড়াল ক্‌রেও দেয়।···রাত্রে জোর করে নিজের আঁচলটা বিছিয়ে তাতে শোয়ালে। একবার জড়িয়ে ধরে বলল—"আমার কি মনে হচ্চে জানো?—রাণী সুনীতির কথা—ধ্রুবর মা গো—সেই যে উত্তানপাদ রাজা মৃগয়া করতে এসে ঝড়-বৃষ্টিতে নাকাল হয়ে ওঁর কুঁড়ে ঘরে এসে উঠলেন—না জেনে—তারপর রাণীর সেই খুদ-কুঁড়ো চেয়ে নিয়ে এসে রেঁধে খাওয়ানো—নিজের কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে প'রতে দেওয়া···"

বলতে বলতে চোখে জল এসে গিয়েছিল নয়ানের। এখনকার এই মিষ্টি রসে সেই লোনা জলটুকুও যেন মিশে রয়েছে কোথায়।

কিন্তু গেল কোথায় সে ?

এখান থেকে ওদিকের রান্নাঘরটা দেখা যায়, শেকল দেওয়াই রয়েছে, বাইরেও তো কোথাও নেই। অনঙ্গ উঠে পড়ল। অলস ভাবে চত্বরটার চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জায়গাটায় থেকে গেছে অনেকদিন, গাছ-পালা-লতাকুঞ্জ সবই চেনা, তা ভিন্ন এখানে ছিল বলেই আশ্রম-বৈষ্ণবদের মতো সেগুলো প্রাণবন্ত ক'রে দেখবার একটা অভ্যাসও গিয়েছিল দাঁড়িয়ে, এক ধরণের আত্মীয়তা গ'ড়ে উঠেছিল,—অনঙ্গ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন কুশল-পরিচয় নিয়ে বেড়াতে লাগল। একটা হালকা কীর্তনের কলি আপনিই কখন গলায় গুনগুনিয়ে উঠেছে, গোয়াল ঘরটার কাছ দিয়ে যেতে বোধ হয় সেইটে শুনেই একটা বাছুর ভেতরের কোণ থেকে দরজার কাছে এসে মুখ তুলে দাঁড়াল। আশ্রমের নয়, বোধ হয় বেওয়ারিস, আগল খোলা পেয়ে কখন ঢুকে পড়েছিল আর বেরুতে পারে নি ; তাগাদাও নেই, খাচ্ছে দাচ্ছে দিব্যি আছে। তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে অনঙ্গ বসত বাড়িটার দিকে চলে গেল। অযথা জেনেও কি মনে হতে একটা হাঁক দিল—"বৌ আচিস ইদিকে ?—নয়ান-বৌ !"

তারও চেয়ে বেশি অযথা জেনেও শিকলটা খুলে একবার ভেতরটা উঁকি মেরে দেখল ; নয়ানের সেই টিনের বাক্সটা এক কোণে পড়ে আছে, কাল যেখানে রেখেছিল। নিজের মনেই বলল—"গেল কোথায় ? দেখো তো !"

এ প্রশ্নটাও অবান্তর ; লোক ডেকেডুকে এনে তাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। তাইতেই বেরিয়েছে, জানা কথা। কিন্তু একা আর ভাল লাগছে না ; এইটুকুতেই মনে হচ্ছে যেন অনেকক্ষণই নেই কাছে।

নেহাত যে আঁচলধরা তাও নয় অনঙ্গ, তবে কাল থেকে এই রকম একটা হারাই-হারাই ভাব জেগেছে মনে, রাত যত এগিয়েছে আরও বেড়েছে। উঠে পড়েছিল বার দুই, একবার ওর আঁচলটা সরিয়ে দিলে, আর একবার ঘুমের ঘোরে কি মনে হতে নিজের কোঁচার খুঁটটা খুলে ওর গায়ের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পিঠের নিচে আস্তে আস্তে গুঁজে দিলে।...কে জানে, কেমন যেন ছম্‌ছম্ করছে গা'টা। মনে হচ্ছে আগলে আগলে রাখি।

সেই গুনগুনানিটা থেমে গেছে কখন্, আপনা হতেই, হঠাৎ কিন্তু আর একটা উঠলো, রান্নাঘরটার পেছনে, তার সঙ্গে একটা পৎপৎ শব্দ। শেকলটা তুলে দিয়ে ঘুরে দেখে নয়ান ভিজে কাপড়ে দাওয়ার নিচে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিগ্যেস করল—"একি, সকাল হতে না হতে হেঁসেলে ঢুকে ছোঁকছোঁকানি—একি কাণ্ড!"

অনঙ্গ আর কিছু না পেয়ে জিগ্যেস করল—"তুই উঠলি কখন্?"

"একটা লোকের চান হয়ে গেল, তাকে জিগ্যেস কন্না হচ্চে উঠলি কখন্!··· নাও, সরো, কাপড়টা ছেড়ে নি, এখুনি সবাই এসে পড়বে।"

"কারা?"—প্রশ্নটা করে দাওয়া থেকে নেমে এল অনঙ্গ।

নয়ান ঘরে গিয়ে টিনের বাক্সটা খুলতে খুলতে বলল—"সবাই। আখড়া বন্ধ ছিল, আবার চালু হোল তো। লক্ষ্মণ গেচে গোসাঁইদাদুর ওখানে, ঠাকুরঘরের চাবি তাঁরই কাছে, রোজ পূজো দিয়ে যান, বোধ হয় ঘরের চাবিও তাঁকেই দিয়ে গেচেন বাবা। না দিয়ে গিয়ে থাকেন, খোঁজ করে নিয়ে আসবে। বিন্দি ছুটেছে পাড়ায় খবর দিতে, দেখো না, সব এসে পড়ল বলে।···আর শুনেচ?"

আড়াল থেকেই কথা বলছিল, যেন আহ্লাদে কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই শুকনো শাড়ি হাতে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিজে কাপড়টা মাথা থেকে কাঁধ থেকে নেমে গেছে। তখনি হুঁশ হতে আবার সরে গিয়ে বলল—"তুমি একটু ওদিক হয়ে দাঁড়াও বাপু; কাপড়টা ছেড়ে নি।··· বলছিলুম একটা খুব সুখবর; রাঙীর বাছুর হয়েচে দিন কুড়ি হোল—বাবা সাধনের ওখানে রেখে গিয়েছিলেন, সেইখানেই—আমি লক্ষ্মণকে বলে দিলুম তাকেও খবর দিতে, দিয়ে যাবে। ব'লে এলুম চারিদিকে ঝাঁটপাট দিয়ে দিক এসে—আহা, আখড়াটা কী যে হয়ে রয়েচে!···চাইতে পারা যায় না।"

কাপড় ছেড়ে ভিজে শাড়িটা হাতে ক'রে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল, বলল—"এই এতগুলি কাজ করেচি সকাল থেকে, তোমার মতন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলুম?"

"তুই-ই তো শাড়ি টাঙিয়ে আরও সুবিধে করে দিলি: এখন বলচিস···"

"তার পুরস্কার হোল—তুই একলা খেটে মর্।·· ঘোর কলি তো···"

"আর করবই বা কি বল্? তুই তো সব করেই রেখেচিস্।···বেশ, আমি না হয় গোয়ালটা পষ্কের ক'রে রাখিগে, রাঙী আসচে···"

পা বাড়াতেই—"ওগো শোন!"—বলে খানিকটা চেঁচিয়েই উঠল নয়ান, অনঙ্গ ঘুরে চাইতে গালে একটা আঙুল চেপে বলল—"চললেন গোবর কাড়তে। …এই লোক নোতুন মোহান্ত হয়ে বসবেন! নাঃ, তোমায় নিয়ে যে কী করব আমি!"

লক্ষ্মণ ফিরে এল। ঘরের চাবিটাও গোসাঁই ঠাকুরের কাছে ছিল, নিয়ে এসেছে। বললে তিনিও স্নান করে শীঘ্র আসছেন, ঠাকুরঘরটা খুলে ধুয়েমুছে রাখতে বললেন।

সকাল থেকে সবই অনুকূল। সেই যে কোন্ ভোরে চোখ মেলেই উঠতে গিয়ে বাধা পড়ল—ঘুরে দেখলে অনঙ্গ তাকে কোঁচার কাপড়ে জড়িয়ে রেখেছে —সেই হোল নয়ানের সুপ্রভাত। তারই পুলকে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে আশ্রমের চারিদিকে খানিকটা ঘুরে বেড়াল, লক্ষ্মণ-উদ্ধবদের তুলে গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলে, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এল, কাপড ছাড়তে ছাড়তে একটু অসম্বৃত হয়ে তখন সে অনঙ্গের সামনে বেরিয়ে পড়েছিল, তাও সেই পুলকেরই আত্মবিস্মৃতিতে—যেন নিজের মধ্যে নিজেকে এঁটে উঠতে পারছিল না; ঘর দুটোর চাবি খুলেই কিন্তু ও যেন একটা চোট খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দুটি ঘরই একেবারে খালি। শুধু একখানা করে চৌকি পড়ে আছে, আর বড ঘরটায় কাঠের সিন্ধুকটা। একটু শুষ্ক কণ্ঠেই লক্ষ্মণের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"আর সব জিনিস-পত্তোর?"

পনের আনা আশা ছিল শুনবে কারুর ওখানে রেখে গেছেন ওঁরা।

লক্ষ্মণ বলল—"সে সব তো বিলি করে দিয়ে গেলেন তানারা; আর এসবেননি কিনা।"

"কাকে?"

"কাকে—সে কথা‥ ওনারা তো গাঁয়ের ভালোমন্দ সবাইকেই দিতে চাচ্ছেল গো, দয়ার শরীল তো—তা—তা—থাক্ সে কথা শুনবেখন্ই। আহিক্কের তো শেষ নেই মানুষের? কে কেমন লোক যাচাই না হোলে ঠাহর করবারও জো নেই‥ থাক্ সে কথা।"

নয়ানও আর প্রশ্ন করলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চৌকাঠের কাছে। দুটি ঘরই জিনিসপত্রে ঠাসা ছিল। নয়ানের বাপ পুরোপুরিই বৈরাগী, ঠাকুর আর ঠাকুরঘর ভিন্ন কিছু জানত না, কিন্তু মা ওদিকে যাই হোক, গৃহস্থালির দিকে ছিল একেবারেই গৃহস্থ বধূ; সঞ্চয়ী তদুপরি শৌখীন। গৃহস্থালির সাধারণ

দ্রব্য যা সে সব তো ছিলই—বিছানাপত্র, আলনায় কাপড় চোপড়, জল-চৌকিতে সাজানো বাসন-কোসন—সব প্রয়োজনের কিছু বেশিই—এর অতিরিক্ত প্রতি ঘরের কুলুঙ্গী আর দেয়াল আলমারিতে নানারকম শৌখীন জিনিসের ছিল ভিড়, তীর্থে তীর্থে, মেলায় মেলায় ঘুরে কেনা সব, তার মধ্যে এমনও দুএকটা জিনিস ছিল যা দেখলে মনে হোত যেন সাহেববাড়ি থেকে আমদানি করা। দেওয়ালেও দেবদেবীর পটের মাঝখানে বড় ঘরটায় বিলিতী ফ্রেমে আঁটা একটা বিলিতী দৃশ্যপট ছিল টাঙানো। শখের দিক দিয়ে মার মনটা সব সঙ্কীর্ণতার ওপরে পড়েছিল ছড়িয়ে। বৈষ্ণবের ঘরে তাজমহলের একটি মর্মর প্রতিকৃতি পর্যন্ত যত্ন করে আলমারিতে ছিল সাজানো। নয়ানের মনে পড়ে, লুকিয়েই কেনে মা, তারপর অবশ্য আর লুকিয়ে রাখে নি।

এমন দুটো ঘর একেবারেই শূন্য দেখলে একটা রূঢ় ধাক্কা লাগেই মনে, মনে হয় যেন ভরা-ডুবি হয়ে গেছে কি ক'রে। কিন্তু সে জন্যও নয়, নয়ানের মুখটা যে শুকিয়ে উঠল সে আর একটা ভয় জেগে উঠে। এই ঘরের-মায়ায় জড়ানো মাকে দেখে ওর বরাবরই ভরসা ছিল, আর যাই হোক না কেন, এ-মা কখনও তার বাপকে একেবারে নিঃস্ব বিবাগী হতে দেবে না। এখন ঘরের এ দৈন্য দেখে ওর ভয় হোল এমন নির্মম ভাবে মায়া কাটানোর সঙ্গে ওদেরও তো ভাসিয়ে দিয়ে যায় নি মা!···নৈলে একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি কেন? সামলে নিলে নিজেকে নয়ান। একটি যে দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল সেটাকেও চেপে নিলে। লক্ষ্মণ আর অনঙ্গও পেছন দিকে দাঁড়িয়ে। চাবিটা অনঙ্গর হাতে দিয়ে বলল—"লক্ষ্মণকে নিয়ে ঠাকুরঘরটা পস্কের করোগে ততক্ষণ, গোসাঁই ঠাকুর কখন্ এসে পড়বেন।"

অনঙ্গ বলল—"সে তো একলাই ঠিক করে নোব, ও বরং এই দুটো ঘরের···"

নয়ান একেবারে ঘুরে দাঁড়াল, জিগ্যেস করল—"এ দুটো ঘরে কী এমন ঝঞ্ঝাট দেখলে যে তার জন্যে ভাবনা?"

ঝাঁঝটুকু অনঙ্গ আর গায়ে মাখলে না, বলল—"না, বলছিলুম—ঝুলটুল-গুলো···তুই তো ঠিক পারবি নি!"

ঝাঁঝ আর একটু বেড়েই গেল নয়ানের, বলল—"আমি সব পারি বাপু, শুধু বে-আক্কেলপনা সইতে পারি নে।···না হয় তুমিই এখানে থাকো, আমি লক্ষ্মণকে নিয়ে যাই ওদিকে। গোসাঁই-দাদু এসে পড়লে মুস্কিলে পড়ে যেতে হবে।"

অনঙ্গ বলল—"আমিই যাচ্চি। তুই সত্যিই যেন যাস নি ঝুল ঝাড়তে ঘরের, চোখে কিছু পড়েটড়ে গেলে তখন আবার চোখ নিয়ে পড়বি।"

বেশি দেরি হোল না নয়ানের। একটু আশা ছিল সিন্দুকটার, যদি কিছু রেখে থাকে ফেলে,—দুটো বাসন, একটু বিছানাপত্র, কি দু'খানা ধুতি-শাড়ি। ওদের সামনে এ দুর্বলতাটুকু প্রকাশ করবার যে লজ্জা তা থেকে রেহাই পাবার জন্যেই ওদের সরিয়ে দিলে।...সিন্দুকে তালা ছিলই না, ডালাটা তুলে দেখলে ঘরের মতোই শূন্য।

ডালাটায় হাত দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতেই নয়ান বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর এদিককার শূন্যতাটুকু পরিপূর্ণ বলেই বোধ হয় সমস্ত ব্যাপারটুকু মন থেকে ঝেড়ে ফেলা সহজ হোল। তাইতেই শরীরটা তাচ্ছিল্যভাবে একটু দুলিয়ে দিলে, নিজের মনেই বললে—"আমিও নরহরি বৈরিগীর মেয়ে, ভারি তো!..."

একটু হাসি নিয়েই বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তাচ্ছিল্যেরই, সেটা কিন্তু আনন্দের হয়ে ফুটে উঠল; সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখে গোসাঁইঠাকুর আগল ঠেলে প্রবেশ করছেন।

"গোঁসাই-দাদু!"—বলে হন-হনিয়ে এগিয়ে গেল। প্রণাম করতে যাবে, ঠাকুরমশাই সিদে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—"রোস্, চান করেচিস তো?... আমার ঝুলিতে নারায়ণ!"

গ্রাহ্য না করে পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে উঠল, একটু চোখ নাচিয়েই বলল—"ইস, নারায়ণ!...তা নারায়ণ তো তোমার বুকের বাইরে ঝুলচেন দাদু, আমি যে বুকের ভিতরে একেবারে!"

"দেখো আস্পদ্দাখানা একবার! নারায়ণ বাইরে, উনি ভেতরে!...তা একি কাণ্ড? বলা নেই কওয়া নেই একেবারে রাত দুপুরে..."

"এইটেই হোল মস্ত বড় এক কাণ্ড দাদুর কাছে—কী না, মেয়ে না ব'লে ক'য়ে এসেচে বাপ-মায়ের কাছে; আর তাঁরা যে বলা নেই কওয়া নেই...আর কি, একটা মেয়ে ছিল ঘাড়ের বোঝা, ঘাড় থেকে নামিয়ে তো দিয়েচি, যেখানেই গড়িয়ে পড়ুক না কেন ..."

শোনাবার লোক পেয়ে কালকের যত লাঞ্ছনা, আজকের যত নৈরাশ্য সব হঠাৎ ঠেলাঠেলি করে একসঙ্গে জড়ো হয়েছে মনে, ধরা গলায় অভিমানে মুখটা ঘুরিয়ে নিতেই গোসাঁইঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—

"এই দেখো! সেই ছেলেমানুষি আবার! বলা কওয়া থাকবে না কেন? ·· চল্, আয়, সব শুনবি ; রাধারমণের পূজোটা সেরে নিয়ে সব বলচি।"

পূজোর আয়োজনের মধ্যেই গল্প চলল। না ব'লে ক'য়ে কেন যাবে? নরহরির মনটা যে এদিকে ছিল না সেতো নয়ানও জানে, মেয়ের বাঁধনেই ছিল প'ড়ে, সেটুকু ছিঁড়ে যেতে আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। তবুও বুঝিয়ে সুজিয়ে আটকে রাখা গিয়েছিল—পিতৃপুরুষদের আস্তানা, একটু একটু করে এইটুকুতে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের কাছে একটা দায়িত্ব, ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে যাবে? —আর বোষ্টম আখড়া, সে তো সংসারে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকাও নয়—ছটি খাও দাও আর রাধারমণের তাঁবেদারি করো। বেশ তো, নেহাতই যেতে হয় যাবে, তার আগে বেশ দেখে-শুনে বুঝে-সুঝে একজন কাউকে ঠিক করুক— উপযুক্ত কোন শিষ্য-টিষ্য···

হাত-পা গুটিয়ে আসনে বসে গল্প ক'রছেন, নয়ান সামনে বসে চন্দন ঘষছে, অনঙ্গ আছে চৌকাঠ ধ'রে দাঁড়িয়ে, ঐ পর্যন্ত এসে হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠলেন গোসাঁইঠাকুর, নয়ান চোখ তুলে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাতে বললেন— "উল্টো চাপ একেবারে! বুঝলি না? বলে—শিষ্যি-টিষ্যি আর কোথায় দেখব গোসাঁইঠাকুর? কার মনে কী থাকে, ঘোর কলি তো ; তা বেশ, আপনিই নিন্ না দায়িত্বটুকু নামিয়ে আমার ঘাড় থেকে, লেখাপড়া করে দিয়ে হালকা হই।"

নয়ান একটু উৎসাহের সঙ্গেই বলে উঠল—"তা নিলেন না কেন দাছ? এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা···"

ঠাকুরমশাই একটু শিউরে উঠেই বললেন—"চুপ কর্, দলিলে দাসখৎ দিয়ে ভার নেওয়া!"···হেসে যুগল-মূর্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—"ঐ দেখ্ না, পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলেন, আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই, নেপটে জড়িয়ে রয়েছে। আমি আর ও-পাঠ পড়ি? এ তবু একটা কুঁড়ে আশ্রয় করে গাঁয়েই ব'সে রয়েচি, একেবারে তোর বাবার হাল ক'রে দেবে না?"

ওঁর সঙ্গে ওরা ছজনেও হেসে উঠল, অনঙ্গ বলল—"খুব লোক উপদেশ দিতে গিয়েছিলেন যা হোক্!"

গোসাঁইঠাকুর তার দিকে চেয়ে বললেন—"তুইই দেখ্ না মিলিয়ে ভাই, কোথায় দিব্যি ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছিলি—আজ যাত্রা, কাল অপেরা, আর এখন সব কিছু খুইয়ে···"

নয়ানের মুখে হাসির দীপ্তিটা যেন এক ফুৎকারেই নিভে গেল। অনঙ্গেরও প্রায় তাই, তবে সে যেন একটু বেশি করেই টেনে রাখল, বলল—"সব খুইয়ে বসার যে কি সুখ, তা তো জানলেন না দাদু!"

পরিবর্তনটুকু গোসাঁইঠাকুরের নজরে পড়েনি, হাসতেই লাগলেন আস্তে আস্তে। তারপর হঠাৎ একটু ত্রস্ত-গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন—"তুই কিন্তু একটু হাত চালিয়ে নে দিকিন দিদি, নাত-জামায়ের সুখ্যাতিতে যেন আরও এলিয়ে পড়লি—ঠাকুর এদিকে আমার শুকিয়ে মরচেন!"

গল্পের মধ্যে পূজোর আয়োজন সত্যই একটু মন্থর গতিতে চলছিল, তার ওপর ঐ কথাটুকুতে এসে আরও মন্থর হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে ফেলেছিল নয়ান, তারই মধ্যে হাত থামিয়ে একবার অনঙ্গর মুখের দিকে সন্তর্পণে চোখ তুলে দেখে নিলে—উত্তর তো দিলে ভালো অনঙ্গ, কিন্তু তার কতটা মনের কতটা বাইরের? তারপর বলবার ভঙ্গি থেকেও নিংড়ে নিংড়ে অর্থ বের করতে হাত আরও মন্থর হয়ে গিয়েছিল, গোসাঁইঠাকুরের কথায় শিলে চন্দন-কাঠের গোটা চার-পাঁচ দ্রুত টান দিয়ে তখনি হাতটা থামিয়ে মুখে হাসি টিপে বলল—"তা শুকুন দাদু; ঐ তো শুনলেন আমার হাতের চন্দনের লোভে ঐ একজনের সব খুইয়েও সুখের অন্ত· নেই, আপনার ঠাকুর না হয় একটু শুকুলেনই। এক কথাতেই পেয়ে যাবেন;" যে হাসিটুকু উঠল তার মধ্যে একটু জোরে জোরেই আবার ঘষতে আরম্ভ ক'রে দিলে। গোসাঁইঠাকুরের গল্প চলল আবার—

"বুঝলুম মন উড়েচে, উপায় নেই। উপায় যার হাতে সেই যখন টানচে, তখন আর কার ভরসা? তবুও ছিল একটু ভবসা, তোর মা, ও তো একেবারেই অন্য ধরণের, আশা ছিল রাখবে টেনেটুনে, এর মধ্যে চারিদিকে নজরও রাখছিলুম—যদি ভাল দেখে একটি চ্যালা-ট্যালা করে দিতে পারি—তাতেও অন্তত দিন কতকের জন্যে একটি বাঁধন পড়ে—খোঁজটোঁজ নিচ্চি, এমন সময় একদিন সকালবেলা পূজো করতে এসে দেখি বাড়ির সামনে দিব্যি এক জটলা। তখন একরকম ভোরই,. তবু জন আট-দশ জুটেছে, কারুর হাতে একটা রেকাবি, কারুর হাতে থালা, কারুর হাতে একটা ঘটি, ছেলেমেয়েদের হাতে একটা করে পুতুল—বেশ বোঝা যায় মস্ত এক দান-খয়রাতের উদ্যোগ। তোর মা-ই দিচ্ছে, জিগ্যেস করলুম—মায়ের এ কি রূপ গো? নরহরি কোথায়?··· না, তিনি জপে। তা, এ কি?···তোর মা দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়ালো;

বললে—আর ধরে রাখা যাবে না বাবা, রাখতে গেলে একলাই পড়ে থাকতে হবে আমায়, তাই পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধচি।

"বললুম—তা পুঁটলিতে থাকা চাই তো কিছু; সব তো বিলিয়েই দিচ্চ, এ যে শূন্যে গেরো দেওয়া মা!

"কথাটা শুনে তোর মা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর একটু কিরকম হেসে বলল—সত্যিই শূন্যে গেরো দেওয়া বাবা, বরাবর তো তাই দিয়ে এলুম, এবার আশীর্বাদ করো যেন কিছু জুগিয়ে নিতে পারি পোঁটলায়।

"বুঝলুম আর উপায় নেই। পুরুষ তো চিরকালই বৈরাগী, এবার প্রকৃতির মনেও যখন গেরুয়ার ছোপ ধরেচে তখন এ সৃষ্টি আর থাকবার নয়। বললুম—সে পোঁটলা তো ভরাই তোমার মা, তবু তাঁর বাঁশি যখন দুজনকেই ঘর-ছাড়া করলে, আমি পথ আগলে দাঁড়াব না, আশীর্বাদই করচি। কিন্তু দিয়ে যাবার তো লোক আচে মা, একটি ছেড়ে এখন গোবিন্দ দুটি করে দিয়েচেন, ঘরের জিনিস তাদেরই তো দিয়ে যাবে?

"আবার সেই রকম ক'রে একটু হাসলে তোর মা, বললে—বাবা, সেও একটা বাঁধনই তো, মায়ার একটা জের টেনে রাখা—যেন জিনিস আমার ঠিক জায়গায় গচ্ছিত রইল, কাটানই ভালো নয় কি এটুকুও?

"হারালে বৈকি, যুক্তিটা তো কাটাবার জো নেই। তবুও মন মানবে কেন?—ও-রকম বৈরাগ্য বুড়োকে তো এখন পর্যন্ত দিলেন না গোবিন্দ, বললুম—তা এই ভাবেই দিয়ে যাবে যখন তাদের বঞ্চিত ক'রে, তখন আমাকেই দাও।"

শুনতে শুনতে মনের উদ্বেগে মাথা হেঁট করে বেশ জোরেই হাত চালাচ্ছিল নয়ান, হঠাৎ হাতটা থামিয়ে মুখ তুলে চাইলে। প্রশ্নটাও জিগ্যেস করে ফেলতেই যাচ্ছিল, কোন রকমে সামলে নিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েই রইল। গোসাঁইঠাকুর একটু হেসে বললেন—"সেয়ানা মেয়ে তো, বুঝলে না যে এমন নয়, কিন্তু 'না' বলবার তো উপায় নেই···"

নয়ান আর রুখে রাখতে পারল না নিজেকে, জিগ্যেস করল—"তোমায় দিয়ে গেচেন দাদু?"

মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। গোসাঁইঠাকুর বললেন—"ঐ তো বললুম, সেয়ানা মেয়ে, বুঝলে, কিন্তু মুখ ফুটে চেয়ে বসেচি, না বলবার তো উপায়

নেই।·· দেখো! সেই কথাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলুম তা ক্রমাগতই ভুলে ভুলে যাচ্ছি—তোরা বেরিয়েছিলি কখন ?"

রাঙা মুখটা একটু যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল নয়ানের, একটা ঢোঁক গিলে বলল—"সন্দের একটু পরে···কেন বল তো ?"

"ওরা তখন বোধ হয় পথেই, একটু পবে পৌঁছে থাকবে। তা রাস্তায় দেখা হয়নি ?"

"না তো ; কার সঙ্গে দাদু ?"

"এতদিন রেখে রেখে কালই বিকেলে সবগুলো পাঠিয়ে দিলুম যে উদ্ধবের সঙ্গে, দুখানা গাড়ী ক'রে—বিছানা-পত্তর, থালা-বাসন, এদিক-ওদিক। দেখা তো হওয়া উচিত ছিল রাস্তায়।"

নয়ানের সে মুখের আলোটা একেবারে নিভে গেছে, একবার চকিতে অনঙ্গর পানে চেয়ে নিয়ে আবার হেঁট হয়ে চন্দন ঘষতে শুরু করে দিয়েছিল, সেই ভাবেই বলল—"হয়নি তো দেখা।···আমরা আবার বেশ খানিকটা মাঠ ভেঙে এলুম কিনা, বোধ হয় ঐ সময়···"

গলা শুকিয়ে যাওয়ায় কথাটা ঐখানেই আটকে গেল। তারপর বিষয়টার গুরুত্ব হিসাবে কথা অপ্রচুর মনে হওয়ায় আবার ঢোঁক গিলে জিগ্যেস করল —"তা এতদিন পরে যে পাঠাতে গেলেন দাদু ?"

গোসাঁইঠাকুর বেশ জোরেই হেসে উঠলেন, বললেন—"বুঝলি না ? বেশ ভালো করে গায়ে কলঙ্ক মেখে নিচ্ছিলুম।"

"সে আবার কি ?"—মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলে নয়ান।

"গোসাঁইঠাকুর বড় ভালো—গোসাঁইঠাকুর বড় ভালো' ব'লে একটা রব উঠে গিয়েছিল গাঁয়ে, ভাবলুম এ তো ভালো লক্ষণ নয়, সে তো কলঙ্ক না মাখলে কাছে ঘেঁষে না, তাই 'বুড়ো—কী লুভিষ্টি! কী স্বার্থপর! কী ভণ্ড!' ব'লে যখন পাল্টা রব বেশ জমে উঠেচে—সেই সময় উদ্ধবকে ডেকে দিলাম খালাস ক'রে।"

"না হয় আরও জমত কলঙ্ক দাদু কায়েমীভাবে ; তারই লোভ যখন।"

গোসাঁইঠাকুর আবার হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন—"শোন কথা নাতনীর! আর কি মুখের কলঙ্কয় কুলুতো ? কালসিটেয় দাঁড়াত গিয়ে যে, সমস্ত গ্রামকে বঞ্চিত করিনি?···আর কলঙ্ক আমার তো এইতেই বেশ

কায়েমী হয়ে রইল ভাই; সবাই দিব্যি মনে করলে—প্রহারের ভয়ে দিলে সরিয়ে, নয় তো বুড়ো তো এনেইছিল হজম করে জিনিসগুলো!"

হাসির মধ্যেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন—"নে, আর দেরি নয়, বলবে চন্দন ঘষার ঢের মানুষ আছে আমার—বৃন্দাবনে···মথুরায়···কোথায় নয়···সরে পড়বে।"

"পড়ুন না···নয়ান তো এয়েচে তোমার। সে তো রইল।"

"দেখো! সে যে আরও বিপদ! মনে করবে—আমার যে নয়ান-বধূ একাই পলাশবাটীকে বৃন্দাবন করে রেখেচে, বুড়ো তাকে কেড়ে নিলে,···নে দিদি, প্রথম দিন তো, ঐটুকুতেই হবে।"

ঘুরে বসে কোশাকুশি ঠিক ক'রে নিতে নিতে বললেন—"দেখো! নাতনী এসে ভুলের বাজার বসিয়ে দিয়েচে, আসল কথাটাই যাচ্চি ভুলে—তা তোরা হটাৎ এলি যে, বলা নেই কওয়া নেই? এই তো মাত্র সেদিন গেলি!"

দেখা হওয়া পর্যন্ত এই প্রশ্নটাকে খুব সন্তর্পণে আটতে আটকে আসছিল নয়ান, বাটিতে চন্দন তুলছিল, একটু থেমে গেল, একটু ভাবলে কি, তারপর অনঙ্গর দিকে মুখ তুলে বলল—"তুমিই বলো না গো!"

সমস্ত শরীরটাকে যেন গুটিয়ে নিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল, যদি সত্য কথাটাই বলে অনঙ্গ, সইতে হবে। জিরেন থেকে আসতে আসতে যে কথাটা বলেছিল নয়ান-বৌ, সেইটেই কাজে লাগালে অনঙ্গ, বলল—"এয়েছিলুম দুজনে মন্দিরতলার রাসের মেলায়; আপনার নাতনী বললে এতটা যখন এয়েচি চলো পলাশবাটী থেকে একবার ঘুরেই আসি না হয়।"

নয়ান-বৌ অল্প একটু হাসি মুখে করে ভ্রূ নাচিয়ে বলল—"তবু সত্যি কথাটুকু মুখে এল না! এত বানিয়ে বলতেও জানেন!"

অনঙ্গর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সেই রঙ্গপ্রিয়তা নয়ানের; মনটা আবার হালকা হয়ে গেছে তো। ভয় পাইয়ে দিয়ে মুখের দিকে দুষ্টুমি ভরা চোখ তুলে বার-দুই চাইলে ও, তারপর আবার ভ্রূ নাচিয়ে বলল—"নাতনী বললে তাই! নাত-জামাইয়ের নিজের তো কোন টান ছিল না শ্বশুরবাড়ির!"

একটু যে হেসেও উঠল, তার অর্থটা অবশ্য শুধু অনঙ্গই বুঝলে। এইটুকু চপলতায় দুদিনের জমাট গ্লানি বাতাসে উড়িয়ে পূজার দিকে ঘুরে বসল নয়ান।

ছয়

যতক্ষণ কথাবার্তা চলছিল ততক্ষণ বেশ চলছিল এক রকম; পূজার সময় মন্ত্রের গুঞ্জন ছাড়া যখন আর সব স্তব্ধ, ঠাকুরের দিকে চেয়ে আঁচল দিয়ে শুধু চোখ মুছে মুছে কাটালে নয়ান। পূজার শেষে প্রণাম করে উঠতে একটু দেরি হোল; যখন তুললে মাথা, চোখদুটি জবাফুল। গোসাঁইঠাকুর বললেন,—"বাপ মা চিরকাল বাঁধা পড়ে থাকবে?"

নয়ান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল; শুধু বলল—"নাঃ, চিরকালের জন্যে বেঁধে রেখে যাবেন।"

উঠে বাইরের দিকে চোখ পড়তেই একটু থমকে দাঁড়াল। অনেকগুলি লোক, সব বয়সেব, মেয়েপুরুষ; বিন্দুর মুখে খবব পেয়ে সবাই দেখতে এসেছে। ওর দৃষ্টিটা আপনা হোতেই একবার নৈবেদ্যেব ওপর গিয়ে পড়লো। গোসাঁই ঠাকুর ওর বিপর্যস্ত ভাবটা লক্ষ্য করে একটু সবাইকে শুনিয়েই বললেন—"তা আর কি হয়েচে?—বোষ্টমের নৈবিদ্যি, একটা ক'রে তুলসীপাতা মুখে দিয়ে দেবে, আজ প্রথম দিনও তো।"

নয়ান বেরিয়ে আসতে আসতে একজনের দিকে চেয়ে হেসে বলল—"শোন গো প্রসাদকাকা, আমি যেন সেই ভাবনাতেই মরে গেলুম!··· তারপর?"

আরও কয়েকজনের সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিযে জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিল, তারপর বলল—"তোমরা সবাই একটু বসবে, আগি এলুম বলে, অনেক কথা আচে।"

অনঙ্গ আসছিল বাড়ির দিক থেকে, সামনাসামনি হ'তে বলল—"চাবি কোথায় রাখিস হুঁশ থাকে না?"

নয়ান পেছন থেকে আঁচলটা টেনে নিয়ে হাঁ কবে রইল, চাবিটা সত্যই নেই, বলল—"ওদের জন্যে কিছু আনতে দিতে হবে যে!·· না বাপু, মাথার ঠিক থাকে না।"

"পাঠিয়েচি বিন্দুকে সেরদুই বাতাসা নিয়ে আসতে!···ভাবলাম পূজোর কাছে রয়েচে, আর ডাকি কেন, তালাটাই না হয় ভেঙে আনিয়ে নিই গে; গিয়ে দেখি খোলোসুদ্ধু চাবি লাগানই।"

নয়ানের দৃষ্টিতে তিরস্কার আর প্রশংসা দুইই উঠেছে ফুটে, একটু হেসে উঠে বলল—"কি তালা-ভাঙা রোগ বাবা, দেখিনি এমন!. তা দাঁড়াওগে ওখানে একটু, আমি আসচি।"

যেজন্যে তাড়াতাড়ি চলে আসছিল, অনঙ্গ বুদ্ধি কোরে তার ব্যবস্থা করেছেই, তবু স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ফিরে যাবার সঙ্কোচটুকু এড়িয়ে যাবার জন্যেই নয়ান এগিয়ে গেল। দেখে লক্ষ্মণ আর তার বৌ প্রবল উৎসাহে ঘর দুটো নিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মণ কাপড়ের ওপর একটা গামছা জড়িয়ে বাঁশের আগালেতে ঝাঁটা বেঁধে ঘর ঝাড়ছে, তার বৌ সোনা, একটা ঘর যে ঝাড়া হয়ে গেছে, তার মেঝেটা লম্বা হাত টেনে টেনে নিকুচ্ছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করেই বলল—"বলি এ কি কাণ্ড! মন্দিরতলায় এলুম, ভাবলুম না হয় দেখে আসি একবার বাবা-মাকে; তা বাবা-মা তো আমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আচেন! দুটো দিন যাও থাকতুম, মনে করচি আর কেন, আজই যাই ফিরে। কিন্তু তোমরা ইদিকে যে একেবারে কায়েমী ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েচ, বলি হ্যাঁ লক্ষ্মণ!"

লক্ষ্মণ চালে ঝাঁটা বোলাতে বোলাতে বলল—"যাবে—তা ছাড়ান্ পেলে তো? তানারা গেল, ঠিকই, তাব'লে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবার লোক নেই আর গাঁয়ে? · আস্তানাটা দেখে কে এখন?"

"বেশ কথা, যাকে আস্তানা পাহারা দেবার জন্যে ধরে রাখবে বলচ তাকে যে পরের হাতে বিলিয়ে দিয়েচ তোমরা, সে কথাটা মনে আচে?"

"তা থাকবে না কেন? তবে কথা হচ্চে···"

পাশের ঘর থেকে লক্ষ্মণের বৌ বলল—যার হাতে দিয়েচি বিলিয়ে তাকে সুদ্ধু আটকে রাখলেই তো হোল।"

নয়ান দু' পা সরে এসে বলল—"তা অবিশ্যি হয়, আর পারিসও তোরা। কিন্তু সে আবার যাদের সম্পত্তি তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবি? সব বাপ-মায়ে কিছু সন্তানের মায়া কাটিয়ে ব'সে নেই এমনি কোরে, তার ওপর আবার গাঁয়ের মোড়ল; এগুবি?"

লক্ষ্মণের ঘর ঝাড়া বন্ধ হোল, বাঁশের আগালেটা বেশ শক্ত করে মুঠিয়ে ধ'রে একটু গরম হয়েই বেরিয়ে এল, বলল—"মোড়ল তো আমরাও মুড়ুলি করতে জানি গো, এই ক'য়ে থুদু। বেশ, সম্পত্তির কথাই যদি উঠল তো তানাদের সম্পত্তি তানারা রাখুন গিয়ে এটকে, আমাদের সম্পত্তি আমরাও

ছাড়বনি। তুমি রাণীর মতন পায়ের ওপর পা দিয়ে গ্যাঁট হোয়ে বসে থাক।...ইস্, মোড়ল!"

"রাজাকেই দিলুম ছেড়ে!"

ওর বৌও এসেছে বেরিয়ে। বেশ আঁট করে আঁচলটা কোমরে জড়ান, বলবার ঝোঁকে ন্যাতাটাও এমন শক্ত করে ধরেছে যেন একটা অস্ত্র, দরকার হলেই বিপক্ষের ওপর ছুঁড়বে। নয়ান একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল—"আচ্ছা, তোরা যা করচিস কর দিকিন। কোথায় কি তার ঠিক নেই কত্তা-গিন্নীতে মারমুখো হ'য়ে বেরিয়ে এল!"

লক্ষ্মণের বৌ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—"না, তুমি আবার গেঁয়ের মোড়ল বলে ভয় দেখালে কিনা..."

"অপরাধ হয়েচে, মনে ছিল না, তুজন বীরপুরুষ রয়েচেন।"—হাসতে হাসতেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল—"কি জ্বালা বাবা, বদ্ধ পাগলদের নিয়ে এখন রাজত্ব করুক ওদের রাণী!"

মনটি প্রীতির রসে সিক্ত হয়ে আসছে। গোসাঁইঠাকুরকে তখন যেটুকু বললে তা নিতান্তই আবেগের মাথায়; সিঁড়ির নিচের ধাপটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নয়ান, সমস্ত আখড়াটা—এর গাছপালা, ঠাকুরবাড়ী, লোকজন, রোদ-ছায়ার আলপনা, সব নিয়ে হঠাৎ যেন বড় নূতন, বড় অপরূপ হয়ে উঠেছে ওর চোখে, এই যে তুটি মানুষের প্রাণঢালা আত্মীয়তা, কথায় আবার কাজেও —এর জন্যেই কি?...গোয়ালঘরের সামনে পেয়ারা গাছটা একপাল ছেলের দখলে, বারণ করে হার মেনে প্রসাদ শাসাতে শাসাতে এগিয়ে যাচ্ছিল, নয়ান তাড়াতাড়ি রুখল, বলল—"ওদের ছেড়ে দাও প্রসাদকাকা, তুটো পেয়ারা পেড়ে খাচ্চে তার মধ্যে আবার..."

"গাছ সাবাড় করে দেবে যে!"

"তা দিক গে; কার জন্যেই বা আগলে রাখা?"

"শোন কথা! এ্যাতদিন যা করেচে করেচে, এখন তোরা তুটিতে এয়েচিস।...তোরা নেমে আয় বলচি! নেমে আয়!"

নয়ান মুখ ঘুরিয়ে বলল—"নারে তোরা তোল যত পারিস, শুধু কাঁচা-কস্‌টেগুলো বাদ্ দিস ভাই।"

"রাধারমণের নৈবিদ্যির জন্যেও তো তুটো থাকা দরকার গাছে।"

নয়ান প্রসাদের হাতটা ধরে ঠাকুরবাড়ীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলল,

বলল—"তুমি ফের তো, রাধারমণের ইচ্ছে হয় ওদের হাত থেকেই নিয়ে খাবেন।"

এসে পড়েছে ঠাকুরবাড়ীর সামনে, প্রসাদ একবার শিউরে উঠেই সবার ওপর চোখ বুলিয়ে বলে উঠল—"শুনলে কথা!" গোসাঁইঠাকুরের দিকেও চেয়ে বলল—"কথাটা শুনলেন একবার নাতনীর—রাধারমণের ইচ্ছে হয় ওদের হাত থেকেই নিয়ে খাবেন! কি পবিত্তির সব!"

নয়ানও গোসাঁইঠাকুরকে সাক্ষী মানল—"কেন, সুদাম-সুবলের এঁটো ফল কাড়াকাড়ি করে খাননি? মিছে বলছি তো 'না' বলুন না গোসাঁই-দাদু—সামনেই তো রাধারমণ।"

একটা হাসির মধ্যে ভক্তিবাৎসল্যের সরসতা চারিদিকে পড়ল ছড়িয়ে, বড়দের মধ্যে কয়েকজন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল—"তা খেয়েচেন বৈকি …এঁটো আর খাননি?…এঁটোই যে ছেল আরও পেয়ারের… সুদাম সুবলের এঁটো পেলে আর সব কিছুই যে যেতেন ভুলে…"

গোসাঁইঠাকুর একটু যেন ফাঁপরে পড়েছেন; মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসি উঠেছে ফুটে, তবে নেহাত পূজোর সামনে বসে রয়েছেন, ঠাকুরের মর্যাদার দিকেও আবার নজর রাখতে হয়; বোধ হয় মাঝামাঝি একটা ঠাহর করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিন্দু বাতাসা নিয়ে এসে পৌছুল। কিছু না শুনুক, জোর হাসির একটা ছোঁয়াচ লেগেছে ঠোঁটের কোণে, এগিয়ে আসতে আসতে বলল—"এত হাসি কিসের গো তোমাদের?"

নয়ান বলল—"গোসাঁই-দাদু বলছিলেন—রাধারমণের নাকি সখাসখীরা এঁটো করে না দিলে কিছু মুখেই রুচত না, তাই আমি বললুম—ছাখো, তাই ভেবে বিন্দু আবার বাতাসাগুলো না চুষতে চুষতে আসে!"

রীতিমত একটা হাসির হর্‌রা পড়ে গেল।

হরির-লুটের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বাতাসা কুড়োনর হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলিতে হাসিটা আরও গেল বেড়ে।

হরির-লুট শেষ হলে গোসাঁইঠাকুর ঘুরে বেশ একটু গুছিয়ে বসলেন, বললেন—"তোরা যেমন এসেচিস, এমনি এমনি চলে যেতে পাবিনে, আখড়াটা একটু থাকবার মতন করে দিয়ে যা হাতে-নাতে, একদিনে না হয় ষ'দিন লাগে। মাসখানেক লোক নেই, অমন জায়গা যেন কি হয়ে গেছে!"

নয়ান এই প্রসঙ্গটার জন্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল, যদি নিজেকেই তুলতে হয় তাহলে কিভাবে তুলবে ভেবে সারা হচ্ছিল মনে মনে, তবু আরম্ভ করলে একেবারে উল্টোভাবেই। দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে মাথা নিচু করে শুনছিল, চোখ তুলে প্রশ্ন করল—"কেন গোঁসাই-দাদু? আমরা তো এক দিনের অতিথি ·· আজ আর হবে না, গাঁয়ে গিয়ে সবার সাথে একটু দেখাশুনো ক'রে আসব মনে করচি, কিন্তু কাল কোন সময় পজ্জন্ত তো যেতেই হবে চলে।"

"তা যাবি, ব'লে ক'য়ে ব্যবস্থা করে তো আসা নয়, তবে চলে আসতে হবে, আর শীগগিরই! তাহলে এবার সব কথা বলি তোকে, পূজোর আগে ইচ্ছে করেই তুলিনি!···প্রসাদ বল না গো, কি সব ঠিক হয়েছিল তোমাদের।"

প্রসাদই ওদিকে মাতব্বর, ভাবে-ভঙ্গিতে, কথাবার্তায় সেটুকু বজায় রাখবার বরাবরই চেষ্টা থাকে; গুটিয়ে-সুটিয়ে সিঁড়ির একধারে উবু হয়ে বসল, বলল, —"আপনিই ক'ন্, ছিমুখ থেকে শোনা আর আমাদের পাপমুখে শোনা ·"

ভূমিকাটুকু ক'রে আবার নিজেই আরম্ভ করল—"বলাবলি আর তেমন কি—কত্তা-গোসাঁই আর মা ঠাকরুণ চলে যেতে আমরা বচ্ছহারা গরুর মতন মাথায় হাত দিয়ে বসলুম তো?—তখন গোসাঁইঠাকুরই বললে—অমন করে হেদিয়ে পড়লে চলবে? একটা ব্যবস্তা করতে হবে না? কি ব্যবস্তা কোরব গো ঠাকুর, আমাদের তো মাথায় কিছুই আসচে না। ত্যাখন উনিই বাতলে দিলে--বলি নরহরি আর মেয়ে মায়া কাটিয়ে চলে গেচে বলে তো আস্তানাটা উঠিয়ে দেওয়া যায় না—এতদিনের পোরোতন একটা আখড়া—আচে তাই সবার মুখে পসাশবাটী, পলাশবাটী, নইলে তোদের পলাশবাটীকে চেনে কে?···তাই বলচি, যেমন ওরা দুজনে মায়া কাটিয়ে চলে গেল তেমনি তোরাও মেয়েকে আর জামাইকে এনে বসা। তখন কথা উঠলো···"

নয়ানের অত শোনবার দরকার ছিল না। ওরা যে চায় ওদের দুজনকে, আর তার মধ্যে গোসাঁইঠাকুরও যে আছেন এইটুকুই ওর পক্ষে যথেষ্ট। তবু একটু যেন খটকা আছে একজায়গায়, সেটা পরিষ্কার করে নেবার জন্যে একটু ঠাট্টার ভাব দেখিয়েই বলল—"ব্যস্, দাদু বললেন আর তোমরাও মেতে উঠলে! দাদুর তো ভীমরতি ধরেচে, তা'নইলে তোমাদের বললেন ডেকে এনে বসাতে, এদিকে জিনিসপত্র যা ছিল সব দিলেন পাঠিয়ে।"

গোসাঁইঠাকুর হেসে বললেন—"তা বুঝলিনি? ডেকে এনে বসালেই তো চলবে না, তাদের ছেলে-বৌ তারা ছাড়বে কেন? তাই ঠিক হ'ল এখানকার

কয়েকজন ভারিক্কে লোক তোর শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলে রাজী করাবে। ওরা বললে আমাকেও যেতে হ'বে; আমি বললুম আমি ছটাক খানেকের মানুষ, ভারিক্কে হলুম কবে? তা সে কথা শোনে কে? যেতেই হবে, তা প'ড়ে গেলাম অসুখে। অসুখে পড়ে যেতে ঐ মালপত্তরগুলো হয়ে উঠল এক বিপদ—সেরে উঠচি না দেখে প্রসাদ এরা মনে করলে ঐগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে তাই বুঝি সেরে উঠতে চাইচি না। তাই সেরে উঠতে না উঠতেই ওগুলো বিদেয় করবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলুম—গেল অবিশ্যি কাল, পথ্যি করার দুদিন পরে—"

প্রসাদ প্রভৃতি কয়েকজন লজ্জিত ভাবে কাটান দেবার চেষ্টা করতে লাগল—"তা কখনও পারি মনে করতে?···গোসাঁইঠাকুরের যেমন কথা।···উনি হচ্চেন দেবতা মানুষ, ওঁকে কে ওকথা বলবে? ··অবিশ্যি, মন্দ লোক কি নেই গাঁয়ে?"

গোসাঁইঠাকুর হাসতে লাগলেন। একটা যে কথা উঠেছিল সেটার এই ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বললেন—"সত্যি কি তোরা বলেছিলি, না, পারিস বলতে? নাতনী বললে ভীমরতি হয়েচে, নতুন মানুষ পেয়ে সাবেকেরটাকে একেবারে বুড়ো অথর্ব করে বাতিল করে দিলে, কথাটা তো ভালো নয়, তাই একটা বানিয়ে বলে দিলুম। যা সব লেগে পড় দিকিন।"

সমস্ত দিন হৈ হৈ করে কেটে গেল। ব্যাটাছেলেরা রইল বাগান নিয়ে। নয়ান প্রথমটা বিন্দু আর লক্ষ্মণের বৌ সোনাকে নিয়ে ঠাকুরঘরটা নিয়ে পড়ল। ঝেড়েঝুড়ে ঠাকুরের সাজগোজ করাচ্ছিল, তারই মধ্যে মাথায় একটা খেয়াল আসায় তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। প্রসাদরা যেখানে কাজ করছিল সেখানে গিয়ে আঁচলটা পেতে অল্প একটু বিছিয়ে ধরে বলল—"মাধুকরীতে বেরিয়েচি গো প্রসাদকাকা; আরও সবাই তো রয়েচ, বাড়ি বাড়ি আর কেন যাই?"

প্রসাদ চটে গেল—কথার ছিরি দেখো মেয়ের! দুটো পেট, মাধুকরীতে বেরিয়েচেন তার জন্যে, কী, না, কত্তা-গোঁসাই এখানে নেই!"

নয়ান বলল—"দুটো নয়···"

"তবে?"

নয়ান একবার নজটা চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল, বলল—"জন পনের তো হবে, আর ঠাকুরঘরেও ঐ রকম···জন পনের।"

প্রসাদ একটু বিস্মিত হ'য়ে বলল—"ঠাকুরঘরে তো মাত্তোর তোরা তিন-জন আচিস শুনলুম!"

"তিনজনই, তবে তার মধ্যে একজন বিন্দু।"

কয়েকজন একত্র হয়েছে, একটু হাসি পড়ে গেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই রান্নাঘরের দিকেও বেশ খানিকটা সাড়া পড়ে গেল। সব মিটে-মাটে যেতে বিকেল গড়িয়ে পড়ল। সমস্ত দিনটাই এখানে কাটিয়েছে সবাই, সন্ধ্যা পর্যন্ত যে যার বাড়ি চলে যাওয়ায় জায়গাটা একেবারে খালি হয়ে গেল।

আল্‌গা ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দুজনে। সমস্ত দিনের হৈ-হল্লায় নয়ান বেশ একটু আলুথালু, নিজেকে দেখবার সময় তো পায় নি। লাগছিল ভালোই—নয়ান তো সব রূপেই মিষ্টি। তবুও কথাটা বলবার ইচ্ছা হওয়ায় অনঙ্গ একটু দূর থেকে ঘুরিয়ে আরম্ভ করল—"সমস্ত জায়গাটা পোস্কের-ঝোস্কের হ'য়ে বেশ তকতকে দেখাচ্চে··"

নয়ান একটু দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল—"সমস্তটা আর হোল কোথায় গোসাঁই, আসল জায়গাটাই তো হয়নি। তুমিই যে নোংরা থেকে যেতে দিলে।"

"তোর হেঁয়ালি ছেড়ে কথা বল।"

"চলো ওই ঝুমকো জবার চাতালটায় বসি।"

"বেশ তো বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলুম একটু।"

"চলো না। ঐখানটায় বসলে আমায় আরও সুন্দর দেখায়। কথাটা বললে একচোট চটবে কিনা আমার ওপর, তাই সাবধান হচ্চি।···চলো।"

টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল, তারপর কাছে থাকলে যেমন নেতিয়ে গায়ে পড়ে সেই ভাবে নেতিয়ে পড়ে বলল—"তুমি তখন মিথ্যে কথাটা কেন বলতে গেলে অমন করে রাধারমণের সামনে গোসাঁই—ওই যে মন্দিরতলার রাস দেখতে এসেছিলুম, মনে করলুম বাবা-মাকেও দেখে আসি একবার··· বললে না?"

অনঙ্গ এতটা বিস্মিত হয়ে পড়েছে যে দু'হাত দিয়ে সোজা করে বসিয়েই দিলে নয়ানকে, মুখের ওপর চোখ রেখে বলল—"এই-ই না শিখিয়েছিলি? তারপর নিজেও তো ওই কথা বলেচিস সবাইকে সমস্ত দিন।"

ওর হঠাৎ ভাবান্তরটা দেখে ভেতরের হাসিটা চাপতে ঠোঁটদুটো কুঁচকে কুঁচকে উঠল নয়ানের, গম্ভীরভাবেই বলল—"নতুন কথা শোন আজ গোসাঁইয়ের

মুখে! আমাদের আবার মিথ্যে কথায় দোষ লাগে নাকি? ঘর ছেড়ে কপট শিরোমণির সঙ্গে ঘর করি আমরা, মিথ্যে তো আমাদের ব্যবসায়ই। হুকুমই তো আচে—

যাইবি দক্ষিণে থাকিবি পশ্চিমে
বলিবি পূরব মুখে।
গোপন পিরীতি গোপন রাখিবি,
থাকিবি মনের সুখে॥
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
সাধিবে মনের কাজ
সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি,
তবে ত রসিকরাজ॥"

একটু হেসে তাকিয়ে নেতিয়ে পড়ল গায়ে, বলল—"সত্যি বলচি গোসাঁই, মিথ্যে আমার বেশ লাগে। কালোর মতন, মিথ্যে না হলেও কেমন যেন রস জমে না।"

"বেশ তো, তা হলে তো চুকেই গেল ন্যাটা, নেহাত রাধারমণের সামনে হয়েচে বলে সাধু সাজতে চাইচিস?"

"তা হলেও তো বেঁচে যেতুম গোঁসাই—রাধারমণ যদি ওই কালো পাথর-টুকুর মধ্যে আটকে থাকতেন। কোনখানটা নেই?"

"বড় বড় কথা আওড়াচ্চিস!...তবে, হ্যাঁ, একটা কথা তো ঠিক, মিথ্যে কথাটা বলা হোল—যেভাবেই হোক, তুইও সায় দিয়ে গেলি, কিন্তু উদ্ধব জিরেন থেকে ফিরে এলেই তো সব জানাজানি হয়ে যাবে।"

"কিছুই জানাজানি হতে পারে না, অন্তত বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তো নয়ই—ওইতো বললুম, শঠের রাজাকে নিয়ে কারবার আমাদের, মিথ্যে সামলাবার সে ক্ষ্যামতাটুকু আচে; ভেবেও কি রাখিনি? কিন্তু..."

"আবার কিন্তু কি? যা ভেবে রেখেচিস, কর—সামলাতে তো হবে, সময়ও তো নেই!"

নয়ান উঠে পাশেই মাচাটার একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল, লতার একটা ফুল তুলে নিয়ে মুখ হেঁট করে নাড়াচাড়া করতে লাগল। অনঙ্গ হেসে বলল—"কু-পরামর্শ দিচ্চি বলে আর ছুঁবিও নি?"

নয়ানও একটু হাসলে, কিন্তু কথাটা কানে তুললে না। আবার গম্ভীর

হয়ে পড়ে মুখ তুলে বলল—"গোসাঁই, আমায় জিরেন থেকে কেন চলে আসতে হোল জান?—আমি যা নয় তাই হ'য়ে থাকতে পারলুম না বলে। আমি ভেবে কূল পাচ্ছিনে, এই সোজা কথাটা আমি ভুলে বসলুম কি করে, আর এত শিগ্‌গীর!···ভুলেও থাকতুম, সামলেও নিতুম ওদিকে, তারপর হঠাৎ আজকের ব্যাপারটুকুতে যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল।"

"কি ব্যাপার?"

"এই যে এদের প্রাণ দিয়ে পড়া। গোসাঁই, এই যে এরা এত ভালবাসে—বাবাকে, মাকে, আমাদের এই আখড়াটাকে—এর প্রত্যেকটি গাছপালা সুদ্ধ্য—মিথ্যে যেখানে ভাল সেখানে ভাল, কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্চে, এর মধ্যে মিথ্যের যেন এতটুকু জায়গা নেই। তাই ঠিক করেচি গোসাঁই, এখানকার নয়ান যেমন গিয়েছিল জিরেনে, বদলায়নি বলে ঝাঁটা খেয়ে এসেচে, তেমনি সেই ঝাঁটা-খাওয়া নয়ানকে যদি এরা ভালো মনে জায়গা দিতে পারে তো দিক, নয়ত···"

আর পারল না। খুঁটির ওদিকে মাথাটা ঘুরিয়ে নেবে ভেবেছিল, তাতেও সামলাতে না পারায় তাড়াতাড়ি আঁচলটা তুলে চোখে চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে যখন আবার আঁচল নামিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল, অনঙ্গ খানিকটা আর কিছু বলল না, তারপর জিগ্যেস করল—"কি করবি তাহলে?"

যেন বড় বড় কথা বলতে হচ্ছে বলেই ওদিকে একটা অপ্রতিভ ভাব লেগেছিল নয়ানের মুখে। এখন আর সে ভাবটা নেই, মুখটা যেন বরং একটু কঠিন। উত্তর করল—"গোসাঁই-দাদুকে সব কথা বলব—আগাগোড়া।"

"একটু ভেবে দেখবি নি?"

"ভাববার মধ্যে তো যার ওপর সব চেয়ে বেশি ভরসা সেই যদি সব আগে ছেড়ে যায়···"

অনঙ্গ একটু হাসলে, তারপর বলল—"ধর্, যদি যাই-ই ছেড়ে?"

নয়ান চাতাল ছেড়ে নেমে দাঁড়াল, ওর কথার উত্তর না দিয়ে বলল—"চলো ওদিকে, গোসাঁই-দাদু শেতল দিতে আসবেন ঠাকুরের, গোছগাছ না সেরেই চলে এসেচি ওবেলা।"

সাত

সেই সব কথাই বলছিল নয়ান।

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন গোসাঁইঠাকুর, শেষ হ'লে সে ভাবটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলেই হেসে বললেন—"ওঁর যে এই রীতই দিদি, তুই করবি কি?—এদিকে বাঁশির সুরে ডাকেনও, ওদিকে শাশুড়ী-ননদের সঙ্গে ঝগড়া ঘটিয়ে তাদের বৈরী করেও তোলেন।"

আবদারে, অভিমানের সুরে নয়ান বলল—"দাগটা তো আমাদেরই লেগে থাকে দাদু।"

"লেগে থাকতে দিস বলেই থাকে ভাই। শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতম্ বলে দেখ দিকি খুঁজে আর দাগ কোথাও আচে কিনা; আমাদের কলঙ্কের দাগ মেখে মেখেই তো সারা অঙ্গ কালো ক'রে ফেলেচেন।"

কথাটা হয়তো সত্য; যেন ফললই বলে মনে হয়—

পরের দিন বিকেলে উদ্ধব এসে পৌছুল। নয়ান গিয়েছিল গাঁয়ের দিকে, দেখাশোনা করতে, যখন ফিরল, দেখে গাড়ির বলদগুলো খুলে দিয়ে পাশেই একটি ছোটখাট জটলার মধ্যে হাঁটুমুড়ে ব'সে গল্প করছে। লক্ষ্মণ আছে, দ্বিজু আছে, তিনচারটে ছেলে-ছোকরা রয়েছে; একটু তফাতে গাড়ির চাকার খানিকটা আড়াল হয়ে লক্ষ্মণের বৌ সোনা মেয়েটাকে কোলে ক'রে র'য়েছে, দাঁড়িয়ে। বাঁশের আগলের বাইরে থেকেই দেখতে পেয়ে বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠল নয়ানের, হাঁটু দুটো যেন অবশ হয়ে গেল। কোন রকমে আগল ডিঙিয়ে আস্তে আস্তে কাছে এসে শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"কি গো, উদ্ধব যে তা এত দেরি?"

"দেরি..."

উদ্ধব কথাটাতে টান দিয়ে কাপড়ের খুঁটের একটা গেরো খুলতে খুলতে দাঁড়িয়ে উঠল। একটা ভাঁজ-করা কাগজ হাতে তুলে দিয়ে বলল—"এই নেও।" তারপর আগেকার কথাটা শেষ করলে—"দেরি...বলি আসতে দেবে তবে তো, একেবারে বেঁধে মারবার লক্ষণ; সেই কথাই তো ওদেরকে বলছিনু এতক্ষণ..."

নয়ানের গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে চিঠিটা নিচে পড়ে গিয়েছিল, তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল—"তার মানে?"

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দুটোর দিকে চেয়ে একটু ভেবে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল—"দাঁড়াও, এক্ষুনি আসচি।"

বাড়ির দিকে চলল, আড়ষ্ট পায়ে যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। গাড়ি দুটো খালি দেখেই এসেচে, এদিকে কিন্তু বারান্দাও খালি, ঘর দুটোও খালি। ফিরে এল, কিন্তু কিভাবে কথাটা তুলবে ভেবে পাচ্ছে না, তারপর ঠোঁট দুটো জিভে ভিজিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল—"জিনিসগুনো তাহলে…"

উদ্ধব মুখিয়েই ছিল, বলল—"সেই কথাই তো বলছিনু—জিনিস দেখে সে কী আহ্লাদ দুজনার! ··তা, দুজনারই বৈকি, কুটুমবাড়ির নোক গেচি, গিন্নী তো আর অতটা প্রেকাশ ক'রে বলতে পারেন না, তবে কত্তা—তানার আহ্লাদ যেন আর ধরে না। আর কী খাতির! কোথায় থোবে, কি করবে যেন ভেবেই পায় না, তার সাথে খাওয়ান-দাওয়ানের ঘটা। আর তামুক সে তো অষ্টপহরই চলচে, কলকের আগুন নিভতে পায় না। মেয়ে না রইল তো নিজেই সেজে আনচে।···আহা, করেন কি, করেন কি মণ্ডলমশাই! না, সে কি কথা, তোমরা হ'লে কুটুমের বাড়ির লোক. এ তো ভাগ্যি আমার!···হাঁ, বোষ্টম বলতে হয় তো ঐ ওনাকেই, যেন মাটির সঙ্গে মিশেই রয়েচে!···দেরি? —ছাড়চে কে যে এসবো? আদরের চোটে একেবারে অন্ধকার দেখিয়ে দিলে তোমার শ্বশুল দিদিমণি, তাইতো বলছিনু এদেরকে—বেঁধে মারা আর কাকে বলে? মড়া নাড়ি, অত আদর অত অভ্যত্থনা কি আমাদের সহ্যি হয়? তাই বলছিনু···"

নয়ান অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল, কিম্বা হয়তো অভ্যর্থনার অতিরিক্ত অন্য কিছুও শোনবার প্রত্যাশায় ছিল, হেসে জিগ্যেস করল—"আর কিছু কথাও হোল উদ্ধব, না, খেতে-খাওয়াতেই সব সময়টুকু গেল কেটে?"

"কথা একরকম হোল? কোন্ কথাটা হোল না তাই জিগোও না বরং।"

নয়ান যেন একটু ভেবে নিলে, তারপর জিগ্যেস করল—"এই ধরো···ধরো না কেন—এই আমাদের কথা?"

উদ্ধব চুপ ক'রে গিয়ে একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগল; মনে হোল, হয় এত বেশি কথা হয়েছে যে কোন্‌টে থেকে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না, নয় এত কম যে কথার রাশি থেকে খুঁজে বের করতে হয়রান হচ্ছে। নয়ান হেসে বলল—"থাক্, সে বোধ হয় খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে চাপা পড়ে গেচে, পরে শুনলেই হবে।···হ্যাঁ, এইতো একটা চিঠিও দিয়েচে।"

মুঠোর মধ্যেই ছিল চিঠিটা, ভাঁজ খুলে দেখলে। ময়লা একটা চিরকুটে ফিকে ভূষির কালিতে দুটি লাইন লেখা; সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হ'য়ে এসেছে, পড়া গেল না।

· জিগ্যেস করল—"কে দিয়েচে? বাবা?"

উদ্ধব মাথা নাড়লে, না, সে দেয় নি। বলল—"খেয়েদেয়ে গুড়ুক টেনে গাড়ি নিয়ে বিদেয় হনু তো? মণ্ডলমশায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে অন্য পথ দে গাঁয়ের পানে ফিরে গেল—কত তোমার গিয়ে আত্তিস্থি!—কুটুমের বাড়ির নোক, কিছুই করতে পারলুম নি—দুটো দিন আরও থেকে গেলেই হোত—সে কতো কথা! উনি চলে যেতে খানিকটা এগিয়ে গাঁয়ের বাইরে এসে পড়েচি—মনে হোল যেন শেতলা-তলাই—সেখেন থেকে জামায়ের বুন বেইরে এসে গাড়ি থাম্যে চিঠিটা দিলে, বললে, বলে দিও · কী যে নামটা বললে···"

"টগী?"

"হ্যাঁ, টগী, টগী! ঐ নামই কইলে।"

"বেশ, তোমরা এসো, একটু জলটল খাও, হাক্লান্ত হয়ে রয়েচ।"

বাড়িতে গিযে সন্ধ্যা জ্বেলে চিঠিটা পড়ল। শুধু লেখা রয়েছে—রাগ পড়ল নাকি? ইদিকে তো সব ঠিক।

টগর নিজে লিখতে পড়তে জানে না। যেই লিখে দিক, চিঠিটা যে তাড়া-হুড়ার মধ্যে লেখা, টগর কাকা-কাকীকে লুকিয়ে কোনও ফাঁকে লিখিয়ে নিয়েছে, এটা বেশ বোঝা যায়,—চিঠির ধরণেও, আবার শেষের অক্ষরটায় এমন একটা টান পড়ে গেছে যে মনে হয় শেষ হ'তে না হ'তেই টেনে নিয়ে ছুটেছে টগর।

চিঠিটা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে, দেখে অনঙ্গ আগল ডিঙিয়ে এদিকে আসছে। প্রথমটা মনে হোল দেখায় চিঠিটা, তারপর হঠাৎ এমন তাড়াতাড়ি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেললে, যেন এখনই কি একটা মারাত্মক ভুলই না ক'রে বসত!

এক সময় টিনের বাক্সর মধ্যে রেখে দিলে সেটা।

অনেকখানিই পরিষ্কার হ'য়ে গেল ব্যাপারটা, অন্তত কুৎসিত গোছের কিছু হোল না, বা, যদি রাধারমণের দয়াই তো হোতে পেলেই না বলা উচিত; যেমন আশঙ্কা ছিল, জিনিসপত্র তো ফিরিয়ে দেওয়ারই কথা, কটু-কাটব্য

ক'রেই। হোল পরিষ্কার খানিকটা, তবু যেন খানিকটা খুঁৎ থেকেই গেল। শ্বশুরের মনের ভেতরের কথাটা কি? আদর-অভ্যর্থনাটা আন্তরিকই; খাম-খেয়ালী মানুষ, নয়ান জানে সেদিক দিয়ে ওর একটা উদারতা আছে, একটা কিছুর ঢেউ এলেই মনটা ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। অনঙ্গর কাছে মন্দিরতলার ইতিহাসটা শুনেছে; অবশ্য হাসির কথাই বেশি, ত্যাজ্যপুত্র করতে এসে একে-বারে অধিকারী হয়ে বসা, তবু তার মধ্যে একটা খাঁটিও কি যেন আছে কোথায়। মনটাকে বড় মিষ্ট ক'রে রাখে খানিকক্ষণ। যেন মনের ভেতর থেকে একটা ক্ষমা, যেন মিটমাট তো হয়ে গেল, আর কেন?

কিন্তু এর পাশেও তো আর একটা কথা এসে পড়ে। এত অভ্যর্থনা, কিন্তু ছেলে-বৌয়ের কথা কিছু হোল না কেন?…কিম্বা হয়েছিলই, উদ্ধব মনে করে উঠতে পারলে না, কিম্বা বলতেই পারল না গুছিয়ে!

তারপরে আছে শাশুড়ীর কথা। ওকেই যত ভয় নয়ানের। উদ্ধবের কথাতেও বোঝা গেল, লোভেই হোক বা যে জন্যেই হোক গোলমালটা করেনি বটে, কিন্তু রাগটা পড়েনি তার।

আর একটা খুঁৎখুতুনিও দিনকতক—কয়েক মাসই লেগে রইল মনে। জিনিসগুলো রেখেই যে নিলে তা কি ভেবে? ঐ লোভের টানে? কিম্বা ঐ একটা ইঙ্গিতে ছেলে-বৌ ফিরে আসবে। এলে জায়গা পাবে? কিম্বা একদিন এসে নিজেই নিয়ে যাবে শ্বশুর?

চিন্তাগুলো লেগে রইল মনে অনেকদিন, ফিরে যাওয়া ভালো হবে কি মন্দ হবে তার চুল-চেরা বিচার পর্যন্ত—নিজে হতেই হোক, বা শ্বশুর আসার জন্যেই হোক। কিন্তু যাওয়ার কথাও উঠল না, কেউ নিয়ে যেতেও এল না। চিন্তাটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল এক সময়।

ইতিমধ্যে পলাশবাটী—তার আখড়ার লতাগুলোর মতোই—একটার পর একটা তন্তু বাড়িয়ে যেন আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটাও সত্য যে যতটা নয়ানকে জড়াতে পারছে ঠিক ততটা যেন অনঙ্গকে পারছে না। অনঙ্গর প্রকৃতিটা ওর বাঁশির ফুঁয়ের মতোই হালকা; বাঁধা পড়ে, সুর সৃষ্টিও করে; কিন্তু বাঁধা প'ড়ে থাকতে পারে না। এখানে নয়ানের কাজ আছে; শুধু আখড়াটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই তো মস্ত একটা কাজ, তারপর আবার অনঙ্গকে চালানো; কিন্তু

অনঙ্গর কোন যেন কাজ নেই। একটা কাজ নিশ্চয় নয়ান নিজে, তাকে নিয়েই তো ওর ওদিককার সমস্ত জীবনটা—এই বছরখানেক ধ'রে, তবু, পুরুষ যতটা একজন মেয়ের পক্ষে একটা কাজ, মেয়ে ততটা একজন পুরুষের পক্ষে হতেই পারে না। নয়ান বোঝে সেটা, তাই অনঙ্গকে নিয়ে ওর সুখ বেশি কি অসুখ বেশি সব সময় বুঝে উঠতে পারে না।

কাজের অভাবের আর একটা কারণ, অনঙ্গ এখানকার জামাই। বাড়ির ছেলের একটা মস্ত বড় সুবিধা, ছোট বড় সব রকম কাজে তার একটা সহজ অধিকার আছে ; শ্বশুরবাড়িতে কিন্তু মানানসই আর বেমানান বাছতে হয়। জিরেনে লাঙল ঠেলতে ঠেলতে ক্লান্ত হ'য়ে কোমর থেকে বাঁশিটা বের ক'রে বাজিয়ে নিয়েছে অনঙ্গ। এখানে ঘোরাফেরার মধ্যেও বাগানটা একটু পরিষ্কার করতে হোলে একটা মুনিষ কিম্বা ব্যাগার না ধরে আনলে চলে না। একে কাজই কম, মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে যেটুকু বা আছে তাও যায় উবে। নয়ানের দৃষ্টিই আবার বেশি সতর্ক এদিকে।

তবু কাজ আছে বৈ কি, ভালো কাজ, আর আসল কাজ, যার আশায় এখানে গোড়াপত্তন করা নয়ানের। আখড়ার দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে, ভালোরকমই ; জমি-জমা, পুকুর, প্রজা ; সে-সব দেখাশোনা করা, আদায়-পত্র। তুলেছিলও কথাটা একবার অনঙ্গর কাছে। অনঙ্গ শিউরে উঠে জিগ্যেস করল—"তোর মতলবখানা কি? আমায় তোর পাটোয়ারি করে রাখবি?"

"আমার পাটোয়ারি? সম্পত্তিটা আমার, না, রাধারমণের?"—হেসেই উত্তর করলে নয়ান।

"মানলুম রাধারমণেরই ; তা কি বলতে চাস? তোর রাধারমণ বাঁশি বাজিয়ে বেড়াবেন আর আমি তাঁর পাটোয়ারিগিরি করব?"

কথাগুলো ঠাট্টা করেই বলা, অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে যে শিউরে উঠল, সেটাও অভিনয়ই, তবু আর প্রসঙ্গটা বাড়ালে না নয়ান ; অনঙ্গের কথাটুকু ঘুরিয়ে নিয়ে হেসে বলল—"আচ্ছা গো আচ্ছা ; আমার রাধারমণ বাঁশি বাজিয়েই বেড়ান, আমিই তাঁর পাটোয়ারিগিরি করব না হয়। হোল তো?"

আর কখনও তোলে নি কথাটা। ওকে নিয়ে যে নয়ানের অশেষ ভয় ; ওর ঠাট্টা, অভিনয়ের আড়ালে যে সত্যটুকু লুকিয়ে আছে সেটাকে বাইরে টেনে এনে দেখতে সাহস হয় না।

যে কাজগুলো মনে ধরে, বয়স আর অভ্যাসের দিক দিয়ে, সেগুলোর সামনে এসে দাঁড়ায় জামাই-মর্যাদা, যেগুলো জামাই-মর্যাদার সঙ্গে বেশ মানায়, সেগুলোতে মন সায় দেয় না।

বাকি থাকে নয়ান আর বাঁশি।

তাই সব কিছু থেকে এক রকম আলাদা হ'য়েই এই দুইকে নিয়েই কাটাতে লাগল অনঙ্গ।

আট

যার কানে যায় বাঁশি তাকেই যে শুধু ঘড়ছাড়া ক'রে তোলে এমন নয়, সে নিজেও যেন কেমনধারা বারমুখো—ঘরছাড়া—দূরপিয়াসী।

আখড়ার মধ্যেও বাঁশি বাজায় অনঙ্গ, তবে সে একরকম অবসর-বিনোদনের জন্যই। নয়ান রয়েছে কাজে, নিজেও যে কি একটা করবে খুঁজে পাচ্ছে না, বাঁশিটা নিয়ে আখড়ার একপ্রান্তে নিরিবিলি দেখে একটা জায়গায় ব'সে যায়। মন বসল তো বাজিয়েই চলে, না তেমন জুৎ হোল তো চ'লে এসে নয়ানের কাজে বাগড়া লাগায়। এ যেন কতকটা ওর বাঁশিকে টেনে নিয়ে বেড়ানো। বাঁশিও ওকে টানে, আর সে যখন টানে ঘর ছাড়িয়েই বের ক'রে নিয়ে যায়।

বারুণী নদীর ধারে একটা জায়গা আছে। এমন যে কিছু কাব্যময় তা নয়, আর, অনঙ্গও তো কবি নয়। নদীর পাড়টা এখানে বেশ উঁচু; সামনে নদী, বাঁদিকে আর নদীর ওপারে টানা মাঠ, গ্রাম নেই একেবারে; ছুটকো-ছাটকা দু'একটা ঘর যদি থাকেই তো নদীর ভাঙাচোরা উপকূলে কোথায় লুকিয়ে আছে টের পাওয়া যায় না। জায়গাটা খেয়াঘাটের বাঁদিকে খানিকটা দূরেই, তাতে আখড়াটাও বেশ খানিকটা দূরে প'রে গেছে, পলাশবাটী গ্রামটা আরও দূরে। লোকালয় বলতে ওদেরই দু'ঘর প্রজার বাড়ি—লক্ষ্মণ আর দ্বিজুর; তাও খেয়াঘাটের ডান দিকে প্রায় এতখানিই তফাতে; ওতে দিনের বেলাতেও জায়গাটার নির্জনতা ঘোচে না।

বাঁশি যদি টানলে তো এইখানটায় টেনে নিয়ে আসে অনঙ্গকে। দিন হোল তো দিনের শেষে; রাত হ'লে তার আর কোন লগ্ন নেই! ঘুম হয়

না, কিম্বা হঠাৎ জেগে উঠে আর আশাই থাকে না ঘুমের। একটা অস্বস্তি, মনে হয় সুরে সুরে সারা বুকটা যেন বোঝাই হয়ে আছে, এত বোঝাই যে নদীতীরে সেই অনন্তমুক্ত জায়গাটুকু না হ'লে আর আঁটবে না।

যেদিন নয়ানও থাকে জেগে তাকে হয়তো সুধায়—"যাবি ?"

"কোথায় ?"—জানে নয়ান, মনে মনে চটে, না জানার ভান করে জিগ্যেস করে।

একটু থতমতই খেয়ে যায় অনঙ্গ, স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ নয় তো, যেন নিশির ডাকেই সাড়া দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ; আমতা-আমতা ক'রে বলে—"এই···ঘুম হচ্চে না—মনে করছিলাম বাঁশিটাই না হয় একটু বাজাতুম।"

"তা বেশ তো, বাজাও না ; আমিও রয়েচি কাছে, আমার জন্যেই তো বাঁশি ?"—টানা চোখে একটু হাসি ফোটাবারও চেষ্টা করে।

সঙ্গে সঙ্গে একটু খোঁচাও দেয়—"না, রাত দুপুরে আর কারুর ঘুম ভাঙানো দরকার হয়ে পড়েচে ?"

"তোর ঠাট্টা ! বলে, নিজেরই ঘুম হচ্চে না—ছটফট করচি—তাই মনে করচি না হয় বাঁশিটা নিয়েই বসি একটু ·"

"বেশ তো, বোস না···"

"এখানে ? ··বলছিলুম নদীর তীরে সেই জায়গাটায় যেতিস—বেশ খোলা হাওয়া, আর দিব্যি নিরিবিলি কেমন !"

"নিরিবিলিই দরকার তো লোক সঙ্গে নিচ্চ কেন ?"

কথা না বাড়িয়ে পাশ ফিরে শোয়। একটু উসখুস করে উঠে পড়ে অনঙ্গ ; বাঁশিটা নিয়ে বলে—"কপাটটা দিয়ে দে, আমি আসি ঘুরে একটু।"

নয়ান নাক ডাকায়।

এক একদিন নয়ানের ঘুমটাই হঠাৎ যায় ভেঙে, দেখে পাশে অনঙ্গর জায়গাটা খালি।

এই শূন্যতা, তার সঙ্গে নিথর রাত্রির কান্নার মতো বাঁশির সুর—কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই যেন বুঝে উঠতে দেয় না নয়ানকে ; আচ্ছন্ন ভাবে প'ড়ে থাকে।

তারপর এক সময় উঠে পড়ে, মন্দিরতলায় সেই প্রথম শোনা বাঁশির সুর থেকে আজ পর্যন্ত সুরে-বেসুরে যা কিছু ঘটল জীবনে সব মিশে গিয়ে এমন

একটা কী যে হয়, না উঠে যেন উপায় থাকে না। ঘরে তালা এঁটে নেমে আসে, বেরিয়ে পড়ে অভিসারে, আপন জনের কাছে যেন পরকীয়া হ'য়ে।... পাশটিতে গিয়ে বসবে, গায়ে লতিয়ে প'ড়ে অভিমানভরে সুধাবে—"ডেকে নাওনি কেন গোসাঁই ?"

"আর, যদি ডাকলুম তো পাশ ফিরে নাক ডাকাবি ; তোদের ধাত বোঝা যে দায় বৌ।"

"তোমাদের জানতে দিতে আছে ধাত !"—এ কথাটা অবশ্য মনে মনেই বলবে নয়ান, বাইরে রাগ দেখিয়ে বলবে—"বাবাঃ বাবা ! কবে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুমের ঘোরের কথা, খেয়ালও নেই,—গোসাঁই কিন্তু ঠিক মনে করে ব'সে আচে !"

বেশ একটি ঝগড়ার গোড়াপত্তন হবে। কি কথার ওপর কি উত্তর হবে মনে মনে তার মহড়া দিতে দিতে এগিয়ে চলে ; ঝগড়ার মতো মিষ্টি আর আছে কি কিছু ?

হঠাৎ একটা কথা মনে হয়ে বুকটা ধক ক'রে ওঠে। নয়ান পা চালিয়ে দেয় ; খেয়াঘাটের ওদিকে নয়, এদিকেই, লক্ষ্মণের বাড়ির দিকে।

সোনার ঘরের জানালায় টোকা পড়ে—টক্, টক, টক...

খুব পাতলা ঘুম সোনার, ভয়ডরও কম, "কে ?"—বলে উঠে প'ড়ে জানালার কাছে মুখ নিয়ে আসে একবারে।

"ওমা, তুমি !"

"চুপ।"—ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করে নয়ান, চাপা গলায় বলে—"উঠোসনি লক্ষ্মণকে ; বেরিয়ে আয়।"

মনটা হালকা হয়েছে, সোনা বেরুতে বেরুতে একটা মনগড়া কিছু ঠিক ক'রেও নেয়, যেদিন যে রকম মনে আসে—

"শুনচিস না বাঁশি ?"

সোনা মুখটা ঘুরিয়ে ওদিকে চেয়ে নেয় একবার, ধবলী গাইটার ডাক শুনলেও যেভাবে চাইত ; জিগ্যেস করে—"কুটুম বুঝি ?...তা কী ?"

"নেকী !...ঘর ছেড়ে চলে এয়েচে ; একলা ভয় করে না ? তাই মনে করলুম সোনাকে না হয় ডেকে নিই একবার, যাবি ?"

"যা চলো না।"

"লক্ষ্মণ যদি উঠে পড়ে ?"

"উঠল অমনি !···গঁ্যাজার ঘুম। ওঠে, এসে বলে দিলেই হবে দিদিমণিকে আগলাতে গেছনু আখড়াবাড়িতে।"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেই হয় নয়ানকে। তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—"নাঃ, তুই থাক, কচি মেয়েটা রয়েচে···"

"উঠলে সামলাবে'খন।"

"নাঃ, থাক তুই। যখন এয়েচিই এতটা, এটুকু এগিয়ে ডেকেই নে যাই ; কতকক্ষণ বসে বসে বাঁশি বাজাতে থাকবে ?—পাড়ায় একটা উপদ্রব !··· তুই ততক্ষণ একটু জেগে থাকিস বরং—গা ছমছম করে তো—নিষুতি রাত···"

"আসিই না তাহ'লে।"

"মরণ !···অত বেপরোয়া হ'য়ো না, কোন্‌দিন ঐ করেই মরবে তুমি।··· যা, আমি যাই।"

কিন্তু মনে মনে জানে, সোনা কোনদিন মরবে না। ওর কথাই ভাবতে ভাবতে যায়। হিংসা হয়, লক্ষ্মণটাকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে ক'রে রেখেছে। যেখানে যাবে, লক্ষ্মণ ঠিক সঙ্গে আছে, আগে নয় পেছনে, যেন কেনা গোলামটি। থাকে না, যখন বৌয়ের হয়ে বাড়ির কোন পাট সারতে হয় ; তাতে কিছুই বাদ নেই।

চলতে চলতে কতদিনের সেই সব কথা মনে পড়ে নয়ানের—

নয়ান গালে হাত দিয়ে বলছে—"হ্যাঁলা, তুই ওকে দিয়ে ধান ভানাসও যেন !"

সোনা বলছে—"একা ভেনে দিচ্চে অমনি ! পাড় ঠেলে দেয় কে ?"

হাসি ওঠে। বিন্দি বলে—"মুয়ে আগুন ওর আর মুয়ে আগুন অমন দোজবরে সোয়ামীর। ··ওকে দিয়ে হেঁসেল ঠেলায় গো পোড়াকপালী !···"

সোনা মুখ খিঁচিয়ে বলে—"মস্ত অপরাধ করে! কবে কোন্ কাজে নাগবে ?"

হাসির মধ্যে ঠোঁটে খানিকটা দোক্তা ফেলে দেয় বিন্দি, বলে—"বাসন মাজায়, কুটনো কোটায়, মেয়ে ভোলাতে হবে তাও ঐ লক্ষ্মণ···বাকি শুধু··"

হাসির ধমকে আর বলে উঠতে পারে না।

সোনা নয়ানকে সাক্ষী মানে—"হ্যাগা দিদিমণি, তুমিই বলো না, একা মানুষ, নেটিপেটি কেউ একটা সঙ্গে নেই, খুকিটা য্যাখন বড় হবে ত্যাখনকার কথা ত্যাখন ; ত্যাতদিন একটু সামলেসুমলে দেবে না মনিষ্যি ?"

নয়ান বলে—"তা বলে ঐ কাজগুলো ওকে দিয়ে করাবি? পুরুষ না?—না হয় দোজবরেই, আর তুই তার যুবী বৌ—মাথার মণি হয়ে বসেচিস…"

সোনা একটু জ্বালাতন হ'য়ে মুখনাড়া দিয়ে ওঠে—"দোজবরে না হ'লে—নিজে যুবো হ'লে ওই আমাকে দিয়ে এগুনো করাত তো গো ঠাকরুণ!…মাথার মণি হয়ে বসত তো!—সবাই ওরই দিকে, কলিতে ঝিচের নেই মানুষের কাছে!"

এগিয়ে যেতে যেতে বাঁশি আরও স্পষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু মনটা রয়েছে সোনাকে নিয়েই প'ড়ে; সোনার ভয়ই মনটাকে এখনই একটা নাড়া দিয়েছিল তো? সোনার চেহারাটা। সুন্দরী বৈকি, নইলে আর ভয়টা কিসের? তবে, কেমন যেন বেটাছেলে বেটাছেলে,—একেবারে সিধে, একটু ঢ্যাঙাই। বেশির ভাগই একটা সবুজ শাড়ি প'রে থাকে—ঐ যেন ওর জীবনে একটি মাত্র সাধ। তাও কিন্তু পরবার শ্রী নেই একটা—এখানটায় টান, ওখানটায় ঝলঝলে, গোড়ালি পর্যন্ত কোনখানটায়ই নামে নি। মাথায় কাপড় দেয় না, তাতে কবেকার বাঁধা খোঁপাটা এলোমেলো উস্কখুস্ক হয়ে একটা বোঝার মতো নেবড়ে থাকে মাথায়, যেখানটা একেবারেই এলিয়ে পড়বে, পুঁতি-বসানো একটা সস্তা কাঁটা বোধ হয় দিলে গুঁজে।

নয়ান বলে—"হ্যাঁলা, এ রকম কেন? একটু ছিরিছাঁদ থাকবে না মেয়েমানুষের? হ্যাঁ, বুঝতুম সময়ের অভাব—সেদিকে সব তো লক্ষ্মণই ক'রে দিচ্চে।"

সোনা অবহেলা ভরে টেনে বলে—"তা দরকারটাই বা কি এমন?"

সব সময়েই একটি উত্তর, বদলায় না।

নিশ্চিন্তই আছে নয়ান। সোনা খাঁটি সোনাই। 'কুটুম' সম্পর্কে অনঙ্গকে ধ'রে কখনও কখনও ঠাট্টাও ক'রে বসেছে; সোনা হাসে, জবাবও দেয়, সুযোগ পেলে নিজেও রেহাই দেয় না, কিন্তু মনে ওর দাগ বসে না কোথাও; নয়ান খুঁটিয়ে দেখেছে।

নিশ্চিন্তই থাকে। তবে এইরকম রাত্রে, যখন আর সবই স্তব্ধ, শুধু দূর নদীতীরে একটি বাঁশি আকাশে-বাতাসে শুধুই কান্নার সুর ঢেলে চলেছে—এই রকম একটা রাত্রে মনে হয় সবই নিয়মকানুন যেন অশ্রুজলে ভেসে গেল।…নইলে নয়ানই বা কেন বেরিয়ে আসবে নিজের কাছে পর

হয়ে? ভয় হয়, নিজের জন্যও আবার সোনার জন্যও—নিশ্চিন্ত হরিণীই যে মরে বেশি ক'রে।

এই রকম একটি রাত্রির কথা। ভয়ের কিছু না থাকলেও সোনার একবারটি খোঁজ নেওয়া একটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে নয়ানের; সেটুকু সেরে আবার এগিয়ে চলল।

আজ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ডেকেছিল অনঙ্গ। সেইরকম মুখভার, সেইরকম তর্ক, কপট নিদ্রা,—আরম্ভটুকু সেই ভাবেই বেশ গোড়া বেঁধে করেছিল, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলে না।

আজ রাত্রিটা ভাল নয়। সন্ধ্যার আগেই কালবৈশাখী উঠেছিল; এক পশলা বৃষ্টি হয়ে সে ভাবটা কেটে গেল, কিন্তু দুর্বৃত্তের দুরভিসন্ধির মতো এক টুকরা মেঘ আকাশের এক কোণে রইল লেগে। তারপর শুতে যাবার সময় একটা গুরুগম্ভীর ডাক শুনে নয়ান দাওয়া থেকে নেমে এসে দেখে সমস্ত আকাশটাই চুপি চুপি কখন কালো মেঘে গেছে ছেয়ে।

অনঙ্গ যখন উঠল তখন ডাকটা আরও ঘন ঘন; জিগ্যেস করল—"যাবি?"

কথা-কাটাকাটি হোল খানিকটা; যাচ্ছে যে, আর সব কথা বাদ দিলেও বৃষ্টি নামলে দাঁড়াবে কোথায়?

অনঙ্গ বলল—"বিষ্টি হবে না; বোশেখের মেঘ, তোর মতন ঝগড়াই সার, ভেতরে কিছুই নেই।"

অর্থাৎ খোশামোদ করলে, এক ধরণের ব্যাজস্তুতি। নয়ান কিন্তু আরও রাগ ক'রে ঘুরে শুলো।...এই দুর্যোগ রাত্রি, এ রাত্রে মানুষ বাইরে বেরুতে পারে?—কী? না, বাঁশি বাজাতে হবে!

একটু তন্দ্রা এসেছিল, বাঁশির আওয়াজে জেগে উঠল নয়ান। একটা হাওয়া উঠেছে এলোমেলো, সুরটা কখনও স্পষ্ট কখনও স্তিমিত, হাওয়ায় যেন দোল খাচ্ছে। আকাশে সেই গুরুগম্ভীর ডাক একটা, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় বাইরেটা চমকে উঠল।...তন্দ্রার ওদিককার ব্যাপারটা সব গেছে মুছে, এখন এই কথাই মনে হচ্ছে—এমন রাতে বাঁশির ডাকে ছি কেউ ঘর আগলে পড়ে থাকতে পারে? বিদ্যুৎ-ঝলকে তাগাদা দিচ্ছে—বৃষ্টি যে এল এখনই পথ হয়ে উঠবে দুর্গম, পিচ্ছিল, আর কি পারবে যেতে তাহ'লে?

…চলো, ওঠো ; ডেকে ডেকে চলে গেছে, ভিজে হাওয়ায় ওরই কান্নার স্বর, আর কি মান নিয়ে পড়ে থাকা চলে ? ওর অভিমান তাহ'লে ভাঙবে কে ?

কেমন যেন সব ভুলিয়ে দেওয়ার রাত্রি একটা ; আর, কেবলই মনে হচ্ছে নিজেই যেন কত অপরাধী, নিজেই যেন পদে পদে কত ভুল ক'রে যাচ্ছি।

সোনার শুধু খোঁজটুকু নিল—ঘরেই আছে। নেওয়ার না ছিল কোন দরকার, না ছিল সময়, তবু মনে হচ্ছিল আজও বাঁশির ডাক শুনে কেউ ঘরে প'ড়ে থাকবে, এইটাই যেন অসম্ভব, অদ্ভুত।

এগিয়ে চলল। আশা করেছিল, বাদুলে রাত, আজ আর ওদিকে না গিয়ে খেয়াঘাটের ছোট চালাটার ভেতরেই বসবে অনঙ্গ, একটু এগুতেই বুঝতে পারলে স্বর আসছে ঘাটের ওদিকে সেই পুরনো জায়গাটা থেকেই।…কী যে ভাবে মানুষটা, বুঝে ওঠা দায় !

তবুও এ-ই আবার লাগছে ভালো। দুটো পায়ে অসীম চঞ্চলতা, মনে একটা পুলক, একটা উল্লাস ; বোষ্টম মেয়ের মনই তো, কত কথা যে ভিড় ক'রে ঠেলে আসছে ! এমনি রাত্রের জন্য রচা কত পদাবলির কলি 'দামিনী দমকে, পন্থ দূর !'…তা হোক না দূরই, দূর বলেই তো রাধার জন্য এই আকুতি, এই কান্না ; গিয়ে পড়লে কি বাঁশি আর এমন করে ডাকবে ? নিজেকে কত যে বড় মনে হচ্ছে ! আমায় নিয়ে কত দরকার ! আমি ছাড়া আর কী আছে শ্যামরায়ের ? আমার জন্যে কত সাধনা !…পন্থ দূরই হোক, বাঁশি এমনি ক'রে গুমরে গুমরে ডাকুকই না আরও একটু।

ঘন-আঁধার রহস্যময় রাত্রি। এক একবার চোখ দুটো স'য়ে আসছে, সামনে খানিকটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে নয়ান, তারপরই এক ঝলক কড়া বিদ্যুৎ, সব দ্বিগুণ অন্ধকার। দুর্যোগটা ঘনিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে ফেরিঘাটের চালাটায় ডেকে আনতে হবে অনঙ্গকে।

ফেরিঘাটের যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছে, বাঁশিটা হঠাৎ থেমে গেল। মনটা কোথায় গিয়েছিল চলে, সঙ্গে সঙ্গেই আবার যেন ফিরে এল। আকাশটা ঝঞ্ঝাসমাকুলই, পথটা যে সত্যই দুর্গম, পা বাড়াবে কি করে ?…না, ফেরিঘাটের চালার মধ্যেও বসা হবে না। কী একটা অসঙ্গত কাণ্ড !—ঘরের নির্বিঘ্ন আরাম ছেড়ে আকাশের এই দুর্যোগ মাথা পেতে নেওয়া ! জোর করে নিয়ে যেতে হবে ফিরিয়ে ! কিছু ভর করে নিশ্চয় মানুষটার ওপর, একা ছেড়ে দেওয়াই ভুল, নইলে রাত্রিই বা খুঁজবে কেন, শুধু শুধু ? আর এইরকম সব রাত্রি !

এতক্ষণে তো এসে পড়া উচিত ছিল। অল্প একটু অপেক্ষা করলে নয়ান, তবু আসে না যে! মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। নিজেই খানিকটা এগিয়ে গেল, তারপর আরও খানিকটা। বুকটা ধকধক করছে, আসে না কেন এখনও? তারপর একটা বিদ্যুৎ খেলে যেতেই দেখলে ও-জায়গাটার খুব কাছে এসে পড়েছে, আর জায়গাটা শূন্য!

"গোসাঁই!!"—বলে চীৎকার করে উঠল, কিন্তু আওয়াজটা যেন গলার মাঝখানেই আটকে গেল; একটা চাপা বিকৃত আওয়াজ যা বেরুল সেটাকে যেন নিজের বলে চেনাই যায় না।...আতঙ্কে শরীরটা কাঠ হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যায় দেখে গিয়েছিল দূর পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টি হয়ে নদীতে ঢল নেমেছে; পাড় ধ'সে প'ড়ে গেল না তো অনঙ্গ? দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আবার এগিয়ে চলল নয়ান, পা দুটোকে কোন রকমে টেনে নিয়ে; যেন মুড়ে মুড়ে যাচ্ছে, এখনি গিয়ে কী দেখতে হবে! উঁচু জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল। বিদ্যুৎ চমকেই চলেছে। না, পাড় ধসে নি, আস্তে আস্তে যেমন চারদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেই রকমই আছে, বরং মনে হচ্ছে বারুণীর জলটাই আরও নেমে গেছে এর মধ্যে। ও আশঙ্কাটা কেটে গিয়ে আবার একটু আশা, সেইটেই বাধা হয়ে এসে দাঁড়াল, নইলে ঠিক ক'রেই এসে দাঁড়িয়েছিল নিজেও ঝাঁপ দিয়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে।

তারপর আর একটা আশা, বিদ্যুতের গায়ে বিদ্যুতের মতো—বাড়িও তো গিয়ে থাকতে পারে। ঠিক যে এই পথেই যাবে তার মানে কি? হয়তো খানিকটা তফাৎ দিয়েই গেছে চলে, কেউ কাউকে দেখতে পায়নি। অন্ধকারে নিজের হাতই যায় না দেখা।

ফিরল। শুধু ছুটতে বাকি রাখল, দুতিনবার আছাড়ও খেল। কান্না ঠেলে আসছে, শুধু কান্নার যেন সময় নেই।

বাড়িতে আসে নি। একটা চাবি অনঙ্গর কাছে থাকে, কিন্তু ঘরের তালা যেমন লাগিয়ে গিয়েছিল সেই রকমই রয়েছে।

"উঃ!"—বলে হাতের চেটোয় রগদুটো চেপে দাঁড়িয়ে পড়ল নয়ান, আর ভাবতে পারছে না। তারপর আবার নেমে চলল—লক্ষ্মণকে ওঠাতে হবে, আর উদ্ধবকে; কোথায় গেল লোকটা? আর, সোনার ওপরও কেমন একটা অবিশ্বাস হচ্ছে।

বাঁশের আগল পর্যন্ত গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল নয়ান। না—না—না,

কোনমতেই আর যাবে না ও। কে যেন জোর ক'রে ওকে নিয়ে যাচ্ছিল—আশায় ভুলিয়ে, সন্দেহে জ্বালিয়ে—জোর ক'রে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফিরল নয়ান, ঠাকুরবাড়ির দিকে। বন্ধ দরজার সামনে লুটিয়ে পড়ল। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে, কান্নাও নামল—"ওকে সরিয়ে নাও ঠাকুর—চিরদিনের জন্যে—আর যেন না ফেরে—আর সহ্যি হচ্ছে না, আর পারছি না, আমায় রেহাই দাও—একেবারেই সরিয়ে নাও ওকে আমার জীবন থেকে, শুধু দেখো, পোড়াকপালীর অকল্যাণে একটুও আঁচড় যেন না লাগে ওর গায়ে কোথাও⋯"

নয়

পরের দিন নয়, তার পরের দিন দুপুর পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কাহিনী বৈকি একটা, তবে যে ধরণের আশঙ্কা করা গিয়েছিল সে ধরণের কিছু নয়।

নয়ান ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে ছিল। রান্নাবান্নার পাট নেই আজ; কোন রকমে পূজার দিকটা সেরে, নিয়মরক্ষা হিসাবে প্রসাদের এক কুচি শশা দাঁতে কেটে সেই যে এসে শুয়ে পড়েছে, আর ওঠে নি। বিন্দু এসেছিল, মাথা-ব্যথার একটা শেকড় বাঁ হাতে বেঁধে দিয়ে গেছে। লক্ষ্মণের বৌ এসেছিল, একরাশ মুখঝামটা খেয়ে পৃষ্ঠভঙ্গই দিয়েছে মনে হয়।

নিদ্রার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, গা এলিয়ে পড়ে ছিল নয়ান, প্রায় মাঝদুপুরে অনঙ্গ এসে উপস্থিত হোল। যেরকম ভাবে এল, মনে হয় নিজের মনের উল্লাসে, এ দিকের অবস্থা কিরকম হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে যেন চিন্তাই করেনি।

নয়ানকে দেখে বলল—"একি, তুই এভাবে শুয়ে যে? শরীর ঠিক আচে তো? দেখিস, দিনকাল যে রকম খারাপ পড়েচে⋯"

কোন উত্তর যে পেলে না সেদিকে খেয়াল নেই। পিরানটা খুলে বলল,—"পাখাটা কৈ?" মশারির চাল থেকে সেটা তুলে নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে তক্তাপোশের বিছানাটার ওপর বসল। কাহিনীটা শোনাবার দিকে মনটা পড়ে রয়েছে। জবর কাহিনী বৈকি—

"টেনে নিয়ে গেল, কোন মতেই ছাড়লে না। কে বল্ দিকিন?—তুই

পারবিনিই আন্দাজ করতে—কোন মতেই নয়।··নিজের মনে বাঁশি বাজাচ্চি, বলা নেই কওয়া নেই সেই অন্ধকারে একটা নৌকো এসে সামনে ভিড়ল। বাঁশি বাজানো তো মাথায় উঠল, ভয় করে তো রে বাপু, হঠাৎ নৌকো কেন? আর তাগ্ ক'রে এইখানেই। কি করব ভাবচি, ততক্ষণে উঠে এয়েচেন মহাপ্রভু!···কে, কর দিকিন আন্দাজ, বুঝি···"

নয়ান পাশ ফিরে শুয়ে ছিল, আর একটু ঘুরে প্রায় উপুড় হয়ে শুলো।

"মাথাটা বড্ড ধরেচে? একটা পাড় বেঁধে দিলিনি কেন কষে? র', আমিই না হয় দিচ্চি।···হ্যাঁ, সে তুই পারবিনি আন্দাজ করতে।···ভূষণো! আমাদের জিরেনের ভূষণো! যাকে নিয়ে এত কাণ্ড হোল!"

এত বড় খবরটাতেও যে একটু গা নড়ল না, সেদিকে হুঁশ নেই অনঙ্গর, বলেই চলল—"জিগোলুম, তা তুই হঠাৎ ডিঙি বেয়ে কোথা থেকে ঠেলে উঠলি? না, সে সব শুনবে, এখন ওঠো দিকিন, ডেকেচে।

"কে? ডাকার মালিকটার নাম শুনতে পাই না? রাত দুপুরে—তাও আবার এই অনাছিষ্টি রাত্তির···

"তুমি ওঠই আগে, ভয়ের কিছু নেই, আমিও তো রয়েচি, যেতে যেতে সব শুনবে।

"নৌকোটা খেয়াঘাটেরই; আসতে আসতে ভূষণো সব বলল, বলে—তা মালিকই একরকম, হেঁজিপেঁজি লোক নয় নেহাত। ইদিকেরই কোথাকার জমিদার। তোমাদের পলাশবাটীর ছ'সাতখানা গ্রাম পরে। রাজা বললেই হয়, তবে ঠিক সে-ধরণের নয় যে সাজগোজ ক'রে যাত্রার রাজার মতন পাত্র-মিত্র নিয়ে ব'সে আচে। শোকো মানুষ, দেমাক-দাপট নেই। উদিক থেকে আসছিল পালকি ক'রে—আটটা বেয়ারা দুটো সেপাই—জিরেনে আসতে আসতে কাল-বোশেকীটা এসে পড়ল তো, গৌরাঙ্গতলার আটচালায় এসে উঠল। আমাদের রিহার্সেল চলছিল—বোশেকী পূর্ণিমেয় আবার একটা দিচ্চি কিনা, ঝড়টা থেমে যেতে আবার শুরু করেচি, ও-ও এসে কাছটিতে দাঁড়াল। মনে হচ্চে একটা কেও-কেটা নয়, আমরাও রাজার চেয়ারটা ওনাকেই এগিয়ে দিলুম; হাতল নেই, দড়িবাঁধা, তবুও বসল; শোকো লোক তো? শুনলে খানিকটা, তারপর গিয়ে পালকিতে উঠে ডেকে পাঠালে আমায়—যে ঋিধিকের পাট করচে তাকে ডেকে নিয়ে আয়!···গিয়ে দাঁড়ালে বললে—আমারও শখের অপেরা পাটি আচে। করবে?—তাহলে চলো।"

নয়ানের গা জলে খাক হয়ে যাচ্ছে, তেমনি আবার আগ্রহটাও লেগে রয়েছে, চুপ ক'রে প'ড়েই রইল। অনঙ্গ ব'লে চলল—"ভূষণো বলে—ভাবচি, ভালো রে ভালো, একবারে ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে! এখুনি যাই কি ক'রে? ওকে হ্যাঁ-না কিছু না বলে এদের এসে বললুম কথাটা। সবাই বললে—ঝুলে পড় দুগ্গা বলে, বড়মানুষ, একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে, শুধু বলে দে, এখানে এই পালাটা সামলে দিয়ে যাবি দুপাঁচ দিন আগে এসে।···রাজী হোল, ভূষণো বলে আসতে আসতে, তোমার কথাও বললুম অনঙ্গদা, বলি কেষ্ট অনঙ্গদাকে পেতেন তবে তো! সব শুনে উলসে উঠল। ভূষণো বলে, তখন আমিও দিলুম দর বাড়িয়ে, বললুম—কিন্তু সে বড় বিষম ঠাঁই, যা গাঁটছড়া বাঁধা আচে!"

সঙ্গে সঙ্গে হাসলেও একটু, রসিকতার কথাটুকু বলে।

রসিকতাতেই গায়ে বোধ হয় জ্বালার ওপর আরও বিষ ছড়িয়ে দিয়ে থাকবে, একবার নড়ে উঠল নয়ান; নিজেকে আর একটু গুটিয়ে নিয়ে প'ড়ে রইল।

অনঙ্গ বলে যাচ্ছে—"এখেনে যখন এয়েচে ওরা, আকাশ বলে আমি ভেঙে পড়ব। তাড়াতাড়ি নদীটা পেরিয়ে ওরা খেয়াঘাটের চালাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল সবাই। ভূষণো বলে—বসে আচি, এগিয়েই যাব কি বিষ্টিটা দেখে যাব ভাবচি সবাই, এমন সময় হঠাৎ বাঁশির আওয়াজ! এ-বাঁশি তো ভুল হবার নয়, তাহ'লে অনঙ্গদা'দের আখড়াটা নদীর ধারে, এখেনেই কোথাও নাকি? সন্দোর কথাটা বললুম ওনাকে, ওনারও কান খাড়া হয়ে উঠেচে, বলে এ জিনিস ছেড়ে যাওয়া চলবে না, চলো, আমিও যাই, কথাটা ঠেলতে পারবে না তাহলে। ভূষণো বলে—অবিশ্যি আসতে দিলুম না, বললুম নিয়ে আসা নিয়ে বিষয় তো? আমিই আনচি ডেকে; যায় না যায় অবিশ্যি বুঝবেন আপনি আর অনঙ্গদাই।"

এ অংশটা শেষ ক'রে বোধ হয় একটু ফুরসৎ হোল অনঙ্গর, জিগ্যেস করল —"ছাড়ল না তো মাথাটা এখনও তোর?"

যেন এতক্ষণ মাথা ছাড়াবার মন্ত্রই ঝাড়ছিল ব'সে ব'সে। একে গাঁটে গাঁটে কত চোখা-চোখা উত্তর দেওয়ার সুযোগ ছেড়ে দিতে হয়েছে, তার ওপর এই আদিখ্যেতার প্রশ্ন, নয়ান কোনরকমে দাঁতে জিভ কামড়ে পড়ে রইল। চাপা রাগে কান দুটা পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে।

অনঙ্গর ঘোরটা কাটেনি; যেখানে ন্যাকড়া-পাড় পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই এমন সব জায়গায় একবার চোখটা বুলিয়ে নিয়ে বললে—বেশ একটু চিন্তিত ভাবেই বলল—"পাড় একটা কোথাও যায় না পাওয়া?···রোস দেখছি।···হ্যাঁ, রাজাই বৈকি—তিন মহল বাড়ি, গাড়ি, ঘোড়া, পালকি, লোক-লস্কর। আর কী খাতির-যত্ন! পূবে চাকা উঠতে উঠতে আমরা গিয়ে পৌঁছুলুম তো?—সেই থেকে···"

এমন সময় বাইরে লক্ষ্মণের বৌয়ের গলা শোনা গেল—"বলি রাগটা পড়ল?"

সঙ্গে সঙ্গে উঠেও এল রকে, হাতে একটা থালা, কলাপাতা ঢাকা; পেছনে লক্ষ্মণ, তার ডান হাতেও ঐ রকম একটা থালা, বাঁ কাঁখে মেয়েটা। সোনা এগিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, ভেতরের দিকে তক্তাপোশে অনঙ্গকে দেখে পেছু হেঁটে বেরিয়ে গেল, তারপব বাঁ হাতে কাপড়টা আধা-ঘোমটা ক'রে মাথায় তুলে দিয়ে আবার গিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল, নিচু গলায় বলল—"ভাত এনেলুম।"

নয়ান একবার দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজেছিল, এই দ্বিতীয় আওয়াজে একেবারে ফেটে পড়ল।—

"তোকে না বারণ করলুম তখন? কার জন্যে ভাত এনেচিস? কি ক'রে টের পেলি তুই যে এয়েচে? এনেচিস তো যা, খাওয়াগে সোহাগ ক'রে ব'সে—পাশের ঘরে নিয়ে যা কুটুমকে তোর—আমায় যদি জ্বালাতে আসিস তো···"

সোনা আবার নেমে পেছিয়ে এল, চাপা গলায়, তবে বেশ স্পষ্ট গলায়ই লক্ষ্মণের ওপর ঝালটা ঝাড়ল—"মুখে রা নেই মনিষ্যির, একটা যেন খুঁটি দাঁড়িয়ে আচে!···পোড়া মুখে বলো না, আমার কি আক্কেল নেই?—দু'জনার জন্যেই এনেচি ভাত, খবর রাখিনে?···ধিনিকেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচেন!"

রাগ ওর ঐ লক্ষ্মণ পর্যন্তই, আর কোন দিকে এগুতে জানে না। এটুকু ব'লে এক রকম হাসিমুখ নিয়েই ভেতরে চলে গেল, যেন কত মধুবর্ষী কথাই না কানে গেছে এইমাত্র। থালাটা রাখলে, বাইরে এসে লক্ষ্মণের হাত থেকেও নিয়ে এল থালাটা। দুটো পিঁড়ি পেতে পাশাপাশি দু'টো ঠাঁই করবার সময় একটু দুষ্টুমির হাসি হাসলও, তবে থালা ধ'রে দিল অবশ্য একটার সামনেই। তারপর আবার চৌকাঠের দিকে গিয়ে লক্ষ্মণের দিকে মুখটা বাড়িয়ে আগেকার

মতোই চাপা স্পষ্ট গলায় খিঁচিয়ে উঠল—"বাকরোধ হয়েচে নাকি মনিষ্যির? কুটুমকে বলতে হবে না ভাতে ব'সতে? এক ঘটি জল রেখে দেওয়া হোক বাইবে পা ধোওয়ার জন্যে।...মরিঃ, মনিষ্যি কি কী হদিস পেলুম নি আজও!"

আসল অবস্থাটার সম্বন্ধে এতক্ষণে চৈতন্য হয়েছে অনঙ্গর। সেখান থেকে 'খাতির-যত্নের' খাওয়াই খেয়ে এসেছিল, তবু আর বাক্যব্যয় না ক'রে ভালো-মানুষের মতো গিয়ে পিঁড়িতে বসে পড়ল।

কথা বন্ধ রইল। যেখানে মাত্র দুজন নিয়েই সংসার সেখানে কথা বন্ধ থাকলে অচল হয়ে পড়ে, সচলতাটুকু রক্ষা করবার জন্য সোনাকে ডেকে নিতে হোল মাঝখানে। ঠিক যে সাড়া দিয়ে ডেকে নিলে নয়ান এমন নয়, তবে একটা কাজ শেষ হতে আর একটা কাজ দিয়ে আটকে রাখলে। অনঙ্গ পিঁড়িতে বসতেই উঠে গিয়ে পাশের ঘরে শুয়ে পড়েছিল, আঁচিয়ে আবার যখন ঘরে গেল, ডাক দিল—"একবার ইদিকে আসবি সোনা?"

নিচু গলাতেই জিগ্যেস করল—"খেলে, না, শুধু লোকদেখানি বসা—আদিখ্যেতা?"

সোনা একেবারে মুখের কাছে এগিয়ে এল, চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে, হাসতে হাসতেই—"খেলে মানে!...একেবারে দাঁড়াও, দেখাচ্চি..."

উঠে গিয়ে থালা বাটি গেলাস তুলে নিয়ে এসে হেঁট হয়ে নয়ানের সামনে ধরলে, চাপা হাসিতে রাঙা হয়ে উঠেছে মুখটা, সেই রকম ফিস ফিস করেই বলল—"একেবারে যার নাম চেঁচেপুঁচে!...কী নক্ষী গা।...দিদিমণি আবার আমায় বলে, শাসনে রেখেচি নাকি! শাসন কাকে বলে শিখি এখন দিনকতক পায়ের কাছে ব'সে!"

হাসিটা ঠোঁটেই চেপে রাখলে, তবে শেষের কথাগুলো একটু আলগা গলাতেই বললে যাতে ও-ঘর পর্যন্ত পৌছায়। নয়ান মুখটা কুঁচকে বলল—"রঙ্গ রাখ্, সব সময় রঙ্গ ভালো লাগে না।"

পানটা ওকেই দিয়ে সাজালে, দেওয়ালেও। আটকে রাখবার জন্যই আরও গোটাকতক সাজিয়ে বাটায় ভরিয়ে রাখলে। শেষ ক'রে সোনা বলল—"এবার খেয়ে নাও দুটো, পেসাদ তো রইল নি আজ।"

"খিদে নেই আমার।"

"থাকবার তো কথা নয়, একজন যেমন চেঁচেপুঁচে খেয়েছে—অৰ্দ্ধাঙ্গিনীই তো।"

"তামাশা রাখ বলচি সোনা···একটু ঘুমুব। সারারাত ঘুম হয়নি, চোখ জড়িয়ে আসচে।"

না-খাওয়া না-ঘুমুনোর কথাটা একটু ভালো ক'রেই পৌছে দিলে ও-ঘরে। তারপর সোনার জেদাজেদীতেই দু'গ্রাস মুখে দিয়ে থালাটা ঠেলে দিয়ে বলল—"নিয়ে যা। আবার আসবি শিগ্‌গীর, দেহটা ভালো নেই, একটু সামলে দিবি।"

ঘুমিয়েই প'ড়েছিল, প্রায় সন্ধ্যার সময় চোখ মেলে দেখে অনঙ্গ বুকে হাত-দুটো জড়িয়ে দাওয়ায় পায়চারি করছে; চোখাচোখি হয়ে গেল, নয়ান মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

অনঙ্গ আরও বার দুই পায়চারি ক'রে দোরটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল—"রাগটা পড়ল না এখনও? এমন কি অপরাধ···"

নয়ান একেবারেই উলটে শুলো।

একটু দাঁড়িয়ে অনঙ্গ ঘরের মধ্যেই এল চলে, চৌকির ওপর বসে প'ড়ে বলল—"বলছিলুম রাগটা কিসের জন্যে এত? তোকে সবই তো খুলে বললুম, ও-রকম অবস্থায় যদি পড়ে লোকে···"

নয়ান উঠে মুখ থমথমে করে পাশের ঘরে চলে গেল। এরপর দু'দিক থেকেই কথা বন্ধ রইল, মাঝখানে রইল সোনা। তবে অনঙ্গ সন্ধির প্রস্তাবটা করে যেতেই লাগল—"বাঁশিই যদি কাল হোল তো না হয় বাঁশি আকাতেই দিয়ে দিচ্চি, কিম্বা বারুণীর জলে।···সঙ্গী সাথী যারা আছে তারা কি এইটুকু বুঝিয়ে বলতে পারে না যে আমার শরীরেও রাগ আচে, আমিও উপোস করতে জানি—যতক্ষণই না করচি···"

অবশ্য রাগেরও কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বাঁশিরও ও-ধরণের কোন ব্যবস্থা হোল না, শুধু বাঁশিটা আর যে ঠোঁটে উঠল না এইটুকুই গেল দেখা, তা সে যে জন্যই হোক।

দুটো দিন নিতান্তই বাধ্য হয়ে রইল, শুধু আহারে-বিহারেই নয়, বাড়ি ছেড়ে বেরুলও না; তারপর যেন একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল। দাওয়া থেকেই

নামেনি দুদিন, আজ আখড়ার বাগানটায় কয়েকবারই গিয়ে ঘোরাঘুরি করলে; খুবই অন্যমনস্ক, আসে, খানিকটা বসে, আবার নেমে যায়।

নয়ান এই আশঙ্কাটুকু করছিলই, না লক্ষ্য করবার ভান করে খুবই লক্ষ্য করতে লাগল দূর থেকে। সোনা ঘরের মধ্যে কি একটা করছিল, ডেকে নিয়ে বলল—"একটা ছমছমে ভাব, ঠাহর ক'রে দেখেচিস?…আজ সকাল থেকে।"

সোনা গোড়া থেকেই ঝগড়া আরম্ভ ক'রে দিল—"তুমিই করো ঠাহর, আমি অনেকদিন থেকেই করেচি; নইলে রাত তে-পহরে কেউ শ্মশানে-মশানে বাঁশি নিয়ে ঘোরে না!"

নয়ান চ'টে উঠল।

"শুনবে না তো ভালো ক'রে! সে ছমছমে নয়; মন বসচে না এখানে আর। একটু নজরে-নজরে রাখবি, কোথায় যায়, কি করে‥"

"হ্যাঁ, আমার ঐ কাজ! শেষকালে বলবে কু-নজর দিচ্চে গতরখাকী!"

"গতরখাকীই তুমি, মরো।‥কি বললুম, কি বুঝলে! কেন, লক্ষ্মণকে তো একটু টিপে দিতে পারিস?"

"একটা মানুষ যেন! টিপে দিই, আর ঠ্যাং খোঁড়া করে নিয়ে আসুক ঘরের কুটুমকে!"

তারপর আরও মুখটা ব্যাজার ক'রে বলল—"না বাপু, দুটিতে ভাব করে নেও তোমরা, ক'দিন এরকম ক'রে চলবে? আর আমিই বা ক'দিন এমন ক'রে পারব ঐ এক জন্তুর ওপর সব ছেড়ে দিয়ে? মিটমাট ক'রে নেও। উনি তো নিম্নু হয়ে রয়েইচে—বলে, হ্যাঁংলা ভাত খাবি, না, পাত পাতব কোথায়?—তোমারই যেন আর…"

"আচ্ছা, চুপ করো, গোসাঁইঠাকরুণ এলেন ধম্মকথা শোনাতে!"—নিজেই ঘুরে হনহনিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল নয়ান।

এ দিনটাও এই ভাবেই গেল কেটে।

নয়ান-বৌ চঞ্চলতার কারণটা যে একটু বাড়িয়ে আন্দাজ করেছে সে তার মনের আশঙ্কার জন্যেই, আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম। ওদিকে অপেরা ঠিক হয়েছিল 'নব-নারী' তার দিনটা এগিয়ে এসেছে। ওকে পেয়েই আরও প্রবল উৎসাহে রিহার্সেল আরম্ভ হয়েছিল, বাড়িতে খবরটা দিয়ে একটা দিন পরেই ফিরে আসবে ব'লে এসেছে, তার জায়গায় তিন দিন হয়ে যায়; ছটফটিয়ে

উঠেছে অনঙ্গ। ঝোঁকের মাথায় যা ক'রে বসেছিল সে রাত্রে তার ভুলটাও বুঝতে পেরেছে, সেই জন্যই নয়ানের কাছে জোর পাচ্ছে না; কিন্তু এ ঝোঁকটা তো সামলে দিতেই হবে, এরপর না হয় কাটান্ দিয়ে আসবে একেবারে।

দুপুরে খেয়েদেয়ে নয়ান পাশের ঘরটায় শুয়েছিল, আজকাল ঘরও আলাদা, অনঙ্গ মরিয়া হয়েই দাওয়ার চৌকাঠটা ধ'রে দাঁড়াল, বলল—"বলি এত রাগটা কিসের তোর, শুনতে পাই একবারটি? বাঁশির জন্যে, না, না ব'লে-ক'য়ে চলে গেলুম বলে?...বৌ, বাঁশি যে বাজায় তার মনটা তুই বুঝবিনি। ওটা ঘরের জিনিসই নয়, আমি কি করব বল?...যদি বলিস যেতে গেলুম কেন—বেশ, আর যাবই না, এখেনেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকব; আচিও তো। এ-অশান্তির চেয়ে সে শতগুণে ভালো। তবে কথা হচ্ছে, মুখের কথা দিয়ে এসেচি, একরকম আমার ভরসাতেই একটা পালা করচে তারা, এবারটা সামলে দিয়ে আসি।"

নয়ান হাঁক দিলে—"সোনা!"

"সোনা নেই। আমায়ই বল্ না, অপরাধটা কি এমন করেচি?"

নয়ান উলটে শুলো, সোনাকে ডেকেই বলল—"সোনা, বল্, আমি কি কাউকে বেঁধে রেখেচি?...বাবাঃ বাবা! একটু যে চোখের দু'টো পাতা এক করব—সমস্ত রাত একে ঘুম নেই..."

অনঙ্গ বলল—"থাক্, ঘাট হয়েচে ব'লে—আমার কথার আবার দাম!—জীবনটারই দাম রইল বড়!"

আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার খানিকটা আগে। সোনা ঘর গোছাচ্ছিল, নয়ান দাওয়ায় ডেকে নিয়ে বলল—"আয় মাথাটা ঠিক ক'রে দিই, কাঁটাগাছের ঝোপ হয়ে রয়েচে।"

সোনা যা বলে তাই বলল—"দরকারটা কি এমন? ..হাতে অনেক পাট রয়েচে আমার।"

"আচে দরকার, বোস।.. দোজবরে বলে আর মানুষ নয় যেন; যখন ভাঙবে মন, বুঝবে।"

শেষ হ'লে সোনা বলল—"তাহলে তোমার চুলটাও ঠিক ক'রে দিই এসো। অবিশ্যি মন ভাঙবার ভয় সবার থাকে না, তবু..."

পেছন দিকে গিয়ে বসল। নয়ান বলল—"থাক, আমার আবার...তা

বসলিই জিদ ক'রে তো একটু আঁচড়ে ছেড়ে দে না হয়; ক'দিন থেকে চিরুনি পড়েনি, যেন বোঝা হয়ে রয়েচে।"

চুলের ঢালের প্রশংসা থেকে আরম্ভ হোল গল্প, আজ মনটা আর আর দিনের চেয়ে যেন নরম বোধ হচ্ছে, সোনা ইচ্ছে ক'রে ঐ পথ ধরলে আরও, তারপর নয়ান-বৌই সাক্ষী মানা গোছের ক'রে বলল—"দোষটা আমার ঘাড়েই চাপাচ্চিস সবাই—থাকতিস তো শুনতিস—বাঁশি নাকি ঘরের জিনিস নয়—নদীর ধারে গিয়ে না বাজালে নাকি খোলতাই হয় না।···শুনে থো কথাটা একবার। তুইও তো বললি তখন—শ্মশানে-মশানে গিয়ে বাঁশি বাজানো—কানে বেয়াড়া লাগে ব'লেই তো বললি সোনা!"

সোনা একেবারেই উলটে দিলে কথা, চিরুনির টানে একটু জোর দিয়ে বলল—"ও বাইরে বাইরেই থাকে সেই ভালো দিদিমণি—জ্বলচি তো অষ্টপ্রহর —সমস্ত রাত···"

হঠাৎ অনেক কথা মনে খেলে যেতে চকিতভাবে ঘুরে চাইলে নয়ান।

"নয়তো কি বলো?—গ্যাঁজার ঘুম, প'ল কি ম'ল—তারপর থেকেই সেই যে নাক-ডাকানা--চোপোর রাত! যা না বাপু, কুটুম-গোসাঁইয়ের মতন তুইও নদীর ধারে গিয়ে বাজা না তোর বাঁশি—য্যাতো পারিস···

নয়ান রাগ ক'রে মুখ ঘুরিয়ে নিল।—

"আমি কথাটা তুললুম কোথায় একটু সলা-পরামর্শ পাব ব'লে, ও পোড়ারমুখীর···"

হাতের টান নরম হোল সোনার।

"তা, সলা-পরামর্শের কথাই যদি বললে তো শোন আমার কাছে দিদিমণি, তুমি এক কাজ করো সব ছেড়েছুড়ে।"

চুল বাঁধাও এগিয়ে চলেছে, চুলের গোড়ায় ফিতে জড়িয়ে বলল—"নাও, ধরো একটু।"

নয়ান দুহাতে খুঁট দুটো টেনে ধ'রে জিগ্যেস করল—"কাজটা কি শুনি!"

"কিছু তুকতাক করো; বিন্দুমাসী জানে অনেকরকম—শেকড়বাটা, জলপড়া···"

নয়ান খিলাখল করে হেসে উঠল। তিনদিন পরে আজ এই প্রথম। বলল—"সলা-পরামর্শের ঘটাটা দেখো একবার!···হ্যালা, তুইও ঐসব করিস নাকি?"

সোনা শিউরে কেঁপে উঠল পেছনে, বলল—"রক্ষে করো ঠাকরুণ!

এমনিই গায়ে নেপটে নেপটে রয়েচে, ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি—এর ওপর আবার জলপড়া—গেচি আর কি!"

হাসিতে ঢুলে উঠল নয়ান, বলল—"মুয়ে আগুন, রঙ্গ দেখো!"

রঙ্গটা বাড়াবার জন্যই ওর দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলল—"আ, বেশ, রাজী। তাহ'লে আর দেরি কেন? আজই ডেকে আন্ বিন্দিকে। কিন্তু জল তো দুদিন থেকে তোকেই এগিয়ে দিতে হচ্চে কুটুমকে, তারপর?"

সোনা চোখ নামিয়ে চেপে চেপে বিনুনি করছিল, বলল—"আজই ডাকতে হবে কেন? আজ যা খোঁপা ক'রে দিচ্চি—এই জলপড়ার ঠেলাই সামলাক কুটুম আগে…"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই বেণীটাকে পাক দিতে গিয়ে সামনের দিকে নজর পড়ায় বলে উঠল—"ওমা, কে গো!"

নয়ানও ঘাড়টা সঙ্গে সঙ্গে সোজা করে নিলে, তারপর নজর পড়তেই এমন সিঁটকে রইল যেন বাঘ দেখেছে কি, কী! কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপরেই বেণীটা ছিনিয়ে নিয়ে কোন রকমে আঁচলটা দিয়ে যা-তা করে একগলা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে উঠল।

এসেছে ভূষণ। রান্নাঘরের আড়াল কাটিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়েছিল, নয়ান একটু সামলে নিতেই উঠে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে একটু হেসে বলল—"আমি ভূষণ গো বৌদি, চিনতে পারলে না?…নন্দদা কোথায়?"

দশ

নয়ানের মুখ দিয়ে কোন উত্তর বেরুল না; দাঁড়িয়ে যে রইল তা শুধু নড়তে পারল না ব'লেই, তারপর অনেক চেষ্টায় পা দু'টোকে যেন টেনে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। সোনাও বেশ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তাকে কপাটের আড়াল থেকে ইশারায় ডাকল, এগিয়ে এলে একেবারে কাছে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল—"দেখ্, তোদের কুটুম কোথায় আচে, ডেকে নিয়ে আয় শিগ্গীর।"

বুকটা ধক ধক করছে। সোনা সিঁড়ি থেকে নেমেছে, কপাট নেড়ে আবার ডাকল, বলল—"দাঁড়া, যেতে হবে না।"

সোনা বলল—"খেয়াঘাটের ধারে গেইছ্‌ল বোধ হয়।"

"থাক্‌, তুই দাঁড়া এখেনে, আপনিই আসবে'খন।"

একটু থেমে হাত দিয়ে মাথাটা টেনে নিয়ে কানে মুখ দিয়ে বলল—"ওকেই বরং ব'লে দে সে খেয়াঘাটের পানে গেচে: এগিয়ে দেখতে।"

সোনা যে বলতে একটু দেরি করল তার কারণ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে;—নয়ানের পক্ষে যে এতটা সঙ্কোচ সম্ভব তা এই প্রথম দেখল; শুধু তো সঙ্কোচই নয়, চোখে-মুখে রীতিমতো একটা আতঙ্কের ছাপ; ভূষণ ওদিকে অতিরিক্ত অপ্রতিভ হয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। কথাটা মুখ দিয়ে বের করাও শক্ত,—একটা লোক 'বৌদি' বলে হেসে দাঁড়াল, তাকে এই অভ্যর্থনা? কী যে করবে ঠাহর ক'রে উঠতে পারছিল না সোনা, এমন সময় অনঙ্গ রান্নাঘরের আড়াল থেকে হন হন করে বেরিয়ে এল, বলল—"ভূষণোই তো দেখ্‌চি, আমি ঘাট থেকে ঠিক ধরেচি। তারপর?—তোর বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েচে?"

সোনার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"তোমাদের দিদিমণি কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গেই কপাটের আড়ালে আধা-ঘোমটা টানা নয়ান-বৌয়ের ওপর নজর পড়ল।

"আমাদের ভূষণো গো! এই দেখো, চিনতেই পারে নি! ভূষণো—যাকে নিয়ে অত"···সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনের আহ্লাদে বেশ সাজিয়ে ঠাট্টাটা করতে যাচ্ছিল, ঘরের তরল অন্ধকারে মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ায় মাঝ-পথেই থেমে গেল। ঠাট্টাটা অবশ্য পরে শেষ করল, তবে ভূষণোর দিকে চেয়ে। হেসেও, তবে হাসির সে জলুস নেই, গলাও একেবারে চড়া থেকে খাদে নেমে এসেছে—

"সেদিনকের কাণ্ড···বললুম না তোকে?···অবিশ্যি তুই তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছিস না, সেই জন্যেই বলা···"

চিত্রটা ঠিক সেইরকমই আছে—যে যার জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে, শুধু একটি মূর্তি বাড়ল আরও মাঝখানে—জড়াতে জড়াতে কথা গেছে ফুরিয়ে, ফ্যাকাশে হাসি ঠোঁটে করে ভূষণের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনঙ্গ।

সামলাল নয়ানই, সোনাকে ঘরে টেনে নিয়ে আর একটু ভেতরে সরে গিয়ে বলল—"নিয়ে গিয়ে বসাতে বল্‌ ঘরটায়···সবাই দেখচি তোর লক্ষ্মণ!"

শুনিয়েই বলল, সোনাকে আর আলাদা করে বলতে হোল না। অনঙ্গ যেন নিজের আক্কেলেই ভূষণের দিকে পা বাড়িয়ে বলল—"হ্যাঁ, তা বসবি চল; হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?…আয়। তারপর খবর কি? হঠাৎ যে?…আমার যাওয়া হবে না ভাই। যাচ্ছিলুমই, তা হঠাৎ তোর…মানে, নয়ান-বৌয়ের আর কি—অসুখ!"

বুদ্ধি যে লোপ পায়নি—নেহাত 'লক্ষণ' নয়, সেটা জানিয়ে দেওয়ার জন্যই বোধ হয় শেষের কথাগুলো ওরই মধ্যে একটু আওয়াজ তুলে বলল। নয়ান বাক্স খুলে পয়সা বের করছিল, থেমে গিয়ে ভ্রূ দুটো কপালে তুলল, বোধ হয় বুদ্ধির দৌড় দেখেই; তারপর গণ্ডা আষ্টেক গুণে সোনার হাতে দিয়ে বলল—"যা, লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে দে, শিগগীর গাঁ থেকে মিষ্টি নিয়ে আসুক, ভালো যা থাকে।"

ওদিকে ভূষণ হঠাৎ চলে আসার জবাবদিহি দিচ্ছে—

অনঙ্গ যায় না দেখে ভূষণকে চলে আসতে হয়েছে। ভূষণ আসতে চায়নি, জানেই তো অনঙ্গর কত অসুবিধা—ঘরে আর দ্বিতীয় লোক নেই—বাবু বলে নিজেই আসবে তাহ'লে ঘোড়া হাঁকিয়ে—সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলেছে, অনঙ্গেরই ভরসায়—একদিন অপেরা, তারপর কীর্তন, তারপর যাত্রা, কথকতা—নিজেদের অপেরাটাই আসল, তারও জান হোল কেষ্ট—তার বাঁশি—সেই কেষ্টই যদি না যায় তাহলে তো সব মাটি। দাঁড়িয়ে তো অপমান হতে পারে না—নিজেই আসবে বাবু, তখন ভূষণ দেখলে এ তো বড়ো গোলমাল—গিয়েই যদি প'ড়ে—একা মানুষ—বৌদিও একা মানুষ—গিয়েই যদি পড়ে—অত বড় লোকটা—রাজাই তো—যৎপরোনাস্তি বিব্রত হয়ে পড়বে যে ওরা। তখন আর কি করে?—মনে মনে ঠিক করল, হালচালটা বুঝে আসুক—তারপর না হয় বুদ্ধি ক'রে একটা ব্যবস্থা…

অত জোরে জোরে বলবার দরকারই ছিল না। দুটো ঘরের মধ্যে একটা দরজা আছে, নয়ান তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বুদ্ধির কথায় আবার কপালে ভ্রূ দুটো টেনে তুলল, এক ব্যাপারীর নমুনা পেয়ে যেন আর এক ব্যাপারীর নমুনার অপেক্ষায়।

অনঙ্গ বলল—"তা দেখচিস তো অবস্থাটা!"

"দেখচি না! এ অবস্থায় মানুষে পারে যেতে?"

"তাহ'লে করবি কি?"

ভূষণ চুপ ক'রে রইল, একটু ভেবে নিয়ে বলল—"আমিও না হয় সটকে পড়ি, জিরেন, কি অন্য কোথাও?"

বুদ্ধিটা এতই লাগসই যে মনের এমন অবস্থাতেও নয়ান প্রায় সজোরেই হেসে ফেলেছিল, কোন রকমে নিলে সামলে।

অনঙ্গ বলল—"কেষ্ট-রাধা দুজনেই ডুব মারলে আরও আতান্তরে পড়ে যাবে না? তাহলে তো আরও হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়বে।"

ভূষণ চিন্তিত ভাবে বলল—"তাও তো বটে! আসল কথা আমিই তোমায় যোগাড় ক'রে দিলুম কি না, ফিরে যেতে কেমন ভরসা হচ্চে না। অবিশ্যি লোক ভালো, পরিবারের অসুখ, বুঝচে—নাচার, তবু..."

জিরেনের সেই সন্ধ্যা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যা কিছু দুর্যোগ ঘটল জীবনে তার মূলে যেন এই ভূষণ, একটা দুগ্র্হ জীবনের। হঠাৎ দেখেই যে আতঙ্কটা ঢুকে গিয়েছিল নয়ানের মনে সেটা কাটেনি, তবে অনঙ্গ এসে পড়ায় সেই উগ্রতাটুকু একটু কমেছে। ওদিকে যে কথাবার্তা হচ্ছে তার মধ্যে নিজেও কার্যপদ্ধতি ঠিক ক'রে নিয়েছে, এ দোর থেকে সরে গিয়ে দাওয়ার দিকের দোরের শেকল ধরে বার তিন-চার আওয়াজ করল, অনঙ্গ উঠে এলে মুখটা একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"দেশের লোক, একটু হাত-পা ধুতে বলতে হবে না? ব'সে ব'সে খালি গজর-গজর..."

এই প্রথম কথা ক'দিন পরে, তা হোক না কেন একটু মুখ ঘুরিয়েই, অনঙ্গ যেন বর্তে গেল। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে বেশ একটু কড়া করেই বলল—"নে, ভুল করবি তুই, বকুনি খাব আমি...তোর বৌদির কাছে! জিরেনের লোক, এসে ঘরে উঠে বসবি, হাতমুখ ধুয়ে কোথায় একটু...মানে হাতমুখ ধুবি, না, খালি বাজে কথা এসে অবধি! গেলুম না, দুজনের কেউই না, তার হয়েচেটা কি? দাসখৎ তো লিখে দিই নি। নে, ওঠ্।"

নয়ান একটা জলের ঝারি বের করে দিয়ে তার ওপর একটা গামছা পাট ক'রে রেখে দিল। কথাটা আটকে গিয়েছিল. অনঙ্গর মুখে,—হাত মুখ ধুয়ে কি করতে হবে, তার ব্যবস্থাও হোল, লক্ষ্মণ মিষ্টি নিয়ে ফিরল বাজার থেকে।

সন্ধ্যা বেশ ভাল রকমেই উৎরে গিয়েছিল, ঠাকুরমশাইয়ের শেতল দিতে আসবার সময় হয়ে এসেছে, তবু যেন কিসের অপেক্ষায় একটু আটকে রইল নয়ান, একটু চঞ্চল ভাবে উসখুস করল খানিকটা, তারপর—লক্ষ্মণকে আটকেই

রেখেছিল, ডেকে বলল—"গিয়ে বল, আমি চললুম ঠাকুরবাড়িতে, শেতলের সময় হয়েচে, যদি বেরোয় এর মধ্যে তো দরজায় যেন তালা দিয়ে যায়।"

ওদের জোর আলাপ চলছে; লক্ষ্মণের কাছে শুনে, তারই মধ্যে ছোট্ট ক'রে অনঙ্গ বলল—"তা যাক না, রয়েচি তো আমরা··· ।"

বিরক্ততে নয়ানের মুখটা কুঁচকে উঠল। সিঁড়িতে পায়ের একটু আওয়াজ করেই হনহন ক'রে বেরিয়ে গেল।

যখন ফিরল ঠাকুরবাড়ি থেকে, প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে, তখনও ওদের আলাপ চলছে, বরং আরও জোর হয়েছে, হাসিও উঠছে মাঝে মাঝে। নয়ান আর ওপরে গেল না, রান্নাঘরটা একটু তফাতে, গিয়ে তারই শেকলটা খুলে দরজায় গোটা চার-পাঁচ ঘা দিল, বেশ জোরেই; গল্পের মধ্যে শুনতে পারে বলেও মনে করা যায়। আর যদি ভাবে কে যেন চটে গিয়ে ডাকছে তো তাতেও ক্ষতি নেই।

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি নেমে এল।

নয়ান প্রশ্ন করল—"ওরও চাল নিতে হবে নাকি?"

শুধু প্রশ্নটাই নয়, শুধু তার ভাষা নয়, তার ভঙ্গি পর্যন্ত এমন যে অনঙ্গ থতমত খেয়ে গেল। বলল—"তা···মানে—ও তো যেতেই চেয়েছিল, জিদই করছিল—আমি বরং···মানে, রাত হয়ে গেল বড্ড বেশি তো।"

"রাত করলে কেন হবে না?·· জ্যোচ্ছনা ছিল তো দিব্যি।"

"তাহলে না হয় বলব গিয়ে?"

"হ্যাঁ, তাহলে আরও চমৎকার হয়।···থাকবে থাক্—আমি এই জন্যে বলছিলুম—গেল না, ভাবনায় তিনি না আবার এসে পড়েন—সেই তোমাদের বাবু!"

অনঙ্গ আর দাঁড়াল না: "হ্যাঁ, জোচ্ছনাটা ছিল বটে বেশ—ও জিদই করছিল, আমিই আটকে রেখে···"

আস্তে আস্তে বলতে বলতে সিঁড়ি পর্যন্ত গেছে, নয়ান আবার দরজায় শেকলের ঘা দিল, এলে বলল—"লক্ষ্মণের বৌকে একবার ডেকে আনতে হবে।"

অনঙ্গ ওর দৃষ্টিটা এড়িয়েই যাচ্ছিল, এবার ওর মুখের ওপর একটু বিস্মিত দৃষ্টি তুলে বলল—"আমি? মানে···"

চেয়েই রইল।

"দোষটা কি ? এইতো আমিও এখানে একলা থাকব ততক্ষণ, ঘরে অন্য পুরুষ।…ও ভাবলেই দোষ, না ভাবলেই কিছু নয়।"

মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়েই আছে দেখে বলল—"কেন, লক্ষ্মণকে ডেকে পাঠিয়ে দিতে ব'লে চ'লে আসলেই তো পারে লোকে।… গাঁয়ের লোক, শুধু আলুভাতে-ভাত তো ধ'রে দেওয়া যায় না সামনে—তা আমার একার দ্বারা অত হাঙ্গাম পোয়ানো চলবে না।"

প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট ক'রে বলে ভেতরে চলে গেল।

বড় ঝড়ের আগে দুএকটা দমকা হাওয়া বয়ে যায় অনেক সময়, এও যেন সেই রকম; অনঙ্গ বেশ চিন্তিতভাবেই চলে গেল নদীর দিকে।…"এই তো আমিও এখানে একলা থাকব ততক্ষণ—ঘরে অন্য পুরুষ"—দমকা হাওয়া বলে না-হয় গ্রাহ্য করল না, ঝড় উঠলেও এইরকম মাথা পেতে নিতে হবে নাকি ?

খাওয়া-দাওয়ার পরেও আর একটু হোল। নয়ানই তুললে কথাটা, রান্নাঘরে ডেকেই—"এইবার শোওয়ার ব্যবস্থা ?"

দুটো ঘর রয়েছেই, কথাও আরম্ভ করেছে নয়ান, তা সে যে ধরণেরই হোক, অনঙ্গ বোধ হয় সেই জন্য নিশ্চিন্তই ছিল, প্রশ্নটাতে কতকটা ভুল ভাঙলেও উত্তরটা কিন্তু সেই হিসাবেই দিল, বলল—"কেন, দুটো ঘর তো রয়েচে।" —আর ততটা কাঁচুমাচু ভাব নেই, ঝড়ের জন্য তোয়ের করে নিয়েছে নিজেকে।

নয়ান বলল—"আর আমি ?…কোন্‌টাতে যাব ?"

অনঙ্গর মুখটা তামাটে হয়ে উঠল, খুব কড়া উত্তরই জুগিয়েছিল মুখে, অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—"গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাস বৌ ? তখন ঐরকম কড়া কথাটা শোনালি, আবার এখন এই, এতই বড় একটা অপরাধ কি ক'রে ব'সেচি ?"

"অপরাধ হোল আলাদা জিনিস। এ হচ্চে আক্কেলের অভাব, না ব'লে উপায় কি বলো ?…যে-লোকটা উঠোন মাড়িয়ে যাচ্ছিল বলে আমায় কলঙ্ক মাথায় ক'রে ভিটে ছেড়ে আসতে হোল…"

"ভূষণো সেরকম নয় বৌ, সেটা ভালো করে জানি তাইতো—নইলে বাবা-মার মতে মত দিয়ে বাড়িতেই পড়ে থাকতুম।…তুইও জানিস সেটা, তবুও কেন যে ও এসেচে পর্যন্ত…"

"কে সাধু কে অসাধু আমি অতশত কি ক'রে জানব ?···বেশ, সাধু যদি, ভালোই তো, তা নিজের ঘরেই থাকুন না !"

"এবার থেকে তাই থাকবে ; আজ নেহাত এসে পড়েচে, রাত হয়ে গেচে···"

"তা থেকেও তো গেল। আমি শোওয়ার কথা বলছিলুম।"

"বললুম তো—ঘর তো রয়েচেই দুটো, না হয় ওতে আমাতেই পাশের ঘরটায় শোব।"

"বললুম তো—উঠোন মাড়ানোতে অত কাণ্ড, এক চালার মধ্যে শুতে হবে ? ··আমি একটা ভেবে রেখেই তুলেচি কথাটা, নইলে এতই আক্কেলের মাথা খাব ?···আর বেশ ভালো ব্যবস্থাও।"

"কি ? সেইটেই আগে বললে হয় তো !"

"মন্দিরের দাওয়ায় যাক না ; গরম, কষ্টও তো হবে ঘরে।"

একটু কি ভাবলে অনঙ্গ, ছোট একটি নিঃশ্বাস পড়ল, বলল - "বেশ, মন্দও নয় কথাটা।"

উঠে গিয়ে বেশ সহজ একটা স্ফূর্তির সঙ্গেই ভূষণকে বলল—"ওরে, ঘরে ভেপসে মরবি কেন ? তাই বলছিলুম, চল, ঠাকুরবাড়ির রকে শুইগে দুজনে !"

নয়ান ওদিকে চোখ তুলে মাথাটা একটু নাড়ল কি ভেবে।

ভূষণও খুশি হয়ে উঠল, বলল—"তাই চল নন্দদা, তোমার বাঁশিটাও নিয়ে নাও, চমৎকার হবে !"

একটা বড় মাদুর, দুটো বালিশ ভাগাভাগি করে নিয়ে চলে গেল দুজনে ; বাঁশিটাও ; তবে অনেকক্ষণই কেটে গেল, বাঁশির সুর আর উঠল না।

যে উদ্দেশ্যে নয়ানের ব্যবস্থাটা করা সেটা কেঁচে গেল। ও আজ জীবনের দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত খানিকটা স্থির করে নিয়েছে, অনঙ্গকে বিশেষ দরকার ছিল কাছে।

সোনাকে আপনিই এক সময় দেয়ালের ধার ঘেঁষে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছিল, খানিকটা গল্পগুজব করে এই ব্যর্থতার নূতন অশান্তিটা চাপা দিল, তারপর সোনা একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেকখানি রাত হয়ে গেছে, ঘুম নেই নয়ানের চোখে, তাইতে গরমটা আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে, কয়েকবারই এপাশ-ওপাশ ক'রে উঠতে যাবে, ঘুম ভেঙে গিয়ে সোনা জিগ্যেস করল—"গরমে ঘুম আসচে না দিদিমণি ?"

নয়ান প্রশ্নটাকে কাজে লাগাল, বলল—"গরম নয় রে; মাথাটা বড্ড ধরেচে। যা তো, তোদের কুটুমকে একটু ডেকে আন্‌তো—কি একটা বেশ বিলিতী ওষুধ দেয়। ডেকে তুই ওদিক দিয়েই চলে যাস বরং! কতক্ষণ আর ভুগবি?"

অনঙ্গ এলে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ ক'রে দিল, বলল—"বোস গোসাঁই।"

নিজে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

অনঙ্গ বিছানাটায় বসে একটু উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল—"বড্ড মাথা ধরেচে তোর?"

"সেই যেমন তখন ধরেছিল, ওটা কিছু নয়। আমি ডেকেছিলুম,—আমায় জিরেনে নিয়ে চলো।"

"জিরেনে!! তুই যাবি? কিন্তু…"

"কিন্তু-টিন্তু নয়, নিয়ে চলো আমায়, যত শিগ্‌গীর পারো। আমার আর সহ্যি হচ্চে না।"

"কিন্তু কারণটা কি? হঠাৎ…"

"সে তুমি বুঝবে না, বোঝার ক্ষ্যামতা নেই তোমার। আমার সত্যি আর সহ্যি হচ্চে না গোসাঁই; আমি তোমায় ধরে রাখি কি ওদের ঠেকাই?—আজ এ এসেচে, কাল সে এসে পড়বে—নিয়ে চলো আমায়, আমার মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলে ফেলচি—কী ক'রে যে কাটবে আমার কটা দিন! ··দোহাই তোমার, নিয়ে চলো আমায়।"

"তাঁরা যদি ঠাঁই না দেন?…মাকে তো দেখলি…"

"শাশুড়ী, শ্বশুর—আমি পায়ে ধরে জায়গা করে নোব; আমার ঘর।"

"ভূষণো তো সেই রইলই, তা ভিন্ন, আমায় সুনজরে দেখেচে একটু—জমিদারবাবুও তো ঠেলে উঠতে পারে কখনও।"

"একটু ঘোমটা টেনে দিলেই তো সে বিপদ কেটে যায়, ও আর এমন ভাবনার কথা কি?…আমায় নিয়ে চলো, যেতেই হবে নিয়ে। না তুমি যাও, আমি নিজেই যাব চলে, লক্ষ্মণ আর সোনাকে সঙ্গে করে; এখানে থাকলেই আমি পাগল হয়ে যাব গোসাঁই।"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কাটল; তারপর অনঙ্গ বলল—"যাবি বৌ; এর চেয়ে সুখের কথা আমার কাছে আর কি আচে? বাবা যে কী মানুষ ভালো করে বোঝবার তো সময় পেলি না। মাও আমার…ঐ যা একটু কড়া নজর।…যাব, যবে বলিস।"

"ঘরে···মানে, ওদের কাজটুকু সেরে এসো, কথা যখন দিয়েই ফেলেচ। কাল সকালেই ভূষণ ঠাকুরপোর সঙ্গে চলে যাও—পরশুই তো?···আর সম্বন্ধও কাটিয়ে এসো বাপু। হয়তো ভালো লোকই, তবে বড় লোক, আমাদের সঙ্গে তেমন মিশ খায় না।"

এগারো

ভোরেই ওদের যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিল, যদিই বা নিজে এসে যায় লোকটা।

মনটা ভাল আছে, বিদায়ের ব্যাপারটা একটু মিষ্টও ক'রে দিল সাধ্যমতো; দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একেবারে সোজাসুজি না হ'লেও ভূষণকে লক্ষ্য করেই বলল—"ঠাকুরপোর এ বেশ ধুলোপায়েই ফিরে যাওয়া হোল, গরীব ভাজের কাছে থাকলেই ভোগান্তি তো; সেখানে রাজার বাড়ি···"

অনঙ্গর পেছনে পেছনে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলই ভূষণ, কথাটা কানে যেতে যেতেই মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, যেন হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে এই-ভাবে ঘুরে এগিয়ে আসতে আসতে বলল—"এই দেখো, প্রেণামটা করতেই গেচি ভুলে!"

অনঙ্গ দাঁড়িয়ে প'ড়ে বলল—"আবার কি? ভাজের টানে আটকে গেলি যে!"

ছেলেটা একটু লাজুক, নয়ানের ঠাট্টায় কথা যোগাচ্ছিল না, একটা পেয়ে গেল, পায়ের ধুলো নিতে নিতে হেসে বলল—"ভাই বলে ভাজের টান, ভাজ বলে রাজার টান···"

এক রকম ছুটেই গট গট ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মিষ্ট করতে গিয়ে নিজের মনটাও মিষ্ট হয়ে গেছে নয়ানের, অনঙ্গকে উদ্দেশ করে বলল—"আবার নিয়ে আসবে সঙ্গে করে, এ হোল না।"

রাঁধতে রাঁধতে সোনাকে বসিয়ে যে গল্প করছিল দুপুরবেলা তাতেও এই সুরেরই রেশ—

"আর দেখচিস কি, এবার তোদের দিদিমণি চলল!"

"ওমা, চলল কি গো!···কবে?···কোথায়?···হঠাৎ যাবার কথা

কেন?”—অতি বিস্ময়ে চোখ তুলে এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ক'রে বসল সোনা।

“আন্দাজ কর না,···কোথায় যায় লোকে?”—ঘুরে খুন্তি দিয়ে তরকারিটা নাড়তে লাগল নয়ান।

সোনা ব্যস্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল—“কাজ নেই আমার আন্দাজ ক'রে। ঠাকরুণ-মা অমনি বলা নেই কওয়া নেই পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে—চললুম! সেই মায়ের মেয়ে তো।···না, যাওয়া-টাওয়া হবে না। যাওয়ার কথা আনবে না মুখে।”

নয়ান হেসে ঘুরে বসল, বলল—“সে যাওয়ার কি আমার উপায় আচে ভাই, বাবা-মাই যে পায়ে শেকল এঁটে দিয়ে গেচে।···যেতে হবে যাদের জিনিস তাদের কাছে; আর কদ্দিন রাখবে তারা, বল্? শ্রাবণে এয়েচি, এই বোশেখ পেরুতে চলল···”

“জিরেনে?···তা হঠাৎ?···ননদের বিয়ে?”—

“জ্বালালি তুই! ননদের বিয়ে না হোলে তাদের আর টনক নড়বে না যে বৌ-ছেলে একলা সেখানে পড়ে আচে?···নেহাত আখড়াটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তাদের হাতে-পায়ে ধ'রে এদ্দিন রইলুম। আর রাখে? ডেকে পাঠিয়েচে।”

“ঐ ওনাকে দিয়ে?···বৌদি বলেই তো এসে দাঁড়াল—তা···”

বেশ একটু ধোঁকায় প'ড়ে গেছে সোনা।

“বৌদিই; তবে নিজের দেওর তো নয়···আর ক'দিনই বা শ্বশুরবাড়িতে ছিলুম বল্ না, কাজেই একটা কি যে বলে বাধো বাধো ঠেকে না? তা নিজের দেওর না হলেও দাদা বলতে একেবারে অজ্ঞান। যেমন একজনের সঙ্গে একজনের হ'য়ে যায় না? লক্ষ্মণও তো শ্রীরামচন্দ্রের মায়ের পেটের ভাই ছিলেন না; সেইরকম আর কি।···এয়েচে—শ্বশুর নাকি একেবারে হেদিয়ে পড়েচেন। আর, আমারও মন টেকচে না সোনা—সত্যি কথা যদি জিগ্যেস করিস। পরও যেখেনে এত আপন সেখেনে যারা সত্যিই আপন তাদের জন্যে মনটা কি রকম আঁকুপাঁকু করতে থাকে একবার ভেবে দেখ্ না—শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ···ননদটি আবার প্রায় সমবয়সীই তো—কী যে মানুষ!—আসতে কি দিতে চায়? গ্রামের বাইরে মনসাতলায় এসে দাঁড়িয়ে আচে।···পা দুটো জড়িয়ে ধরলে—'আবার আসবে শিগ্গীর'···তা দেখ্ না, শিগ্গীর করতে করতে বছর ঘুরে যায় বুঝি···চিঠি লিখে পাঠিয়েচে···”

সোনা বলল—"তা ননদ কি ভালো হয় না গা ?—ননদ-কাঁটা, ননদ-কাঁটা একটা কথা দাঁড়িয়ে গেচে কবে কি করে, তাই, নয়তো ননদও এমন হয় আবার যে মায়ের পেটের বুন তার কাছে দাঁড়াতে পারে না।"

"এ যা আবার! দেখবি, বেঁচে থাকি তো আসবই নিয়ে কখনও না কখনও।"

"তা দেখব বৈকি, নিজের একটি নেই, আরও সাধ হয় দেখতে। কিন্তু ঐ তো নয়, তুমিই চললে এখেন থেকে···"

"চললুম তা কি একেবারে মায়ের মতন সব সম্বন্ধ কাটিয়ে চললুম সোনা, না তা পারি ? একটা সম্পত্তি—কিছুদিন ব'সে থেকে একটা ঠিকানা করে দিয়ে যাচ্চি, এর পরে আসা-যাওয়া তো লেগেই রইল। ঐ যে মানুষটা দেখচিস, ঐ কি পারবে এর পর ঐ রকম ক'রে বাঁশি বাজিয়ে টহল দিয়ে বেড়াতে ? তোর খুকি ত কোলে এসেচে, এই রকম তো এদের সংসারেও আসবে এক একটি করে, তাদের কথা ভেবেই তো এইগুলো সব সামলে-সুমলে রাখা। ঐ মানুষই দেখবি ছুটে ছুটে আসবে—টেনে টেনে নিয়ে আসবে আমায়—যতদিন মানাচ্চে বেড়াক না গায়ে ফুঁ দিয়ে · "

কথাগুলো মিথ্যা বৈকি, কিন্তু প্রবঞ্চনার মিথ্যা নয়। কারুর তো ক্ষতি করছে না নয়ান, শুধু নিজের জীবনে যে ক্ষতিটুকু হয়েছে বা যে সাধটুকু আজ পর্যন্ত অপূর্ণ রয়ে গেছে তাকেই সত্যের পোশাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে লোকের সামনে বের করা একটু। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেওর, ভাবনার লোক রয়েছে সব—নয়ান নেই বহুদিন, পথ চেয়ে থাকবে না সবাই ? থাকে না আর সবার বেলা ? তবে আর মিথ্যা কি বলছে নয়ান ? ··কিন্তু নয়ানই বা কি করবে ? ওঁদের ঘর যারা ভরবে—খুকির মতো এক এক ক'রে এসে, তাদের কথাও আবার ভাবতে হবে তো ?

যে-মিথ্যা দু'দিন পরেই সত্য হয়ে ফুটে উঠবে, দোষ কি বসে বসে তাতে একটু রং ফলানয় ?

লক্ষ্মণের মেয়েটাকে ভালবাসে; একটা ছোট মেয়ে তার পুতুলকে যেমন ভালবাসে, কতকটা সেই ধরণের ভালবাসা। একটু অবসর পেলেই তাকে টেনে নেয়, কাছে না থাকলে কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেয়, সাজায়-গোজায়। সঙ্গে সঙ্গে গুন গুন করে গাইতে থাকে, শৃঙ্গারের যে সব গান আছে। জামা করিয়ে দিয়েছে, একটি ছোট্ট নীলাম্বরী শাড়ি। মেয়েটার বাপমায়ে নাম রেখেছিল

পারি,—হয়তো যত্ন ক'রে পরীই রেখেছিল, হেলা-ফেলায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এইতে এসে, ও সেটাকেও সাজিয়ে মানিয়ে করেছে পেয়ারী। ওকে নিয়ে পুতুল-খেলা করে।

মিথ্যাকে সাজিয়ে করে সত্য। কিন্তু এই সাজানই, এই রং ফলানই বুঝি সার হয়।

দুদিন গেল, চারদিন গেল, ক্রমে একটা পুরো সপ্তাহ কেটে গেল, অনঙ্গর দেখা নেই, কোন খোঁজ-খবরও নেই। নয়ানের কোন উদ্বেগ নেই, চঞ্চলতা নেই ; গোসাঁইঠাকুর একদিন বললেন পর্যন্ত—লক্ষ্মণ কিম্বা প্রসাদ, কাউকে একবার পাঠিয়ে খোঁজ নিলে হোত না ? নতুন জায়গা তো। নয়ান মিথ্যা ব'লে ও-পথটা বন্ধ ক'রে রেখেছে, বলল—"এমনি তো বলেই ছিল দিন ছ'য়েক লাগবে, তার বেশিও লাগতে পারে। দেখা যাক আরও দিনকতক, একজন বড় লোকের কথায় গেচে…"

ঐ—বড় লোকের কথায় যাওয়ার মধ্যে যা একটু খোঁচা রইল, তাও এমন সোজা গলায় বলল যে পুজোর আয়োজনের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ করে ঠাকুর মশাইয়ের কানে লাগল না।

শুধু শ্বশুরবাড়ির আলোচনাটা বেড়েছে, তাও শুধু সোনার কাছেই। বলে —"এই দেরি হচ্চে তো, কোন্‌দিন দেখবি এসে পড়েচেন শ্বশুর। তখন কে করলে দেরি আর কার ওপর ঝালটা গিয়ে পড়ে একবার দেখে নিস সোনা, কাছেই তো রয়েচিস।…তা আমি কি করবো বলো ? তোমাদের ছেলেকে তোমরা এই রকম বাউণ্ডুলে ক'রে তোয়ের করেচ, এখন বৌকে বললে কি হবে ?…কিন্তু কনে বৌয়ের মুশকিল, মুখ ফুটে বলতে পারব না তো কথাটা ; শুধু নিজের মনেই গুমরে মরো…"

"তার চেয়ে, এ বেশ আচি, দিদিমণি।"

সোনা বোধ হয় ভাবে একটা সান্ত্বনার কথা বললাম, নয়ান কিন্তু ছোট্ট একটি খোঁচা দিয়ে এত দুঃখে ও সৌভাগ্যে দু'জনের পার্থক্যটা স্পষ্ট করে দেয় ; বলে—"এ বেশও যে বেশ নয় সোনা, একেবারে চাঁচা-ছোলা, আপন বলতে জগতে আর কেউ নেই ঐ একটি ছাড়া ; তার চেয়ে এ গঞ্জনা যে শত গুণে ভালো দিদি—মেয়েমানুষের এই তো কাম্য…"

আর, শুধু পুতুল-খেলায় একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে আরও।

সর দিয়ে মুখ মেজে টিপ পরিয়ে পেয়ারীকে কখনও সাজায় রাধা, কখনও

কৃষ্ণ। বলে—"তোর পেয়ারীকে আমায় দে সোনা।···দিবি আবার কি; আমি নিলুম, অত খরচ করচি, অমনি না কি ?"

"তা নেও না, তাহলে তো বাঁচি।"

"বাঁচে ওই, যা যত্নের ছিরি বাপ-মায়ের! আমার কাছেই থাকবে, খাওয়াব, পরাব, মানুষ করব। আর যত গান জানি শেখাব; যত শুনেচি, নিজে শেখবার আর জো পেলুম না—সে-সমস্তও···গাইবে—গলা খুলে—রাধারমণের সামনে ব'সে ব'সে···"

সোনা টিপ্পনী কাটে—"আর শ্বশুরবাড়ির ঝাঁটা খাবে···"

নয়ান কতকটা রুখেই যায়, বলে—"শ্বশুরবাড়ি! আমি আমার মেয়ের বিয়ে দোব নাকি—যে শ্বশুরবাড়ি? বোষ্টমের মেয়ের আবার অন্য বিয়ে হতে আচে নাকি? মরণ!—সে রাধারমণের জিনিস, তার গলায় মানুষে দেবে মালা? আস্পদ্দা! বৃন্দাবনের যত জ্বালা, যত কলঙ্ক তো ঐ দু'নৌকোয় পা দিয়েই সোনা, নইলে ভেবে দেখ্ না, কে কার কড়ি ধারে? শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলুম বাবার সঙ্গে, দলে দলে কত দেবদাসী—নাচছে, গাইচে, কিন্তু সব ঐ এক ঠাকুরকে নিয়ে, কী দেমাকে আচে যদি দেখতিস! আমার পেয়ারীও হবে ঐ রকম রাধারমণের দেবদাসী। তবে ওরা যেমন ঐ মন্দিরটুকু ধ'রে আছে সে রকম নয়। জগৎজোড়া রাধারমণের রূপ সোনা, এক রূপ তো নয়, শত রূপ —তাঁকে দেখে দেখে বেড়াবে, যত গান জানে তাঁর পায়ে ডালি দিয়ে।···মানুষ কী সোনা, যে তার গলায় মালা দিয়ে চোখের জল সার করতে হবে? বলবি —তাঁর গলায় মালা দিয়েও তো চোখের জলই সার হয়েছিল রাধা-পেয়ারীর; কিন্তু সে-চোখের জল আর এ-চোখের জল? যমুনা আর একটা পেঁকো ডোবায় তুলনা?"

একটু চুপ করে সামনে চেয়ে যেন বলবে না, তবু বলে ফেলে—"কী ছিলুম কী হয়ে গেচি দেখ্ না সোনা, শুধু একটা বাঁশিকে তাঁর বাঁশি বলে একটু ভুল ক'রে বসেছিলুম···"

আঁচলটা চোখে বুলিয়ে পেয়ারীকে বুকে চেপে ধরে বলে—"আমার পেয়ারীকে আর সে-ভুল দিই করতে? ঘেরে-ঘুরে রাখব চারদিক থেকে।"

বারো

দশটি দিন গেল কেটে। অন্তরের অন্তরে এর প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব রেখে গেছে নয়ান; বাইরে কিন্তু চাপা দিয়ে গেছে সম্পূর্ণ ই: আদর দিয়ে, গল্প দিয়ে, হোল তো রাধারমণের কথা দিয়ে; পেয়ারী আছে, সোনা আছে, গোসাঁই ঠাকুর আছেন। ওর বৃত্তের মধ্যে সাধারণত আরও পড়ে বিন্দু; তা বিন্দু আজ প্রায় মাসাবধি নেই।

থাকে না মাঝে মাঝে এইরকম। বিন্দু হচ্ছে পুরোপুরি মাধুকরী বোষ্টম-মেয়ে। পলাশবাটী গ্রামের মধ্যে একটু পাশ ঘেঁষে দুটি ঘর নিয়ে ছোট একটি আস্তানা আছে, আর আছে বুড়ো বৈরাগী নিকুঞ্জ দাস। একরকম বরাবর এই গ্রামের মানুষ, তবু বিন্দুর পরিচয় নিয়ে কিছু মতভেদ আছেই গ্রামে। নিকুঞ্জর কথা ধ'রেই অনেকে বলে বিন্দুর ঐ প্রথম কন্ঠিবদল; আবার এমনও অনেকে আছে যাদের মতটা একটু অন্যরকম। তারা বলে—ঠিক প্রথম না হ'লেও শেষ ··হয়তো।

"হয়তো"—অর্থাৎ বয়স হয়েছে বিন্দুর; পঞ্চাশ না হয় চল্লিশের বেশ ওপরেই।

তবে বিন্দুকে নিয়ে ঐ কথাগুলোই বড় কথা নয়। রঙ্গে-রসে, আমোদে-আহ্লাদেই পরিচয় বিন্দুর। তার ওপর খাটবার ক্ষমতা; কাজ দেখলেই পড়ে আপনি ঝাঁপিয়ে; ডাকতে হয় না, ঠেলতে পারা যায় না। যেখানে হয়তো ভালোবাসা পাবার কথা নয়, রসে-রঙ্গে কর্মিষ্ঠতায় সেখান থেকেও ভালোবাসা আদায় করবার ওর একটা ক্ষমতা আছে।

এদের যাওয়ার পর যখন দশটা দিন কেটে গেছে, বিন্দু বাইরের টহল শেষ ক'রে ফিরে এল।

সন্ধ্যা হতে খানিকটা বাকি আছে। সামনের খোলা জায়গায় রাখাল ছেলেরা এসে এই সময় হুটোপাটি খেলা করে, রাধারমণের শেতলটা হয়ে গেলে প্রসাদ নিয়ে যে-যার বাড়ি চলে যায়। তাদের একজনকে সোনাকে ডাকতে পাঠিয়ে নয়ান ঠাকুরবাড়ির সিঁড়িতে আড় হয়ে বসে এদিকে মুখ করে—আজকাল যেমন সর্বদাই একটু অন্যমনস্ক থাকে, সেইভাবে খেলা দেখছিল, কানে পৌঁছুল—"জয় রাধে-কৃষ্ট, দুটি ভিক্ষে পাই গো!

চকিতে ফিরে চেয়ে নয়ান প্রশ্ন করল—"ওমা, বিন্দি যে! কখন্ এলি তুই?"

"এলুম এই খানিক আগে। তা একি!—

বিরহিণী রাধা তোমার বাঁধে নাক' চুল,
মলিন নয়ান, ধূলায় শয়ান···"

"হয়েচে।"—থাবা দিয়ে থামিয়ে নয়ান-বৌ সোজা হয়ে উঠে বসল, বলল—"বিরহে তো ম'রে গেলুম! তা তুই বুড়ো নিকুঞ্জ দাসকে ফেলে গেছলি কোন্ চুলোয়?"

চুল বাঁধা নিয়ে উত্তরটা দেওয়ার জন্যেই একবার ওর মাথাটার দিকে চেয়ে বলল—"চুলের তোয়াজ দেখে তো মনে হয় না একদিনের তরেও লেগেচে বিরহটা।"

বিন্দু ভ্রূ নাচিয়ে বলল—"ষাট্! আমাদের আবার বিরহ! খোঁটায় বাঁধা নাকি? যে-ঘরে গিয়ে ঝুলি বাড়িয়ে দাঁড়াব সেই ঘরেই একটি করে শ্যাম আমার জন্যে; বিরহ ফুরসৎ পাবে ঘেঁষতে তবে তো।"

নয়ান একটু গুছিয়ে বসল, বলল—"বল্ তোর দু'চারটে শ্যামের কথা।·· সত্যি, গল্প বল্ বিন্দি শুনি, কোথায় কোথায় গেলি···"

"একটি শ্যামের কথা শুনলে আর শোনবার আহিংকেই মিটে যাবে যে।"

"তাহলে তার কথাই বল্, শুনিই না আহিংকে মিটিয়ে।"

বিন্দু বাঁ হাতটা চিতিয়ে নিলে, তার একটু ওপরে ডান হাতের তিনটি আঙুল জড়ো ক'রে একটু সুর করেই আরম্ভ করল—

অনঙ্গ জিনি তামসী অনুপম রূপরাশি
অধরে মুরলী—সুর লীলা,
সখি, বঙ্কিম কম-ঠাম, নয়ানক অভিরাম,
এ-পুরুষ কৈসন ভেলা?
সখি···"

"আচ্ছা থাম, বুঝেচি।"—অনঙ্গ কথাটা থেকেই কান পেতে দিয়েছিল নয়ান, তারপর শেষের দিকে 'নয়ানক' কথাটায় বিন্দু একটু টান দিয়ে হেসে চাইতেই আবার থাবা দিয়ে থামিয়ে দিল, বলল—"চেনা শ্যাম নিয়ে গল্প জমে না···"

"তা, অচেনা শ্যামও আছে···"

কথাটা যেন ফস্ করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, মাঝপথে সামলে নিলেও বিন্দু একটু যেন কি রকম হ'য়েই গেল। 'এই সময় সোনা এসে পড়ায় কথাটা

যে বেশি খেয়াল হোল না নয়ানের তাতে যেন বাঁচল সে। সোনা আসতে আসতেই বলল—"বিন্দুদিদি যে! গান যে থেমে গেল গো আমি এসতে না এসতে!"

"কুজোর জন্যে সে আলাদা গান।"—এ ঠাট্টাটুকুতেও খানিকটা সামলাল, তবে গানের দিকে আর গেল না বিন্দু, এমনই সোজা বলে গেল—

ঐখান থেকেই তো সিধে আসছে সে। আগে তো জানত না। শ্রীপাট মদনমোহন থেকে বেরুবার আগেই শুনলে মৈনের রাজবাড়িতে নাকি ক'দিন থেকে মোচ্ছব গোছের চলছে—যাত্রা, ঢপ, কবি, কীর্তন, অপেরা। আর অপেরায় কোথা থেকে এক কেষ্ট এসেছে, অমনটি নাকি আর হয় না, যেমনি রূপ তেমনি নাকি আবার বাঁশি বাজানো। কুটুমকে দেখার পর আর নূতন কি এমন হবে—তার জন্যে নয়, তবে দেশ-বিদেশ ঘুরে এল কতবার, আর মৈনের রাজবাড়িটা কাছে থেকেও দেখা হয়নি, কতকটা যেন সেই টানেই গেল বিন্দু। গিয়ে দেখে—ওমা, এ যে ওদেরই কুটুম। তবে হ্যাঁ, যাওয়া সার্থক হোল—ও-রূপে তো আর কখনও দেখেনি কুটুমকে—তেমনি হয়েছে আবার রাধিকাটি, আসর যেন আলো করে দাঁড়িয়েছে। আর সে বাঁশি! তাও তো আগে এমন ক'রে শোনা ছিল না।···আর এদিকে কি খাতির কুটুমের, রাধিকাও নাকি ওদিক'কারই ছেলে—কী খাতির দু'জনের! রাজ-বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ভাল পাকা ঘরে জায়গা হয়েছে।···তেমনি আর সব রকম ব্যবস্থা। আর বাঁশি বাজানো থেকে ফুরসৎ আছে? রাত্তিরে অপেরা শেষ হোল তো দিনের বেলা দেউড়িতে ডাক।·· নিজের লোক, বিন্দুর বুকটা সাত হাত হয়ে গেছে, দেমাকটা দেখাবে না? তাক বুঝে বুঝে করলে দেখা কুটুমের সঙ্গে, তার পরেই ওর আবার সে কি খাতির! কুটুম নিয়ে গিয়ে আবার দেউড়িতে ভিড়িয়ে দিলে কি না। তখন ওদিকে বাঁশি, এদিকে বিন্দুর গান—একা পলাশবাটীরই তো জয়-জয়কার।···দেউড়িতেই থাকো, দেউড়িতেই খাও-দাও, ওদিকে যাত্রা, অপেরা, কীর্তন-ঢপ শোন, আর দেউড়িতে গান শোনাও।···একদিন রাজার কাছেও হোল···রাজার নাম 'হীরেলাল রায় চৌধুরী' কুমারবাহাদুর বলেই ডাকে সবাই। তা—অত বড় লোকের সামনে গাওয়া তো অভ্যাস নাই বিন্দুর, গলা যেন বেধে বেধে যেতে লাগল—তাই নাকি এত ভালো হোল, কুমারবাহাদুর বলে—বোষ্টুমী, একদিন বাইরেও হোক, তোমার জন্যে আলাদা আসর করে দিই···

সোনা হাঁ করে শুনছিল, প্রশ্ন করল—"হোল নাকি ?"

বিন্দু বলল—"রক্ষে করো ঠাকরুণ! পেশাদারী ঢপ নাকি ?…তবে কি চমৎকার লোক যে কুমারবাহাদুর!…আর সত্যিই যেন রাজপুত্তুর !"

কেমন যেন হঠাৎ ঘুরে গেল কথাটা এখানটায়। বিন্দু একটু চুপ ক'রে গেল; এদের দুজনের মুখেও যেন কোন কথা জোগাল না। তারপর একটু যে অস্বস্তি সেটা যেন কাটাবার জন্যেই নয়ান হেসে উঠে বলল—"দেখচি নিকুঞ্জ দাসের কপাল ভাঙল এবার।"

ওরা দুজনেও হেসে উঠল; সোনা সব সময় অত ভেবে বলতে পারে না, হাসির মধ্যেই বলে উঠল—"কুমার বাহাদুরেরই বা কি এমন কপালজোর ?"

বিন্দুর বয়স লক্ষ্য ক'রেই বলা। তবে হাসির মধ্যেই বলা, আর বিন্দু ঠাট্টা নিতেও পারে; হাসিটা হাসির ধাক্কাতেই গেল বেড়ে।

তারই মধ্যে একটু থেমে গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে বিন্দু বলল—"হাসি নয় গো ঠাকরুণ, এদিকে শিয়রে সংক্রান্তি—যার জন্যে তাড়াতাড়ি সব ফেলে ছুটে আসতে হোল বাঁদীকে।"

নয়ান ছোট্ট করে শুধু বলল—"আহা গো, মরে যাই!"

হাসিটা একেবারে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। আগ্রহটা লেগেই ছিল, কয়েকবার চেষ্টা করে হাসিটা থামিয়ে নয়ান বলল—"মরণ! এসেই হাসির গমক তুললে—কে জানে কপালে কি আছে?…নিজে আয়েস করে গিলে-পিটে আমার জন্যে কি এনেছিস—যে শিয়রে সংক্রান্তি ?"

বিন্দু বলল—"তা অল্প-সল্প নয়, মৈনে সব সুদ্ধ্যু এখানে উঠে আসচে—"

এক মুহূর্তে নয়ানের মুখের অত আলো যেন দপ ক'রে নিভে গেল। ভ্রূ কুঁচকে একেবারে সিধে হয়ে ব'সে জিগ্যেস করল—"তার মানে ?"

বিন্দুর হিসাবে ভালো খবরই, তবে নয়ানের ভাবগতিক দেখে আর উৎসাহ দেখিয়ে বলতে পারল না, আমতা আমতা করেই বলল—"সব সুদ্ধ্যু মানে কি সত্যিই সব সুদ্ধ্যু ? যাত্রা, অপেরা আর ঢপ—দুদিন দুদিন করে গাওনা হবে—অবিশ্যি তার বেশি করতে চাইলে আপত্তি নেই ওনার।"

"ওনার মানে ?"

কথাটা বোধ হয় ইচ্ছে ক'রেই ব্যবহার করেনি, বিন্দু বলল—"ওনার—তার মানে কুমারবাহাদুরের আর কি !"

"এ আপত্তি করলে না ?—তোদের কুটুম্ব ?"

বিন্দু এবার যেন একটু ব্যাজার হোল, বলল—"আপত্তির আর কি আচে এতে? খরচটা তো আর আখড়ার নয়—এক পয়সা নয়; খাওয়া, ফুরন, সব ওনার—ঐ কুমারবাহাদুরের; শুধু থাকবার ব্যবস্থা করা কটা দিনের জন্যে—তাই পাঠিয়ে দিলে আমায় তাড়াতাড়ি—কুটুমই দিলে পাঠিয়ে—গাঁ থেকে প্রসাদ-এদের ডেকে তাড়াতাড়ি লম্বা একটা চালা তুলে দেওয়া—অবিশ্যি রাজার বাড়িতে যে আয়েসে ছিল সবাই, এখানে কি…"

খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে নয়ান—কতকটা যেন বিহ্বলই, তাইতে বিন্দু গড়গড়িয়ে বলে যাচ্ছিল, নয়ান বাধা দিয়ে বলল—"সেও…মানে · তিনিও আসবেন নাকি?…কুমারবাহাদুর?"

বিন্দু এবার থতমত খেয়ে গেল। ব্যাজারের ভাবটা হঠাৎ কেটে গিয়ে যেন একটা কুণ্ঠিত ভাব এসে গেছে, বলল—"সে আমি…তাতো আমায় কেউ বলেনি · যদি আসেও তো এখানে এসে কি তাঁবু ফেলে থাকবে?…এলো ঘোড়ায় চড়ে, যখন খুশি চলে গেল—রাজারাজড়ার মেজাজই তো, ধরো যদি আসেই—অত বড় লোকটা—সে তো একটা ভাগ্যিও আখড়ার…কি গো সোনা-বৌ?"

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল নয়ান, যেন তন্দ্রা থেকে হঠাৎ জেগে উঠে বলল—"আসা হবে না—যাত্রা, অপেরা, ঢপ, কেত্তন, বাউল—কিছুরই নয়—আমি ওসব ঝক্কি বইতে পারব না; এই এক কথা বলে দিলুম। যখন নিজেদের অবস্থা হবে, আসবে—একটা, দুটো যা' হোক—এ রকম ভিক্ষে ক'রে—আমার দেবস্থান…"

"এ আর ভিক্ষে কি? একটা মানুষ কুটুমকে ভালোবেসে—কুটুমের খাতিরে—নিজের খরচে·· সোনা-বৌ কি বলিস?"

"না, না, না, এখানে হবে না—অত খাতিরের জিনিস, ভালোবাসার জিনিস তো সেখানে নিয়ে যাক তোদের কুটুম—নিজের বাড়িতে, জিরেনে—এখানে আমি কোন মতেই আসতে দোব না।"

রীতিমতো চটে উঠেছে। শেষের এ ধরণের কথাতে ওরা দুজনেও আরও যেন কি রকম হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। ওরই মধ্যে একটু চুপ করেই যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এই ভাবে ব'লে উঠল নয়ান—"কেন, তোদের কুটুম জানে না যে এখানে ওসব পাট উঠে গেছে?"

একটু নূতন ধরণের কথাতে ওরা দুজনেই মুখ তুলে চাইলে।

নয়ান বলল—"ন্যাকা! কেন, যাবার দিনই তো সে কথা হোল? মনে না থাকে, মনে করিয়ে দে গিয়ে। তুই যা বিন্দি, যেমন ধুলো পায়ে এয়েচিস তেমনি ধুলো পায়েই বিদেয় হয়ে মানা করে দিগে যা; বলবি রাজভোগের মধ্যে সব ভুলে বসে আচে? এখানে আর থাকবে কে যে—যাত্রা, থিয়েটার, অপেরা, কেত্তন, ঢপ, বাইজী, কুমারবাহাদুর? যা, এক্ষুনি বিদেয় হ'।"

বিন্দু বলল—"আমায় আর এর মধ্যে কেন টানা? ঢের শিক্ষে হয়েচে, ভালো জেনে বলতে এসেই ··"

নয়ান আবার ঝেঁজে উঠল—"তোকেই যেতে হবে, তোরা সব একজোট হয়ে এই কাণ্ডটা ঘটিয়েচিস, সেটাও আছে—সেই আসর-আলো-করা শ্রীরাধিকা।···যেতে হবে তোকে···"

রাগের তাড়সেই উঠে দাঁড়িয়ে হন হন করে বাড়ির দিকে চলে গেল।

মনের অস্থিরতায় সমস্ত রাত এপাশ ওপাশ ক'রে কাটাল। সোনা আর লক্ষ্মণ দুজনেই আজকাল এখানে শুচ্ছে, ভোরেই উঠে লক্ষ্মণকে গাঁয়ের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে, বিন্দুকে মৈনেতে যেতে বারণ করবে আর প্রসাদকে ডেকে আনবে। বিন্দুকে বিশ্বাস হচ্ছে না।

লক্ষ্মণ এসে জানালে প্রসাদ গেছে দূরে ভিন গাঁয়ে। ভোরেই বেরিয়ে গেছে; কোথায় গেছে, কেন গেছে, কিছু বলে যায় নি, শুধু বলে গেছে হয়তো ফিরতে রাত হয়ে যাবে। প্রসাদকেই পাঠাবে ঠিক করেছিল, নয়ান যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। একটা চিঠি লিখে লক্ষ্মণকে দিয়েই পাঠিয়ে দেবে ভাবলে; মনের অস্থিরতায় চিঠিটা এত কড়া হয়ে গেল, তারপর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করায় এত নরম হয়ে গেল যে দুটো চিঠিই কুচি কুচি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলে। রাগটা গিয়ে পড়ল লক্ষ্মণের ওপর, বলল—"তুমি কোন কাজের নয় লক্ষ্মণ, কার হাতে দিতে কার হাতে দিয়ে বসবে, তার চেয়ে থাক, যা অদৃষ্টে আচে আমার হবে।"

প্রত্যেক লোক হয় বোকা, নয় এই ষড়যন্ত্রে আছে। নয়ান কাউকে আর কিছু বলল না, এমন কি ঠাকুরমশাইকেও নয়, অবশ্য বোকা বা ষড়যন্ত্রী বলে নয়, ভয় হোল—উনি যদি আবার ঐ দিকেই সায় দিয়ে বসেন—কতকটা যেন সায় দেবেনই ধরে নিয়ে একটা অকারণ অভিমানও এসে পড়ল ওঁর উপর। একেবারে মুখ বুজে পূজোর সময়টা কাটিয়ে দিলে।

বোধ হয় দূরে, আর এই অসহ্য আবহাওয়ার বাইরে রয়েছে বলেই শুধু

প্রসাদের উপর ভরসাটা রইল অটুট। লক্ষ্মণকে সমস্ত দিনে কয়েকবারই পাঠালে সে ফিরেছে কিনা দেখতে।

প্রসাদ এল পরের দিন একেবারে কাক-কোকিল ডাকবার আগে। ডেকে তুলে কাহিনীটা বললে নয়ানকে, ও যেমন ফলাও করে বলে—

"পরশু বৈকালের কথা,—বিন্দু বোষ্টুমী এসে খবর দিলে—আর কি! পলাশবাটীর আখড়ার এবার কপাল ফিরে গেল·· কিসে গো?—কাহিনীটি বলো তো শুনি, না,—মৈনের রাজা যে কুটুমের বাঁশি শুনে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছে—আর আর কি করবে সে পরের কথা—আপাততঃ নিজের অপেরা, ভালো একটা যাত্রার দল, সিউড়ির নাম করা ঢপওয়ালি পদ্মমণি এদের দিয়েচে পাঠিয়ে—এই এসে পড়ল বলে।···বিন্দুকে বললুম—তা খবরটা তো জবর এনেচিস—মৈনের নতুন রাজা, শুনেচি যেমনি শোকো তেমনি দরাজ হাত—খবরটা তো জবর, পলাশবাটীর একটা ভাগ্যি, কিন্তু এই তিন তিনটে দল—তারা উঠবে কোথায় এসে? থাকবে কোথায়?···না, সেই জন্যেই তো কুটুম তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলে আমায়, বলে—বিন্দু ঠাকুরঝি, তুমি তোমার গান-টান রেখে ঝট বেরিয়ে যাও, (গান নিয়ে বিন্দুর যে আবার নামডাক বেরিয়ে গেছে সেখেনে—পলাশবাটীর জয়জয়কার)—বৌকে বলো গিয়ে প্রসাদকে ডেকে শিগ্‌গীর একটা লম্বা চালা কোন রকমে তুলে ফেলুক সব কাজ ফেলে—মান বাঁচুক আগে আখড়ার।···তা চালা যে উঠবে, বাঁশ না হয় যোগাড় হোল, কিন্তু পলাশবাটীতে খড় কোথায়? কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক আঁটিও বেরুবে না তো,—তখন ছোট্ রাতারাতি সেই মোমিনগাঁ—উদিকে খড় নাকি আচে। তাও কি একটা গাঁয়ে মেলে?—কাল সমস্ত দিন কাছাকাছি কটা গাঁ ঘুরে—চান নেই, আহার নেই—কোন রকমে জোগাড় হোল কিছু। তখন আবার গাড়ি যোগাড় করো—সময় নেই ইদিকে—শিয়রে সংক্রান্তি—শেষে কোন রকমে খান পাঁচ গাড়ি জোগাড় করে সন্দে বেলায়ই রওয়ানা হয়ে—সমস্ত রাত নিদ্রে নেই—এই এত করে কোন রকমে কাজ হাসিল ক'রে এই পৌছনো গেল। এসে পড়েচে গাড়ি, পলাশবাটী গাঁ ছেড়ে এতক্ষণ বেরিয়ে এয়েচে—আমি বললুম, তোরা আয়, আমি এগিয়ে দিদিমণিকে তাড়াতাড়ি দিগে খবরটা—তানার যে কি করে কাটচে!···"

কি ক'রে, কি একটা ঘোরের মধ্যে মনের ও অবস্থাতেও এতখানি আবল-তাবল নির্বিবাদে শুনে গেল নয়ান যেন বুঝে উঠতে পারছে না, হঠাৎ বেশ

চেঁচিয়েই বলে উঠল—"পেসাদ কাকা! তোমার মাথা খারাপ হয়েচে পেসাদ কাকা! সত্যিই মাথা খারাপ হয়েচে তোমার, আমায়ও পাগল করে তুলবে তোমরা—সবাই মিলে!"

প্রসাদ একেবারে বাকরোধ হয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"হ্যাঁ, সত্যিই মাথা খারাপ হয়েচে তোমার। এ হাঙ্গাম এখন করা চলে এখানে? এটুকু ভেবে দেখবার মতন সম্বিত তোমারও হোল না?"

প্রসাদ মাথা চুলকোতে লাগল। কাঁচুমাচু হয়ে বলল—"চলে তো না-ই, বিন্দুকে তো সেই কথা বললুমও, তা..."

নয়ান বলল—"ও-সব গাড়ি যেমন বোঝাই করা তেমনি বোঝাই করা ফিরে যাবে, একটা কুটো এখানে নামবে না।...আর তোমায় এক্ষুনি মৈনেয় যেতে হবে, এখানেই নেয়ে দুটি খেয়ে নাও। ঘুম এখন মাথায় থাক; কি করব, নিজেদের দোষেই এ নিগ্রহটা হোল তোমার। ঘুম এখন মাথায় থাক্—যত তাড়াতাড়ি পার গিয়ে এখন তোমাদের কুটুমকে মানা করে দাও—ও হাঙ্গাম এখন এখানে কোন মতেই টেনে আনা চলবে না।"

তাড়াহুড়ো করতে করতে প্রসাসের দেরিই হয়ে গেল খানিকটা। তার-পর, ব্যবস্থা যখন একটা হতেই চলেছে, নয়ানও একটু ঢিলে দিলে। অনাহার, অনিদ্রা, মেহনৎ—প্রসাদের শরীর যেন আর বইছে না, নয়ান নিজেই বলল—"একটু ঘুমিয়ে নাও পেসাদ-কাকা, দুপুর পর্যন্ত বেরুলেও তুমি বিকেলের দিকে পৌঁছে যাবে।...কী ফ্যাঁসাদটাই যে ক'রে বসলে সবাই মিলে!"

ডেকে তুলল না ঘুম থেকে। তারপর দুপুর বেশ গড়িয়ে গেলে প্রসাদ উঠে মুখ-হাত ধুয়ে যাত্রা করবে, এমন সময় গাঁয়ের ছেলেদের আনন্দকলরব আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকের মধ্যে তিনখানি গোরুর গাড়ি এসে আখড়ার বাইরে দাঁড়াল। যাত্রার দলের লটবহর! আর একটিতে পদ্মমণি ঢপওয়ালির সাঙ্গোপাঙ্গ। অনঙ্গই এসে নয়ানকে উৎসাহের সঙ্গে বলল—"পাটির লোকেরা পেছনে আসচে, যাত্রা গেলে তারপর অপেরা আসবে। এইতো দেখচি খড়ও এসে গেচে। আমি তাই তাড়াতাড়ি বিন্দুকে পাঠিয়ে দিলুম।"

তেরো

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আর শুধু কথা বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকলেই কুলায় না যেন ; কিন্তু সেটুকু করেও যে গায়ের ঝাল মেটাবে তারও অবসর বা সুযোগ রইল না।

শুরু করেছিল বেশ ভালভাবেই। গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে ; একদিকে চালাটা তাড়াতাড়ি তুলে ফেলার হৈ-চৈ, বাঁশ কেটে আনা, বাঁখারি ফাড়া, খুঁটি পোঁতা। গরম কাল, একটা হালকা চালা রাত পর্যন্ত কোন রকমে খাড়া করেই দিতে হবে। জন পঁচিশ-ত্রিশ লোক ঐদিকেই ; দেখতে দেখতে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। একদিকে মাটি খুঁড়ে উনুন হচ্ছে, কাঠ এসে পড়েছে। যাত্রা আর পদ্মমণির সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সেও প্রায় জন ত্রিশ। ভাত তো তোয়ের থাকারই কথা। কাজের সঙ্গে অকাজের হৈ-চৈ ; নদীতেও হুল্লোড় নেমেছে, যাত্রার ছেলেদের ; গাঁয়ের ছেলেরা যোগ দিয়েছে। বাইরে ভেতরে নিয়ে সমস্ত তল্লাটটা তোলপাড়, এর মধ্যে একটি লোক কঠিন নিভৃত রচনা করে নিয়ে একেবারে হয়ে রয়েছে আলাদা।

বেশ ভালভাবেই শুরু করেছিল নয়ান, আর বেশ মনোজ্ঞ করে। দাওয়া থেকে নিচে নামেনি, তবে সে আর মাথা ধরার ছুতো ক'রে নয়। বেশ সুস্থ, প্রসন্নই, মুখে একটা হাসিও ধরে রয়েছে। কথা একরকম বন্ধ, ওদিককার সবার সঙ্গেই, তবে তা কথা না কয়ে নয়। অনঙ্গ এসে খবরটা দিয়ে যখন বলল—"আমি তাই বিন্দুকে পাঠিয়ে দিলুম", নয়ান একটু সহজ হাসির সঙ্গেই উত্তর করেছিল—"কাজও সব ঠিক ক'রে রেখেছে বিন্দু !"

শুধু "বিন্দুর" উপর একটু জোর। অনঙ্গ আর সাহস করেনি ও প্রসঙ্গ তুলতে, বা কোন প্রসঙ্গই।

প্রসাদও এসেছিল, একেবারে গোড়াতেই। ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ার থেকে চাল-ডাল বাসন-কোসন বের করে দিতে হবে ; নগদও চাই কিছু। বাঁশ-খড়ের হিসাব না হয় পরে হবে, আপাততঃ বাজারে লোক পাঠাতে হবে তো ; তরিতরকারি চাই, চালটার জন্য দড়িও। হাঙ্গাম করা তো চলে না—বোঝে না কি সে কথা ?—কিন্তু যখন এসেই পড়েছে ঘাড়ে, নিজেদের দায় একটা...

নয়ান হাসতে হাসতেই আঁচলটা ঘুরিয়ে নিয়ে চাবির থোলোটা খুলে ফেললে, প্রসাদের সামনে ফেলে দিয়ে বললে—"দায়,—সে যতক্ষণ এইটে কাঁধে রয়েচে পেসাদ-কাকা, ঐ নাও, খালাস হলুম।"

প্রসাদ একটু মূঢ়ভাবে থোলোটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মুখ তুলে বলল—"ও দায় কি আমিই নিতে পারি মা? বল্; ফেলে তো দিলি পায়ের কাছে।"

নয়ন একটু ব্যঙ্গের স্বরেই বললে, কতকটা যেন ভেংচি দেওয়ার মত করে—"উচিতও নয় নেওয়া; তবে তুমি নাকি বড্ড বুক দিয়ে পড়েচ—সব্বার চেয়ে বেশি করে……"

সকালে একটা চোট খেয়েছে, আবার এখন এই; তাও এই রকম আতান্তরের মধ্যে—প্রসাদ যেন কি রকমটা হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। নয়ান আর বাড়াল না কথাটা; অনুশোচনাও হয়, এরা তো চিরকালই এই রকম বুক দিয়ে পড়েছে আখড়ার কাজে, দুটো মিষ্টি কথার বিনিময়ে। আর আঘাত হানল না, চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল—"আচ্ছা, তুমি যাও পেসাদ-কাকা, ব্যবস্থা হচ্চে।"

একটু মিষ্টিও ক'রে দিলে, বলল—"আমি বলছিলুম, যিনি এই হাঙ্গামটা বাধিয়ে বসেচেন তাঁর কথা—তোমাদেরই জামাই; অন্ততঃ এই দিকটা একটু দেখলে তো তুমি সামলে নিতে পার আর সব দিক। সামলাবার তো তুমি একাই দেখচি!"

তারপর ভেতরের রাগটাই আবার স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল, মুখ নাড়া দিয়ে বলল—"আমার কথা বলবে—তা আমার দ্বারা কিছু হবে না, হাঙ্গামের বহর দেখেই আমার মাথায় যেন চরখী ঘুরতে লেগেচে।"

বারান্দা থেকে হনহনিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

তখনই আবার বেড়িয়ে এল, মনের গোলমেলে অবস্থায় সব ভুল হয়ে যাচ্ছে, হাঁক দিলে—"ও পেসাদ-কাকা, শোন।"

প্রসাদ এলে চাবির থোলোটা নিয়ে নিলে, লক্ষ্মণের হাত দিয়ে অনঙ্গের কাছে পাঠিয়ে দেবে ব'লে। প্রসাদের হাতেই পাঠিয়ে দিতে পারত; কিন্তু চাবি দেওয়ার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কিছু শোনাতে হবে, প্রসাদকে আর এর মধ্যে টানতে ইচ্ছে হোল না।

কিন্তু লক্ষ্মণ কোথায়? আবার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে; প্রসাদকে তো

বললে হোত লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে দিতে। একবার ঘর একবার দাওয়া—এই ক'রে নিজের ভুলের রাগটাকে ওদের উপর চাপিয়ে পুষ্ট করতে লাগল নয়ান—দাওয়া থেকে নামবে না, ওদিকে যারা কাজ করছে তাদের কাউকে ডাকবে না; চলুক যতক্ষণ চলে……

তারপর সোনাকে রান্নাঘরের দেওয়ালের পেছন থেকে বেরুতে দেখে সমস্ত রাগটা নিয়ে যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—

"বেরো তুই! কি করতে এলি? কে তোকে ডাকতে গেছল? কাউকে দরকার নেই আমার, কেউ আমার ভিটে মাড়াবি নে। যা, কুমার বাহাদুর মোচ্ছব করাচ্চে সেইখানে, খবরদার পা দিবি নি সিঁড়িতে……"

সোনার মুখে রাজ্যের ব্যাজার। কাঁখে পেয়ারীকে ধরেও আছে এমন হ্যালাফ্যালা ক'রে; যদি পড়েই যায় তো আপত্তি নেই। মুখটা গোঁজ করে গট্ গট্ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে, দুম করে নয়ানের পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বলল—"তা এসবুনি আর, খুব ভাল কথা, আমিও তাই চাই, কিন্তুন এটাকেও আর আমার গরীবের ভিটেয় উঠতে দোব না; মা ছেল ঘুঁটেকুড়ুনি, মেয়ে হলেন রাজরাণী! তা রাজরাণী যেখেনে মানাবে সেইখানেই থাকুন, আমি তো করতে যাই নি।…কতটুকুই বা গেচি এখান থেকে বলো না, মনে করলুম তাড়াতাড়ি হেঁসেল তুলে যাই, একটু দেখি কারা এল, কি হচ্চে, তা ক্রেমাগত বায়না, ক্রেমাগত বায়না, এটা খাবেন না রাণী, ওটা এনে দাও। কোন রকমে গিলিয়ে পিটিয়ে যদি বাপকে বললুম গাঙের ধারে নে গিয়ে একটু ভোলাক, আর সহ্যি হচ্চে না—তো জামা পরাও—এ জামা নয়, ও জামা নয়—"

নয়ান একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, জিগ্যেস করলে—"তুই পেয়ারীকে খাইয়ে নিয়ে যাস্ নি?"

"বেয়াক্কেলে কথাগুলো বলুনি বাপু। কুটুম এল ঠিক দুপুর মাথায় ক'রে, আমি ঐ রাক্কুসীকে তোয়াজ ক'রে সব গিলিয়ে দিই, আর সে উপোস ক'রে থাকুক্……"

গরগর ক'রে ব'কেই যেতে লাগল সোনা। নয়ানের কিন্তু একেবারেই মন নেই এদিকে। শুধু তো পেয়ারীই নয়; যতদিন অনঙ্গ নেই, সোনা-লক্ষ্মণও এই হেঁসেলেই খেয়েছে, শুধু দুজনের ভাতটা সোনা বাড়িতেই নিয়ে যেত। ওদিকে এই, এদিকে অনঙ্গকেও কি খেতে বলেছে নয়ান? নিজে যে উপোস ক'রে আছে সেটা না হয় বাদই দিলে, সেটুকু হয়েছেও উপযুক্তই।

সামনে হৈ-চৈয়ের মধ্যে কাজ এগিয়ে চলেছে। খুঁটি পুতে আবার বাঁশ তোলা হচ্ছে, উনুনে আগুনও ধরে উঠল। নয়ান সেইদিকে চেয়ে আরও অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সোনা জো পেয়ে অবাধে ব'কে যাচ্ছে। পেয়ারী এতক্ষণ এর মুখের দিকে চেয়ে, ওর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট ফোলাচ্ছিল, একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠল।

নয়ানের মনটা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল এদিকে, হেঁট হয়ে তুলে নিয়ে আগে সোনাকেই একটা ধমক দিলে—"তুই ওকে মেরেচিস!"

সোনা গালে আঙুল চেপে চোখ দুটোকে বিস্ফারিত ক'রে বললে—"মারলুম আমি? সামনে দাঁড়িয়ে রয়েচ তবু!"

"এখন নয়।...খেতে দিস নি, তার উপর পিটেচিস; তুই চণ্ডাল!"

সোনা একেবারে খিল খিল ক'রে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, নয়ান আরও কড়া ধমক দিয়ে উঠল—"আবার দাঁত বের ক'রে হাসচিস—ওকে রাক্কুসী বলচিস কি, রাক্কুসী তুই·· মা নোস—মা এমন পিশাচ হয় না···"

সোনা থেমে গিয়ে মুখটা থমথমে ক'রে নিল, বলল—"হাসব না, হাসবার মতন মনের বড় অবস্থা! হাসি ঠেলে বেরোয়—একটা কথা মনে পড়ে গেল—দাদা পাঠশালে পড়ত, বাঘ শেয়ালের ছানাকে বলচে—আজ আমার জল ঘোলা করিস নি তো সেই আর বছর ঘুলিয়েছিলি।—কপালে অযশ থাকলে তো এমনি ক'রে এসে পড়ে।...তা বেশ আমি মা নই, আমি চণ্ডাল, আমি পিশাচ—সম্বন্ধটা কি আর চণ্ডালের সঙ্গে, পিশাচের সঙ্গে? বাজার ঘেঁটে সেরা জামা-কাপড়ও দিতে পারব না, মুখে ননী-মাখনও তুলে ধরতে পারব না। যে পারবে—যে নাই দিয়েচে তার কাচে রইল—আমার জবাবও তো হয়ে গেচে—ভিটে মাড়াতে পারব না—তা এই চল্লুম।"

গটগট করে আবার সিঁড়ি দিয়ে নামছে, নয়ান আবার চেঁচিয়ে উঠল—"বলি ঠ্যাকার দেখিয়ে চললি কোথায় পেটের মেয়েকে গছিয়ে দিয়ে? দুটো জামা দিয়েচি মেয়েটাকে—নিজের মতন পেত্নী ক'রে রাখত—মস্ত বড় অপরাধ করেচি, সারা জন্ম পুষে তার প্রাশ্চিত্তির করতে হবে! গছিয়ে দিয়ে যে চললি—থাকচে কে এখানে?—যাবার জন্যে গোছগাছ করচে মানুষ, তার মধ্যে যে মেয়েটাকে এনে দুম করে বসিয়ে দিলি, বলি থাকবে কে যে তদারক করবে তোর মেয়ের?···"

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল সোনা—ওদিকে মুখ ক'রেই আস্তে আস্তে

উঠে এল, একবার ঘর দুটোর দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"তুমি যেতেচ নাকি!…কখন?"

গলা একেবারে নিচু হয়ে গেছে, একবার ঠাকুরবাড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে; তারপর নয়ানের মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞেস করলে—"এ ছরকোটের মধ্যে যাবে কি গো!"

নয়ান আবার ঝেঁজে উঠল—"ন্যাকা সাজিস নে সোনা; একজন সব জেনে শুনে ন্যাকা সেজে এই ছরকোটটা করেচে—আরও করবে—তার সঙ্গে আর তুই ন্যাকা সাজিস নে। সমস্ত পলাসবাটী জানে আমি আর থাকচিনে এখানে, শুধু যাদের সব চেয়ে বেশি জানবার কথা তারাই ন্যাকা সেজে বসে আচেন!… নে উঠে আয়, বিছানা-পত্তরগুলো সব ঠিক কর্…"

"আমি ভাবচি, যাবে কি ক'রে।…কুটুম…"

"কুটুম তোদের রইল—যা ছাতু গুলেচে, সব তুলতে হবে। আমার কি! গোঁসাই-দাদু আসবেন, একবার বলা দরকার বলব, সঙ্গে নিয়ে যান ভালই; নইলে উদ্ধবের গাড়িটা জুতিয়ে নিয়ে একলাই—বোষ্টমের মেয়ে তার আবার একলা-দোকলা! দিব্বি জ্যোচ্ছনা রাত্তির…"

"আজ রাত্তিরেই!!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ রাত্তিরেই। আমি আর এক দণ্ড এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। যা, বিছানাপত্তর সব বেঁধে-ছেঁদে ঠিক ক'রে দে।… এই যে লক্ষ্মণও এসে গেচে তালের মাথায়।…দেখো, চাবির থোলোটা পাঠিয়ে দোব তাও মনে ছিল না!…বলি, হ্যাঁ লক্ষ্মণ…"

রান্নাঘরের আড়াল থেকে লক্ষ্মণ বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে আবার পেছিয়ে গেল খানিকটা, গলা বাড়িয়ে দেয়ালের আড়ালেই কাকে উদ্দেশ করে বললে—"ও আপনি জুতো জোড়াটা হাতে ক'রেই আসুন না, যেমন আসছিলেন; নিজের ছেলের বাড়ি, তার জন্যে আবার এত—কি যে বলে…"

নয়ান একেবারে হতবাক হয়ে ভ্রূদুটো কুঁচকে সেকেণ্ড কয়েক দাঁড়িয়ে রইল; তারপরেই বাঁ হাতে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে পেয়ারীকে সোনার দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বলল—"ধর, শিগ্গীর…"

"কি হোল?"

"শ্বশুর · দেখচিস নে?"

"শ্বশুর কি গো।···জিরেন থেকে ?"

ততক্ষণে ভিখারী দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেচে। নয়ান মাথার কাপড়টা কপালের ওপর আর একটু টেনে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে গেল; গলায় আঁচলটা জড়িয়ে প্রণাম ক'রে এগিয়ে নিয়ে এসে ওপরে উঠল।

ভূষণের বেলায় ইচ্ছে করেই সামনে আসেনি, এবার আসতে পারছে না। অভিভূত হয়ে পড়েছে। যতই চোখ মুছছে, উপচে উপচে গড়িয়ে পড়ছে জল। শ্বশুরকে ঘরে বসিয়ে পাশের ঘরটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রে সামলে নিলে নিজেকে। সোনা মেয়ে কোলে ক'রে বিমূঢ়ভাবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, আঙুলের ইশারায় ডেকে নিয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করল—"লক্ষ্মণ গেল কোথায় ?"

"কুটুমকে ডেকে আনতে পাঠ্যেচি।"

"তুই এক কাজ কর্, চাবির থোলোটা নিয়ে যা। ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ারটা খুলে নিতে বলবি পেসাদ-কাকাকে। খুলিয়ে আবার নিয়ে আয় চাবিটা, বাজারের জন্যে পয়সা-কড়ি বের করে দিতে হবে। পেসাদ-কাকাকে বলবি ভাঁড়ার বের ক'রেই যেন সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। অনেক কাজ। শ্বশুরের কথাও বলবি।"

এদিক থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় গাড়ু গামছা ঠিক করে রাখলে; তারপর আর একবার চোখ মোছামুছি সেরে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বলল—"মুখ-হাত একটু ধুয়ে নিন বাবা।"

নিজেই পা ধুয়ে চুল দিয়ে মুছিয়ে দিলে; তারপর আবার চৌকিতে বসিয়ে বাতাস করতে করতে বাড়ির কথা তুলেছে, অনঙ্গ নয়, লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রসাদ এসে উপস্থিত হোল।

চৌদ্দ

নয়ানকে নিয়ে অনঙ্গ যেদিন জিরেন ছেড়ে এল—বছর দেড়েক আগেকার কথা, সেই দিনই একটু রাত করে উদ্ধবের গাড়ি জিনিসপত্র নিয়ে জিরেনে গিয়ে পৌঁছাল। ভিখারী ভাবলে, শ্বশুর বাস উঠিয়ে চ'লে গেছে, ছেলে ফিরিয়েই নিয়ে আসবে বৌকে, আর উপায় কি ? হঠাৎ রাগের মাথায় একটা কাণ্ড ক'রে বসেছিল, যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

পরদিনই এদের ফিরে আসা উচিত, কিন্তু এল না। খেয়ালী মানুষ, রাগের ঝোঁকটা কেটে গেছে, বেহাই বাড়ির লোকের আদর-আপ্যায়নে মেজাজটা প্রফুল্ল, মন সহজেই প্রবোধ মানলে—হোক্ না দুটো দিন দেরি; আসবেই। তারপর সপ্তাহ কেটে গেল, তারপর মাস। খবরও পাওয়া গেল নূতন সংসার পাতবার মতলব করেছে ওরা। রাগটা ফিরে এল, অভিমানে নরম হয়ে। ভিখারী বলল—"তবে আর কি; যাদের জিনিস তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই।" স্ত্রী শঙ্করী অভিমানের ধার ধারে না, তাই বুদ্ধিটাও পরিষ্কার আছে, বলল—"এত তাড়া কিসের? ঐ ছেলে তোমার আলাদা সংসার পাতবে—ঐ বৌ নিয়ে? দেখো না চুপ ক'রে, রস ম'রে এল বলে, তারপর আবার সেই জিরেন।"

মাসের পর মাস, তারপর বছরও ঘুরে গেল। সংসার পাততে যে পারলে ছেলে-বৌ তাইতে ভিখারীর রাগ অভিমান দুটোই গেছে বেড়ে, বলল—"আর এলেই বা ওদের নিচ্চে কে? দিই পাঠিয়ে এবার জিনিসগুনো।"

শঙ্করীর মাথাটা আরও পরিষ্কার হয়েছে, বলল—"গাঁয়ের মোড়ল, আর ডাইনীরা কি গুণ করলে তাই, নয়তো অমন সোনার চাঁদ ছেলে আমার—অন্য জায়গায় বিয়ে দিলে ঘর আমার ভরে যেত। কি মর্য্যেদাটা করলে ওরা? এখন যদি গোবিন্দ দয়া করেচেন, হকের জিনিস আপনা থেকে ঘরে এসে উঠেচে তো ও থেকে আমি একটা জিনিসও আলাদা করতে পারব না।"

"আর ছেলে যদি নিজে চেয়ে পাঠায়; আটকে রাখতে পারবি ত্যাখন?···তার চেয়ে ··"

শঙ্করী একেবারে ঝেঁজে উঠল—"চেয়ে পাঠাগ আগে, তখন আমি দেখে নেব! ছেলে একটা, না, কুলের আংরা—তার হয়ে ওকালতি করতে এল দেখো না! · চেয়ে পাঠাবে, তার আগে আমার যা খেয়েচে পরেচে তার হিসেব দিক—অমন ছেলের সঙ্গে আর সম্বন্ধটা কি রইল যে তার আবার খাতির শুনি?···সেই জন্মে ইস্তক যা খেয়েচে পরেচে তার হিসেব বুঝিয়ে দিক আগে!···"

একবার ভালো করে মুখ ধরলে আর থামতে চায় না, কটা দিন এরই জের সামলাতে কেটে গেল। এরপর আর তুললে না কথাটা ভিখারী বা তুলতে সাহসই পেলে না। নিঝর্ঞ্ঝাট মানুষ, চোখ বুজে রইল—যেমন ছেলে থেকেও নেই, তেমনি জিনিসগুলো থেকেও যেন নেই।

আরও ছয়টা মাস কেটে গেল। এই বছর দেড়েকের মধ্যে জীবন নিজের ক্ষয়-ক্ষতির হিসাবটা চুকিয়ে নিয়ে আবার নিজের পথ ধ'রে সহজ গতিতে চলেছে, এমন সময় একদিন মৈনের রাজবাড়ী নিয়ে খবরটা শাখা-পল্লবিত হয়ে এসে পৌঁছুল জিরেনে। টগর ঘোষ-পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল সন্ধ্যা-বেলায়, সেই এসে খবরটা দিলে। বাঁশি বাজিয়ে অনঙ্গ নাকি রাজার এমন সুনজরে পড়ে গেছে যে, এখন রাজদরবারে দেওয়ানকে ছাড়িয়েও তার বোল-বোলাও; একদণ্ড কাছছাড়া করেন না রাজা, তাঁরই সঙ্গে ওঠা-বসা, তাঁরই সঙ্গে সব—আশ্চর্য নয় যদি একদিন দেখা যায় যে জমিদারির খানিকটা লিখে দিয়ে বসে আছেন।

একটু যেন হন্তদন্ত হয়েই এসে খবরটা দিলে টগর। ভিখারী গোরুর জন্যে পোয়াল কাটছিল, হাতটা থামিয়ে বলল—"তা নজরে একবার পড়ে গেলে কিছুই আশ্চর্যি নয়।"

শঙ্করী সন্ধ্যা দেওয়ার ব্যবস্থা করছিল ঘরের মধ্যে, একটা সলতে হাতে পাকাতে পাকাতেই দরজার কাছে এসে নাক সিঁটকে বলল—"ন্যাও, যা এক মহারাণীর সুনজরে পড়েচেন তারই ধকল সামলান আগে। পড়ত না কি?—একদিন না একদিন পড়তই কারুর নেক্ নজরে, তা সে অবস্থা রাখলে কামিক্ষ্যের ডাইনী?"

ঘরের দিকে ফিরে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—"তা তোর কাছে খবরটা এল কি ক'রে? সমস্ত গাঁ ঘুরে এলুম কেউ জানে না, ও এক আদাড়ে খবর নিয়ে উপস্থিত!...রাজার দেওয়ান টেলিগেরাপ করেচে নাকি ভাই-সোহাগী বোনকে?"

একটু থতমত খেয়ে টগরের মুখটা যে রাঙা হয়ে উঠল সেটা কলসীটা ঘুরিয়ে বিড়ের ওপর বসাতে বসাতে সামলে নিল, একটু চুপ করেই রইল, তারপর বলল—"টেলিগেরাপ না এলে টের পাওয়া যায় না যেন। কে না জানে গাঁয়ে? তুমি যদি এখন চোখ-কান বুজে ঘুরে বেড়াও, নইলে কে না জানে?"

কেউই জানে না তখনও। শঙ্করী চোখ-কান বুজে ঘুরে বেড়াবার মেয়ে নয়, তবু তাড়াতাড়ি গোরুর জাবনাটা দিয়ে চোখ-কান অতিরিক্ত সজাগ রেখেই সমস্ত গাঁ'টা একবার ঘুরে নিল ভিখারী—খবর যেখানে যেখানে জমে বা তৈরী হয়,—কিছুই টের পেল না।

তারপর খানিক রাত ক'রে যখন ফিরছে, গৌরাঙ্গদেবের মন্দিরের সামনে

গৌরাঙ্গপার্টির রিহার্সেলের আটচালার মধ্যে থেকে একটি ছেলে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এল ; জিগ্যেস করল—"ভিকু-কাকা শুনেচেন ?"

ভিখারীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল, দাঁড়িয়ে পড়ে যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত ভাবেই প্রশ্ন করলে—"কথাটা কি যে শুনতে হবে ?"

"নঙ্গদা জিরেনের নাম জাগিয়ে দিলে। মৈনের রাজবাড়িতে সে এখন, কি যে বলে ভালো—ডামাটিস্ মাস্টার—বাঁশি শুনে রাজা নাকি এমন খুশি হয়েচে, যাত্রা বলুন, অপেরা বলুন, ঠিয়েটার বলুন—সব নঙ্গদার চার্জে।"

আরও সাত-আট জন যারা ছিল তারাও বেরিয়ে এল। ভিখারী একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল—"এই খবর ?—আমি বলি রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে না জানি কি এক মহামারী খবর দেবে !" বৌয়ের কথাটা ধার করে বলল—"তা পেলি কোথা থেকে এমন আজগুবি খবর ? রাজা তোদের টেলিগেরাপ করেচে ?"

"ঠাট্টা নয়, ভূষণদা নিজে এয়েচে আজ বিকেলে ! দু'কোশ পথ হেঁটে এসে হা-ক্লান্ত হয়ে পড়েচে তো, এই খানিক আগে গেল। কাল বোধ হয় আপনাদের বাড়ি যাবে'খনি, সব শুনবেন। সেই যে সেদিনকে রাজা অত খাতির করে ভূষণদাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল না ?—যিদিন ঝড়টা এল—তারপর আবার রাস্তা থেকে নঙ্গদাকে তুলে নিলে—নাকি নদীর ধারে রাত দুপুরে বাঁশি বাজাচ্ছেল—ওর ঐ রকম আচে তো—ব্যস, আর বলতে আচে ?"

সব কথা শুনল ভিখারী। তার পরদিন কথাটা বেশ ছড়িয়েও গেল গাঁয়ের মধ্যে। নির্লিপ্তভাবে আড্ডায়-বৈঠকে ঘুরে ঘুরে মাঝে মাঝে তাচ্ছিল্য-ভাবে এক-আধটা মন্তব্য করে ঘুরে বেড়াল। ভূষণ অবশ্য বাড়ি বয়ে এল না, সকালে নয়, দুপুরেও নয়, নিশ্চয় সাহসের অভাব ; সন্ধ্যার খানিকটা পর্যন্ত দেখে ভিখারী নিজেই করল দেখা, ঘোষ-পুকুরের দিকে গিয়ে ঘুরতে ফিরতে হঠাৎ এক জায়গায় যেন দেখাটা হয়ে গেল—এইভাবে।

হ্যাঁ, সব ঠিক্ কথাই বৈকি। অনঙ্গের এখন্ এত বোলবোলাও যে দে'ওয়ান বাহাদুরেরও কথা চলে না তার সামনে। মনে হয় রাজা যেন কিছু একটা করবে ওখানে ওকে ভাল করে স্থিতু করবার জন্যে, কানাঘুষো শুনে এসেছে ভূষণ—এখন তো রয়েছে রাজবাড়িতেই—খাওয়া-দাওয়া দেউড়ি থেকেই—হ্যাঁ, ভূষণেরও ঐখানেই সব ব্যবস্থা বৈকি—ভূষণ তো জিরেনের ছেলে, নঙ্গদার আপন লোক বলেই জানে সবাই—পলাশবাটী থেকে একদিন

এক বোষ্টুমী এসে হাজির—সাত পুরুষের কেউ নয়, তারই যা খাতির আরম্ভ হয়ে গেল—অনঙ্গদার শ্বশুরবাড়ির লোক ব'লে—তারই হিসেব রাখে কে!…

ভিখারী আবার তাচ্ছিল্যভাবে ঠোঁট দুটো কুঁচকে নিল, বলল—"এই কথা? আমি মনে করি বুঝি শুনব মতি-গতি বদলেচে।·· বোষ্টমের ছেলে আরম্ভ করেচে রাজার তাঁবেদারি—তারই অর্থ হোল কি না জিয়েনের নাম জাগিয়ে দিয়েচে!…দিনকালটাই তো এইরকম পড়েচে; সব উল্টে গেল।"

অবহেলা ভাবেই হনহন ক'রে এগিয়ে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল, বলল—"তা তুইও তো শুনচি নাম জাগাচ্চিস গাঁয়ের, ফিরে যাচ্চিস কবে?"

এ রকম অভিমতের মুখে যে উত্তরটা আপনি জোগায় তাই দিয়ে দিল ভূষণ, বলল—"আমি!…আমি বলে চলেই এলুম রকম সকম দেখে; আবার ও-মুখো?"

ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে ভিখারী। ভূষণের মুখের খবর, একবার ভজিয়ে নেওয়া দরকার ছিল তার কাছে। আর তর সইছে না, যত এগুচ্ছে; পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠছে। ইচ্ছে করছে সোজা মৈনের পথ ধরে বেরিয়ে যায়। ছেলেকে উপলক্ষ্য করে খাতির-যশের একটা ছেলেমানুষি লোভ পেয়ে বসেছে; কোথাকার একটা বোষ্টুমী, তার আদর-অভ্যর্থনার হিসেব নেই, আর এ একেবারে বাপ গিয়ে হাজির!…রাজবাড়ি জুড়ে যে হৈ-চৈটা আরম্ভ হয়ে গেছে তাকে ঘিরে, তা যেন সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করছে ভিখারী। তর সইছে না।

কিন্তু যায় কি ক'রে?

শঙ্করীর মেজাজটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কাল টগর যখন খবরটা দিলে তখন না হয় বিশ্বাস না করলে, কিন্তু আজ সকাল থেকে তো কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা গাঁয়ে, তা একবার মুখ ফুটে ও-প্রসঙ্গই তুলল না, সমস্ত দিন একটা থমথমে ভাব, ভিখারীরও সাহস হোল না যে নিজের থেকে তোলে।

রাত্রে কিন্তু যখন ফিরল তখন আর পারলে না নিজেকে সামলে রাখতে, তাজা চোখা চোখা খবরে মনটা বোঝাই হয়ে রয়েছে, একেবারে ভূষণের নিজের মুখের খবর! তবু শঙ্করীর মনের মতো করেই তুললে কথাটা—

"হুঁঃ!…কেতাত্ত হলুম! রাজার নেক নজরে পড়েচেন—কুলের আংরা একটা ছেলে ঐ—কেতাত্ত হলুম আর কি!··চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হোল!"

শঙ্করী শব্দটি করল না, শুধু কি একটা কাজ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, গতিটা একটু দ্রুত হয়ে গেল।

আবার সাহস টেনে আনতে একটু সময় গেল, ভিখারী টগরকে বলল, এক ছিলিম তামাক সেজে দিক।

সাজা ছিলিমটা হাতে ক'রে নিজেই হেঁসেলে উঠে গেল, শঙ্করী এসে আবার রান্নায় বসেছে, বলল—"একটু আগুন বের ক'রে দে দিকিন।"

মেজাজটা ভালো নয়, একটা জলন্ত কাঠ বের ক'রে ঝেড়ে দিতে খানিকটা আগুন ভিখারীর পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। শঙ্করী কথা কইল—"লাগলো তো? টগীকে দিলেই হোত!"

লেগেছে একটু, কিন্তু ঢের বেশি সুবিধা করে দিয়েছে। ভিখারী কয়লাটা ঠেলে দিয়ে বলল—"না; লাগত, তা তুই যে সামলে নিলি!"

আগুনটা কলকেয় তুলে নিয়ে আঙুলের টোকা দিতে দিতে একবার শঙ্করীর মুখের দিকে চেয়ে নিলে, আবার আরম্ভ করলে—

"ষেদোর বেটা ভূষণো—গেছলো কি না মৈনেতে—রাজাই নে' গেছল—রাস্তা দে যাচ্চি, ডেকে বলে কিনা—গুজব নয় সত্যি; না পেত্যয় যাও, নিজেই একবার গিয়ে না হয় চক্ষু-কন্নের বিবাদ মিটিয়ে · "

শঙ্করী চেলা কাঠটা উনানে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে এমন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যে ভিখারীর হাতের কলকের আগুনটা ছিটকে পড়ল চারিদিকে—

"যাও তাহলে! গুরুঠাউর য্যাখন বলেচে, হয়েই এসো! দেখবে যে তা চোক্ষু-কন্ন আচে কি? থাকলে নাকের নিচেই কি কাণ্ডটা হ'তে চলেচে দেখে মাথা ঘুরে যেত।···তিথি করতে গিয়ে ছেলেটাকে তো জেনেশুনে ডাইনের হাতে তুলে দিয়ে এলে—এখন ঐ একটা ধুম্বো মেয়ে বাড়িতে, চারিদিকে কুনজর, কোন্‌দিন কি হতে কি হয়—চোখ-কান থাকলে কি আর হুঁশ হোত না?···ক'দিন দেখে খ্যাঁচকাচ্চি—সুতোহাটা থেকে সম্বন্ধটা এল, একবার যাও, দেখে এসো, সেখানে না হয়, মন্দিরতলার সম্বন্ধটাই—এক পাপ বিদেয় হয়েচে, আর এক পাপ বিদেয় ক'রে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি—তা সেটা যে একটা কাজের মতন কাজ—সেদিকে পা বাড়াব! · ছেলে আমার রাজ-সিংহাসনে, আমি এখন রাজপুত্তুর নে আসব না মেয়ের জন্যে!"

গোটা দুচার কয়লা তাড়াতাড়ি কোন রকমে কলকের ওপর তুলে নিয়ে ভিখারী হুঁকোটা হাতে ঝুলিয়ে বাইরে চলে গেল।

উল্টোপথে হ'লেও এত সহজে যে কার্যসিদ্ধি হবে আশা করেনি।

শঙ্করী পরের দিনই কাপড়-পিরান খারে সিদ্ধ করে দিলে; তার পরদিনই ভিখারী চালের বাতায় গোঁজা জুতোজোড়াটা নামিয়ে হাতে ঝুলিয়ে ভাইঝির জন্যে পাত্র ঠিক করতে বেরিয়ে পড়ল। সুতাহাটা মৈনের একেবারে উল্টো দিকে পড়ে। শঙ্করীর দাবড়ানিটা মনে টাটকা রয়েছে, আগে সেই দিকে পা বাড়াল ভিখারী। বাড়ি ছেড়ে ক্রোশ দু'য়েক যেতে যেতেই বাসি হয়ে এল দাবড়ানির আওয়াজ, দিক পরিবর্তন করল। একেবারে যে মৈনের দিকে তা নয়; আগে মন্দিরতলাটাই সেরে নিলে কেমন হয়?… তারপর ঐ দিকে থেমে খাড়া মৈনের দিকে মুখ ফেরাতে দেরি হোল না।

একটু ঘুর হয়ে গেল বৈকি, প্রায় ক্রোশ চারেক। বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে বেরুতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল, সেদিন আর মৈনেতে পৌঁছাতে পারল না। রাস্তায় একটা বোষ্টমের আখড়ায় রাত কাটিয়ে যখন পৌঁছাল তখন প্রায় দুপুর; দূর থেকেই কাজবাড়িটা দেখে ভিখারী এই প্রথম একবার দৃষ্টি নামিয়ে নিজের খারে কাচা পিরান আর খাটো ধুতিটার দিকে চাইল; তালিমারা তোবড়ানো জুতো জোড়াটার দিকেও, গ্রামে ঢুকেই প'রে নিয়েছে।

শুধু যে পরিচয় দিতে সাহস হোল না তাই নয়; পরিচয়টা যেন কোথায় লেখা রয়েছে, কেউ যদি জেনে যায় সেই ভয়েই গা ঢাকা দিয়ে খানিকটা বেড়ালো ভিখারী, তারপর কানে গেল, এখানকার উৎসব শেষ হতে রাজা ঢপ আর যাত্রার দলটা পলাশবাটীর আখড়ায় দিয়েছেন পাঠিয়ে, অনঙ্গর ওপর খাতির ক'রে; অনঙ্গ আজই ভোরে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে।

বাঁচল ভিখারী। একবার একটা আলেয়ার পেছনে ঘুরে ঘুরে হঠাৎ ভোর হ'য়ে গেল, কাক-কোকিল ডেকে উঠল। বেশি দিনের কথা নয়; স্বস্তিটা যেন কতকটা সেই রকম; যেন নিজের জায়গায় নিজের পরিচিত দিনমানে ফিরে আসা।

বাজারে গিয়ে একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিল—চিঁড়ে, দই, একটু গুড়। লুচি-পোলাও-মেঠাই-মণ্ডা নয় বলে যেন আরও নিজের জগতে ফিরে এল ভিখারী। প্রায় ক্রোশ দশেকের পথ জিরেন, এখন বেরুলেও পৌঁছোতে গভীর রাত হয়ে যাবে; আর দেরি করল না। মন্দিরতলা আর সুতাহাটার কাটান্ ঠিক করতে করতে এগিয়ে চলল। তারপর একটা তেমাথায় এসে দোটানায় পড়ে গেল; একটা রাস্তা সোজা জিরেনের দিকে চলে গেছে, যেটা দিয়ে এল;

আর একটা পলাশবাটী হয়ে। এতক্ষণ পলাশবাটীর কথা এক রকম ভাবেই নি বলতে গেলে, তেমাথায় দাঁড়িয়ে এই প্রথম খেয়াল হোল, কি রকম হয়? যদি দেখেই যায় পলাশবাটীটা?

হঠাৎ একটা স্নেহের জোয়ার এসে গেছে—কতদিন দেখেনি ছেলেটাকে! হয়তো রাজবাড়ি থেকে এখন বিচ্ছিন্ন বলেই এ রকমটা হোল; জোয়ার নয়তো একটা যেন কোটালের বান, তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে নয়ান-বৌও ভেসে তলিয়ে গেল।···আর, একথাও ভেবে দেখতে হয়—ছেলে না হয় অপরাধী, বাপ হয়ে সেই বা কোন্ একবার তত্ত্ব-তাবাস নিলে, একবার ফিরে আসতে বলল ঘরে ছেলেকে?

চিন্তার মধ্যেই কখন যে পলাশবাটীর পথ ধ'রে এগিয়ে এসেছে, টেরও পায়নি।

পনেরো

জোর আলাপ চলেছে, গুড়ুক টানার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রসাদ বলছে—"ও কথা শুনব কেন যে হঠাৎ খেয়াল হোল, আর বেরিয়ে পড়লুম? নিজে হতে যদি এসতেন তো অনেক আগেই পায়ের ধুলো পড়ত। এসেচেন, ঐ রাধারমণ যিনি আখড়া আগলে ব'সে আছে তানার টানে। কি রকম হুজ্জতটা এসে পড়েচে—হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই—আখড়ার যশমান সব বুঝি রসাতলে যায়, এ ধকোল সামলানো কি পেসাদের কম্ম—না, উদ্ধবের, না, ঐ এক ফোঁটা একটা ছেলের, বাঁশিতে ফুঁ দিতেই যার দম ফুরিয়ে যায়?·· সোতোরাং ডাক্ খোদ কত্তাকে—বড় পায়ের ওপর পা দিয়ে গুড়ুক টানচে নিশ্চিন্দি হয়ে···"

লক্ষ্মণ গিয়ে খবর দিয়েছে, ওদিক থেকে অর্ধেক লোক কাজ ছেড়ে এসে জড়ো হয়েছে, বারান্দার নিচে, সিঁড়িতে। একটা হাসির হররা উঠল, কত বড় দরের কথাটা পড়ল সভার মাঝে! ভিখারী মুখ নিচু করে হুঁকো টানতে টানতে মিটিমিটি হাসির সঙ্গে শুনছিল; ঝোঁকের মাথায় শঙ্করীর নির্দেশ এড়িয়ে পালিয়ে আসার যে এমন সদর্থ হবে কল্পনাও করতে পারে নি, বাঁ হাতে খোলটার ছেঁদাটুকু মুছে হুকোটা বাড়িয়ে ধ'রে বলল—"আসুন।·· কে যে টেনে

এনেচে তা কি বুঝিনে বেয়াই, খুব বুঝি। তবে কথাটা হচ্চে, সারা জীবনই তো নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়াল, এখন বুড়ো বলদ, আর কি বয় দেহ? ইচ্ছে করে চার পা মুড়ে চক্ষু বুজে শুধুই জাবর কাটি, শুধুই জাবর কাটি। শেষে কঁ্যাকালের হুড়কো য্যাখন আর সইল না এই ত্যাখন গিয়ে ধড়মড়িয়ে…"

দরের কথা, তার ওপর আবার ভঙ্গি দেখিয়ে বলা আছে, উৎকর্ণ শ্রোতার দলে আবার একটা হাসির ঢেউ উঠল।

প্রসাদ বলল—"ঐ তো দোষ, দুঃখু বোঝে না যে!"

"খুব বোঝে গো, খুব বোঝে, এ হচ্চে জেগে ঘুমনো। চিরটা কাল গাই-ধেনু চড়িয়ে বেড়ালো, কি, না—তারা দই দেবে, ননী দেবে; বলদের কাছে তো লবডঙ্কা গো! সোতোরাং তার আর খাতিরটা কিসের? দে নাক বিঁধে দড়ি পরিয়ে, লাঙ্গল বওয়া, ঘানি টানা…"

কোথায় গিয়ে যে কথাগুলো সুড়সুড়ি দিলে, হাসি গড়িয়েই চলল, কথার ওপর কথা এসে পড়ছে, জমে উঠছে আলাপ। 'প্রসাদ হুঁকোটা এগিয়ে ধরেছিল, উদ্ধব হাতটা বাড়িয়ে বলল—"ইদিকে একবার। পেসাদ পেতে হবে তো, কৃপা ক'রে বাড়ি বয়ে এয়েচেন…"

প্রসাস হুঁকোটা ধরেই একবার গলাটা তুলে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাইল। বলল—"পেসাদ—তা, হ্যাঁ, পেসাদ চাই বৈকি। তাহলে, ও লক্ষ্মণ, গেলে কোথায়?—ব্যবস্থা করো, কত্তার পেসাদ সে তো যদুর ঐ ন্যাংটা বাচ্চাটা পজ্জন্ত চাইবে, একটা হুঁকোয় কুলুবে কেন?"

হাসির আলোড়নের মধ্যে যদুর ছেলেটা দু'হাতে নিজের উলঙ্গতা নিবারণের প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। বেড়েই গেল হাসিটা, তারই মধ্যে ভিখারী হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়ল, বলল—"কিন্তু তার আর সময় কোথায়? একবার দেখে আসি ওদিকটা। নইলে বলবে—দেখো, ব্যাটাকে অত করে টেনে নিয়ে এলুম, এখনও সেই গড়িমসি।"

"কিন্তু পায়ের ব্যথা মরে নি যে এখনও, ও বেয়াই!"

"কিন্তু ন্যাজের ব্যথাটাও যে রয়েচে…"

হাসির মধ্যেই দোরের আড়ালে নয়ানের চাপা উৎকণ্ঠিত গলা শোনা গেল—"বাঃ, ও পেসাদ-কাকা, একটু জল-টল খেয়ে যাবেন যে! লক্ষ্মণকে পাঠিয়েচি, এলো বলে।…ও সোনা—যা, বেরিয়ে বল্!"

ভিখারী একটু দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল—"ও বেয়াই, ও এ কী রহস্য আরম্ভ

করলে রাধারমণ! নিজে টানবে সামনে, আর একজনকে লাগিয়ে দিয়েচে পেছু ডাকতে!...তা আসচি রে বেটী, আসচি এক্ষুনি, ভয় নেই। আমি হচ্চি সেই পাঠশালা-পালানো পোড়ো: 'ভিখারী মণ্ডল! না, উপোস্থিত!'—তারপরেই চুপিসাড়ে পগার পার!... মায়ের হাতের ক্ষীর-ননী শুধু ওর কাছেই মিষ্টি নাকি?...এই এলুম ব'লে পালিয়ে।...চলো বেয়াই, এগোও।"

একটা টুসকি দিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

কাজ চলছিল, কিন্তু যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তাইতেই, এই সব ক্ষেত্রে যেমন হওয়া স্বাভাবিক, আস্তে আস্তে শৃঙ্খলার চেয়ে বিশৃঙ্খলাই উঠছিল মাথা চাড়া দিয়ে। থাকবার ব্যবস্থা নেই, তারপর রান্নাও যে কখন্ হবে তার কোন স্থিরতা নেই, যাত্রা, ঢপ,—ছুটো দলই আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। তোয়ের ব্যবস্থায় যে ওরা খুব অভ্যস্থ এমন নয়, কতকটা যাযাবর জীবনই তো, তবু এ যেন বাড়াবাড়ি। আর, ওদের না রাজা পাঠিয়েছে? কারুর বায়না নিয়ে তো আসা নয়; তা, এই খাতির?

কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল, ফিরে যাবে। প্রসাদ যেন থৈ পাচ্ছিল না, একদিক সামলাতে যায় তো অন্যদিকটা বেসামাল হয়ে পড়ে। লক্ষ্মণ যখন ভিখারীর খবর দিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে এল, ও যেন পালিয়ে বাঁচল।

বিশৃঙ্খলাটা বেড়েই গেল; আরও অনেকেই তো এদিকে ভেঙে পড়েছে, তার মধ্যে কাজের লোকও রয়েছে। ওরা যখন আবার ফিরল তখন যাত্রার দলে বেশ একটা থমথমে ভাব।

ভিখারীর অতটা বোঝবার কথা নয়, একে ধরতেই পারে না সূক্ষ্ম ব্যাপার-গুলো, তবে প্রসাদ করছে অনুভব; তারপর ভিখারীর জন্যই ব্যাপারটুকুর একেবারে সামনাসামনি হয়ে পড়তে হোল—

প্রসাদকে পাশে করে দলটার সঙ্গে আখড়ার এখানে ওখানে মুরুব্বিয়ানা করতে করতে খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে ভিখারী বলল—"আয়োজন তো দেখচি সব ঠিকই আচে, দলের এরা সব এসেও গেচে, তা অধিকারী কই? তানাকেই যে দেখি না..."

প্রসাদের মুখটা একটু শুকিয়ে গেল, এ গণ্ডগোলে সে যে কি মেজাজ নিয়ে আছে আন্দাজই করা যায়, তবু হেসেই বলল—"কোন্ অধিকারীকে দরকার আগে তা বলুন, ঢপের দলের না যাত্রার?"

আবার একটা হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল—"গ্যাও, সেকথা না কি আবার জিগোয়!—একহাতে আমার রায়গঞ্জের হাটের শুকনো খটখটে ছোলার চাকতি, অন্য হাতে বর্দ্ধমানের সীতাভোগ—বেয়াই তুমি কোন্‌টা নেবে?"

হাসির ওপর হাসি ভেঙে পড়ল। হাসির মধ্যে ভিখারীর কথাটাকে চাপা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল প্রসাদের, অধিকারীকে দেখাও যাচ্ছে না; একটা ছেলে বলল—"তিনি তো ঠাকুরবাড়ির পেছনে গাছতলায় বসে রয়েচে—আরও ক'জন।·· এই ইদিক পানে।"

পথ দেখিয়ে এগিয়ে গেল।

ভিখারীর অধিকারীর খোঁজ সেই মন্দিরতলার কথা মনে ক'রে। গাব গাছ তলার গোড়া ঘিরে একটা শান-বাঁধানো চাতাল। তার ওপর জন ছয়-সাত বয়স্থ লোক বসে আছে, নিশ্চয় কিছু গুরুতর আলোচনাই হচ্ছিল, এরা এসে পড়তে থেমে গেছে; হঠাৎ নিরস্ত হওয়ায় একটা যেন আড়ষ্ট ভাব।

কাঁচা পাকা চুলে বাবরি, তামাটে মোটা গোঁফ আর ঘুণধরা চেহারা দেখেই অধিকারীকে ওর মধ্যে চিনে নিতে দেরি হয় না। ভিখারী খুব ঘটা ক'রে দুটো হাত কপালে তুলে বলল—"এই যে, যাঁকে খুঁজছিলুম এতক্ষণ; পাতঃ-পেন্নাম। তা—ইয়ে—রাস্তায় কোন কেলেশ হয়নি তো?"

একটু দেরি হোলই, তারপর অধিকারী মুখটা তুলে অপ্রসন্নতা ঢাকবার কোন চেষ্টা না ক'রেই নিজের দলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উত্তর করল—"খোঁজ নেবার তা হলে লোক আচে এখানে?—আশ্বস্ত হলুম।··· রাস্তা তো ক্লেশের জায়গাই—আরামের জায়গায় এসে যে মারা পড়তে বসেচি; এমন জানলে যে রাস্তা থেকেই ফিরে যেতুম।—কোথায় থাকব—কি করব—গাছতলা তো রাস্তার ধারেও ছেল মশায়।"

ভিখারী একটুও দমল না, বরং মুরুব্বিয়ানার একটা সুযোগ পেয়ে যেন ভেতরে ভেতরে খুশিই হয়ে উঠল, একবার নিজের দলের দিকে অনির্দিষ্ট ভাবে চেয়ে নিয়ে বলে উঠল—"সে কি কথা!···আমার আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল, তা অধিকারী মশায়ের পজ্জন্ত একটু তত্ত্বতাবাস নেওয়ার হুঁশ হয়নি কারুর! একটু যে···আর কিছু না হোক···"

কি কথাটা বসানো যায়, হাতড়াচ্ছিল, হঠাৎ চমৎকার জুগিয়ে গেল; লক্ষ্মণ হাতে গোটাচায়েক গ্যাড়া আর কড়ি বাঁধা হুঁকো নিয়ে ঠাকুরবাড়ির দিক

থেকে ওদিক পানে এগিয়ে যাচ্ছিল, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নজর পড়ে যাওয়ায় ভিখারী কথাটার ওপর বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল—"আর কিছু নয়—একটু যে তামুক পজ্জন্ত সেজে দেবে ··এই যে গো ইদিকে! আবার চললে কোথায়?"

লক্ষ্মণ ঘুরে দেখে বলল—"আগুনটুকু দিয়ে আনি ছিলিমগুলোয়!"

"তা···শিগগীর একটু!" খুব ব্যস্ত হ'য়ে প্রসাদের দিকে চেয়ে বলল—"আর বেয়াই, আপনি ততক্ষণ—কি যে বলে—"

কথা না জোগাক্ অধিকারীই সামলে দিলে। পেশাদারী, তায় রাজার পেয়ারের লোকের ঘরে গাওনা, তাকে আবার সব দিক বজায় রেখে চলতে হয়। তা ভিন্ন আরম্ভও তো হয়ে গেছে; ভাবটা বদলে নিয়ে বলল—"যাক, আপনি অত ব্যস্ত হবেন না—এসে গেছেন যখন—কাজ অবিশ্যি এগুচ্ছিলই, তবে কি না—হঠাৎ কুমারবাহাদুরের হুকুম—আতান্তর তো, বুঝি না আর—বুঝি—তবু ··"

"আমিও যে সেইখেনে আটকে গেলুম কিনা। কোন মতেই ছাড়বেন না—অনঙ্গটা চলে আসতে মনটা আবার ভার ভার দেখলুম তো—তাই আমিও আর···অবিশ্যি বুঝছি বেয়াইরা একলা পড়ে গেচেন—তবুও আবার জিদ করে চলে আসা · রাজারাজড়ার ব্যাপারই তো ··"

লক্ষ্মণ এসে 'জাত্যাংশের' কথা জিগ্যেস ক'রে ক'রে হুঁকো চারটে হাতে হাতে তুলে দিল; একটা ভিখারীর হাতেও; বলল—"দিদিমণি জিগ্যেস করলেন, কেউ কি আবার চান করে নেবেন? নইলে একটু জল খেয়ে নিতে হবে—পাকের তো একটু দেরি হবেই···"

প্রসাদের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল—"মেয়ে এসে গেল ভাঁড়ারে? ···ওর শরীরটা আবার তেমন জুৎ ছেল না। যাই দেখি তো।"

দেখতে দেখতে একটা সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে গেল। সব জিনিস কি হাতে হাতে জোগানো যায়? একটু গুছিয়ে জিগ্যেস করা, একটু সময় নেওয়া, আস্তে আস্তে সামলে নিল নয়ান। নাইবার নাম করতেই অনেকে চাইল নাইতে—এতটা পথ, এই গরম, না নেয়ে কখনও যায় থাকা! নয়ান সময় পেলে বাজারে লোক ছুটিয়ে কিছু আনিয়ে নেবার।

চারটে ধুঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে হাস্য-পরিহাসে আলাপ যখন জমে উঠেছে, স্নানের জন্য তেল এসে পৌছাল। প্রসাদই নিয়ে এসেছে; সঙ্গে সঙ্গে

নয়ানের খানিকটা বুদ্ধিও। কলকেগুলো ঢেলে সেজে নিয়ে আসতে দুটো ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে সময়টা আরও বাড়িয়ে দিলে; ততক্ষণ তেল মাখা চলুক না।

. উদ্ধব এসে বলল—"একবার পাকের দিকে এসতে হয় যে।"

প্রসাদকেই বলল। প্রসাদ উঠতেই যাচ্ছিল, কি ভেবে আবার বসে পড়ে হাত দুটো ভিখারীর দিকে বাড়িয়ে বলল—"আমায় কেন আর? যজ্ঞেশ্বর হরি য্যাখন এসেই গেছেন···"

ভিখারী বলল—"অন্নপুন্নো-মা নিজেই য্যাখন ভাঁড়ারে ত্যাখন আর আমায় টানা কেন? দিব্যি অধিকারী মশাইয়ের সঙ্গে···"

প্রসাদ উঠে পড়ল, বলল—"তা কি হয়? যেতেই হবে একবার। গিয়ে একবার দাঁড়ালেও যে···"

অধিকারীও একটু জোর দিল, দেখে এলই তো অবস্থাটা এতক্ষণ। ঘাঘি লোক, একটু খোঁচাও দিয়ে নিল, বলল—"যানই একটু না হয়। অন্নপূর্ণার ভরসা তো শুধু আপন-ভোলা শিব আর এক রাশ ভূত-প্রেত···"

হো হো ক'রে হেসে উঠল, এরা সবাইও প্রাণ খুলে জোগ দিল, সূক্ষ্ম রসিকতা বোঝবার বালাই নাই থাক্, হাসির ওপর হাসি তো আসেই।

যেখানে রান্নার ব্যবস্থা তার কাছাকাছি এসে প্রসাদ গলাটা খাটো ক'রে নিয়ে বলল—"বেয়াইকে একটু মতলব করেই টেনে নিয়ে এলুম। পাকের দিকে দেখতে হবে না, যেমনটি বললেন অন্নপুন্নোই হাতে করে নিয়েচেন, তবু কে কে থাকবে ঠিক করে দিয়ে আমি আসচি, আপনি ইদিকটা তো সামলে দিলেন, এখন ওদিকটা একবার···"

ভিখারী একটু গম্ভীর হয়ে বলল—"আবার কোনদিকটা বেয়াই? বুঝিচি—পাকের দিকটায় বুঝি ভাগীদার চান না?"

দল একটা ঘুরছেই সঙ্গে সঙ্গে, আবার একটা হাসির গমক উঠল।

প্রসাদ আর একটু গলা চেপে নিয়ে বলল—"পাকের চেয়ে ঢের ভাল কাজ বেয়াই, আপনিই আর ভাগীদার চাইবেন না। শিউড়ির পদ্মমণি এসেচে, এই অবস্থাই তো, গিয়ে একটু মানভঞ্জন না করলে চলে?"

লোভনীয় বৈকি। তবু একটু আপত্তির অভিনয় করতে হয় না? ভিখারী চোখ দুটো বড় বড় ক'রে নিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে সবার দিকে একবার দেখে নিলে, বলল—"বিচেরটা দেখো একবার বেয়াইয়ের তোমরা! নিজে রইলেন

অন্নপুন্নোর তদারকে, আমায় পাঠাচ্চেন কিনা ঢপউলী পদ্মমণির পায়ে ধরতে··· বেয়াই, যাও মানভঞ্জন করোগে।···তা চলো, কোন্ দিকে তিনি ?"

হাসিতে উচ্ছল দলটা এগিয়ে পথ দেখিয়ে চলল।

পদ্মমণির ওখানে মণি-কাঞ্চন যোগ।

চালাটা যে তোলা হচ্ছে তা থেকেও বেশ খানিকটা ওদিকে, গোয়াল ঘরটার আড়ালে বকুলতলা থেকে পালা গানের কলি আর আঁখর ভেসে আসছে—মানভঞ্জন নয়, মাথুর, চাপা গলাতেই হচ্ছে গান—

কঠোর অতি কহত দূতী
মথুরাপুর রায়ে
তুঁহু যে খল লিখিলি নাম
তাহারি দু'টি পায়ে—

বলি মনে নেই ?···তুমি যে বুকে ধরে তার দুটি পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলে—ও রাই, তব দাস তব দাস বলে দাসখৎ লিখে দিয়েছিলে—যে হাতে আজ রাজদণ্ড সেই হাতে গো—বৃন্দাদূতী অতি কঠোর ভাষে বলচে—সে যে রাজাধিরাজ রাই-রাজার প্রজা—সে অন্য রাজায় মানবে কেন ?··· কঠোর অতি কহত দূতী

ভিখারী দলশুদ্ধ গোয়ালের এদিকে দাঁড়িয়ে পডল, কতকটা স্বাভাবিক একটা দ্বিধায়, কতকঠা আবার গানটায় যাতে বাধা না পড়ে সেজন্যও, তারপর কৌতূহল বশেই অগ্রসর হোল।

ওদিককার মতো রাগ-অভিমানের কোন বালাই-ই নেই। বকুলতলায় ঘাসের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে গায়িকাকে ঘিরে-ঘুরে জন পাঁচেক স্ত্রীলোক বসেছে, ওরই মধ্যে সাজগোজে একটু বিশিষ্ট; চারিদিকে দাঁড়িয়েও গাঁয়ের কয়েকজন। এরা হঠাৎ গিয়ে পড়তে সবাই একটু জড়সড় হয়ে পড়ল।

ভিখারী দুটো হাত কপালে তুলে বলল—"জয় রাধে! থেমে যাবে জানলে যে আসতুম না!"

পাঁচ জনেই উঠে দাঁড়িয়েছে, "জয় রাধে" বলে কপালে হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করল। যে গাইছিল সেই আগে কথা কইল—

"আসবেন না জানলে আমরাই কি গান ধরতুম গোসাঁই? সে গানের মূল্যই বা কি ?"

মিষ্টি ক'রে হেসে কথাটা বলে প্রসাদের দিকে চেয়ে বলল—"নতুন কার

পায়ের ধুলো পড়ল পেসাদ'দা? অথচ যেন কোথায় দেখেচি-দেখেচিও মনে হচ্চে।"

প্রসাদ বলল—"বেয়াই যে! এই দেখো, একবার দেখলে যায় ভোলা?—এই এসে পড়লেন জিরেন থেকে।"

"কি সৈভাগ্যি, ওমা কি সৈভাগ্যি! আমাদের বেয়াই! তাই তো বলি, দেখেচি যে—অবধারিত দেখেচি···"

ভিখারী হেসে নিজের নামের অর্থ ক'রে একটা পুরনো রসিকতা ক'রে বলল—"পথের ভিকিরী তাকে অত মনে থাকবার কথাও তো নয়; আমি কিন্তু সেই একবার কোথায় দেখেছিলুম—ইদিককার কোন্ আসরে···"

প্রসাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল—"তা একবারই হোক, আধবারই হোক—শিউড়ির পদ্মমণি, তাঁকে কি আর ভোলা যায়?"

হো হো ক'রে একটা হাসি উঠল। গান শুনেই ভিখারী আন্দাজটা করেছে, আসলে কিন্তু গাইছিল বিন্দু। বেশ একটা হাসি উঠল, বিন্দু একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, ওর সামনেই দাঁড়িয়ে পদ্মমণি, সে হেসেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল। পেছন থেকে সেই রসিক লোকটি বলল—"একি হোল! বেয়াই অমন পাকা জহুরী হয়েও মণি চিনতে ভুল করলেন?"

বিন্দু একটু লজ্জিতভাবেই বলল—"পদ্মমণি এই আপনার সামনে বেয়াই ·· অবিশ্যি মণির জলুসে যদি চোখ ঝলসে গিয়ে থাকে···তা হলেও কাঁচকে মণি বলে ভুল করবেন এই বা কেমন কথা!"

ভিখারী কাটান খুঁজছিল, কিন্তু আপাততঃ হাসিতেই যোগ দেওয়া ভিন্ন বোধ হয় কিছু জোগাচ্ছিল না, বিন্দুই উদ্ধার করল, বলল—"তা বসুন বেয়াই, এসেচেন যখন দয়া ক'রে···"

পদ্মমণির দিকে চেয়ে জিগ্যেস করল—"কি বলব ভাই?—পদ্মমণির কুটীরে?"

সেই রসিক লোকটির কণ্ঠ পেছন থেকে ভেসে এল—"বালাই, কুটীর কেন? বলো কুঞ্জে—এমন বকুল কুঞ্জ!"

পদ্মমণি কথা কইল, বলল—"তাহলে দেখা যাচ্চে আপনার মাথুর গাওয়ার দমক আছে ভাই। মথুরার রাজাকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে হয়েচে।"

পেছন থেকে আবার সেই রসিক কণ্ঠ—

"একেবারে অন্ধ হয়ে—কে রাই, কে বৃন্দেসখী জ্ঞানগম্যি নেই!'

হাসির মধ্যে বিন্দু ডেকে ডেকে বসাল সবাইকে—"বসুন বেয়াই, এসেচেন যখন।…পেসাদদা বোস,…উদ্ধব ভাই…তোমরাও বোস গো…"

পদ্মমণি প্রথমটা তত ধরতে পারেনি। বড় মেজ ছোট—নানারকম আসর-ঘোরা মেয়ে—একটু পরিচয় হতেই লোকটা যে কি দরের তা অনেকখানি বুঝে নিয়েছে। বেয়াই বেয়াই করে খাতির করছে সবাই, একটু-আধটু যোগ দিয়ে যাচ্ছিল, তবে ঠিক আসল দেওয়া যাকে বলে তা নয়। গানের লোভেই বসা, বিন্দুও তাই জন্যে বসিয়েছে ; কিন্তু কাটান্ দিয়ে গেল—গলার জুৎ নেই—কুমারবাহাদুরের কথা ঠেলতে না পেরে এসেছে, নইলে আসবার মতোই অবস্থা নয়—একরাশ পেশাদারী বায়নাক্কা জুড়ে দিলে। ভাবটা -খেলো হতে যায় কেন ? তারপর কথাবার্তা আর একটু এগুতে যখন টের পেলে বেয়াই অর্থে অনঙ্গের বাপ, তখন আবার অন্যরকম হয়ে পড়ল।

অবশ্য ধীরে ধীরে। উচ্ছ্বসিত হওয়াও যে খেলো হওয়া সে কথা পদ্মমণি আর জানবে না ?

অন্তরের প্রশংসাটা র'য়ে র'য়ে বের করতে লাগল, যখন নাকি নেহাতই আর চাপা যায় না। প্রথমটা দৃষ্টিতে ফুটে ফুটে উঠতে লাগল ; কয়েকবারই ফিরে ফিরে দেখল—অনঙ্গের আলোচনাই এসে পড়েছিল এই সময়টা, একবার জিগ্যেস ক'রে বসল—"তা তালিমটা পেলেন কার কাছে উনি ? তাঁর যে পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে।"

ঘুরিয়েই বলল কথাটা।

সেবার মন্দিরতলায় ঠিক এই জিনিসেরই একবার মহলা হয়ে গেছে, ভিখারী নিজের মুখে আর কেন বলতে যায় ? একটু হেসে প্রসাদের দিকে চাইল। প্রসাদ বলল—"এ হোল ওঁদের ঘরানা জিনিস, বাইরের লোক পাবে কোথায় যে এসে তালিম দেবে ?"

পা দুটো যে একটু নড়ে উঠল ভিখারীর সেটা অবশ্য কেউ টের পেল না। অবশ্য পদ্মমণিও ধূলার জন্য হাত বাড়াল না। মৌন প্রশংসার দৃষ্টিতে একটুখানি চেয়ে থেকে শুধু বলল—"আশ্চয্যি, সত্যি আশ্চয্যি গোসাঁই ! বাঁশি তো অনেক শুনেচি · "

"কিন্তু তালিম আর পুরো নিলে কোথায় ?"—ভিখারী একবার লঘু দৃষ্টিতে সবার দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"আধাখ্যাচড়া ক'রে তো এই এখানে-ওখানে প্যালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চে।…তা সে' যাক্, বাকিটুকু না হয় আমার সঙ্গেই

চিতেয় উঠবে; করি কি? কিন্তু হ্যাঁ বেয়াই, আমি কোথায় তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম—শিউড়ির পদ্মমণি এয়েচেন·· আমাদের ইনিও অমন কেত্তনটা ধরেছিলেন, থেমে গেলেন, তা আমায় কি শুধু কোথায় নিজের সুখ্যেত্তির ঢাক পিটুচ্চে তাই শোনাতে নিয়ে এলেন?"

বিন্দুকে শেষ করতে হোল গানটা। পদ্মমণিকে তবুও বোধ হয় একটু ধস্তাধস্তি করতে হোল নিজের পেশাদারী মর্যাদার সঙ্গে, তারপর নিমরাজী গোছের হয়ে এসেছে, এমন সময় বড় একটি থালায় খুরিতে সাজিয়ে জলযোগের ব্যবস্থা এসে পৌছাল ভালো রকমই; মিষ্টি, কিছু কাটা ফলমূল, একটা পেতলের ডিবেয় পান।···নয়ান সময় পেয়ে গেছে।

গোয়ালঘরের আড়াল থেকে ওরা যখন বেরিয়ে এল, দেখে কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। প্রসাদ একটু অনুযোগই করল নয়ানের কাছে—"তা হ্যাঁ গা, ডেকে পাঠায় লোকে একটু, আম্মো দিব্যি তোর শ্বশুরের পাল্লায় প'ড়ে সব ভুলে ব'সে আচি!—ভীষণ মজলিসি মানুষ যে!"

গোসাঁইঠাকুর গাঁয়ে ছিলেন না। বাড়িতে লোক বসিয়ে রাখিয়েছিল নয়ান, সন্ধ্যার খানিকটা আগে এলেন। তখন আখড়া গমগম করছে।

ঠাকুরঘরের সামনে জোড়া বকুলের পাশেই আখড়ার চাঁদোয়াটা টাঙানো হয়ে গেছে, এখন চলেছে সাজানোর কাজ। আজ রাতে একটাও হতে পারবে কি না ঠিক ছিল না; এখন দুটোই হবে। সন্ধ্যার একটু পরে রাধারমণের আরতিটা হয়ে গেলেই শুরু হবে পদ্মমণির কীর্তন; ওটা শেষ হলে যাত্রা; সমস্ত রাতের ব্যবস্থা।

অনঙ্গকে আর একবারও দেখা যায় নি। কারণটা বুঝছে নয়ান; কারণ হচ্ছে ভিখারী। তবুও তল্লাস করিয়েছিল কয়েকবার; অনবসর কর্মব্যস্ততার মধ্যে এক একবার মনের কোথায় একটা কাঁটা খচ খচ ক'রে বিঁধছিল।···না খেয়েই রইল নাকি?

সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের শরীরও এলিয়ে পড়েছে। যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়ে গ্যাসের আলো জ্বালা হচ্ছে, সোনাকে ডেকে বলল—"বাসা থেকে একটু হয়ে আসি; তোদের কুটুমকেও আর একবার দেখ্ না, যদি পাস্।"

এসে দেখে অন্ধকারপ্রায় ঘরে পা মুড়ে চুপ করে বসে আছে, হাতে বাঁশিটা ঝুলছে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল—"কোথায় ছিলে সমস্ত দিন, চারিদিকে খোঁজ নিয়েও ·"

অনঙ্গ একটু ঝেঁজেই উঠল—"ঘরেই তো রয়েচি চোপোর দিন? তুই যদি এখন ঘর বাদ দিয়ে সারা দুনিয়া উটকে বেড়াস!"

নয়ান খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল—"সমস্ত দিনে বাবার সঙ্গে দেখা করে একটা পেন্নামও তো করতে হয়···"

"তা করব না? বাবাই তো,·· তা সেও তো ঘর ছেড়ে উদিকে ফকর-দালালিতে লেগে গেল। পেন্নামটা করি কাকে তা বল্ আমায়।"

আজকের পরিপূর্ণতায় এইটুকুরই ছিল অভাব, তাও মিটে যাওয়ায় নয়ানের হাসিটা যেন আরও প্রগলভ হয়ে উঠছিল, বলল—"বেশ তো, বোস, ডেকে এসেচি তাঁকে, এলেন ব'লে ··"

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, বলল—"আর ব'সলে চলে? সমস্ত দিন দেখা হয়নি উদিকে কি হচ্চে না হচ্চে। বাবা তো পালাচ্চে না।···থাকবে কদিন?"

"ওগো বোস, ডাকি নি—আসবেনও না,—থাকতে চান, না হয় পষ্টই বলে দেওয়া হবে পথ দেখুন নিজের···"

ওর হাতটা চেপে ধরেই হাসিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

ষোল

চারটে দিন কেটে গেল; কোথা দিয়ে কেটে গেল কেউ যেন টেরও পেলে না। যার মনে যেখানে একটু চিড় খেয়ে গিয়েছিল, অবিরাম উৎসবের চাপে সব ঠিক হয়ে গেল। নিজের দিকে চাইবার সময় পেলে তবে তো নিজেকে নিয়ে ভাবনা; সে সময় কোথায়?

পঞ্চম দিন উৎসবের ক্লান্তিতেই নিজের দিকে চাইবার একটু অবসর হয়েছে, বিশেষ করে তার যে সব চেয়ে বেশি ক্লান্তি।

কাল যাত্রা শেষ হোল একেবারে কাক-কোকিল ডাকিয়ে। বেশ বেলা হয়ে গেছে, তখনও কিন্তু সমস্ত আখড়াটা নিষুপ্ত। ঘুম ভেঙে গিয়ে নয়ান বাইরে এসে দাওয়ার সিঁড়িটাতে আলুথালু হয়ে বসল। আজ আবার অপেরা

পার্টিটা আসবে বিকেলে, যাত্রা পার্টিটাকে খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় করতে হবে। নতুন হাঙ্গামের চিন্তায় শরীর যেন আরও পড়েছে এলিয়ে।

কাল ছিল অভিমন্যু বধ। বধের যত কাছাকাছি, পালাটাকে ততই ইনিয়ে-বিনিয়ে টেনে টেনে নিয়ে গেছে, মনটা হা-হুতাশে ভরে দিয়েছিল। এখন এই নিস্তব্ধ প্রভাতে মনটা আরও যেন বেশী ক'রে হু-হু করছে। সমস্ত আখড়াটারই যেখানে যেখানে নজর যাচ্ছে, শিথিল আলুথালু ভঙ্গিতে শুয়ে আছে লোকে; চাঁদোয়াটার নিচেই বেশি, তার বেশির ভাগই আবার যাত্রার দলের ছেলেরা, দু'একজন সাজও ভালো ক'রে খোলে নি। কালকের চেয়ে মনটা আজ আরও বেশি ক'রে হু-হু করছে। পালার শেষে সুভদ্রা আর উত্তরার বিলাপ আর জুড়িদের সকরুণ গীত আরও মর্মঘাতী হাহাকার নিয়ে এই শ্মশানে যেন দোল খেয়ে বেড়াচ্ছে।

তারপর এই কান্নাই কখন্ অলক্ষিতে মুখ ফিরিয়ে নিজের অন্তরে প্রবেশ করল; এই রকমই একটি শ্মশান, সর্বহারা হাহাকার; কী হোল আজ পর্যন্ত? কাল প্রভাত থেকে আবার কি হবে আরম্ভ?···আখড়াটা যেন আজ নূতন হয়ে ফুটে উঠছে চোখের সামনে। আজ পর্যন্ত যে জীবনটা নয়ানের, তা এর প্রতিটি গাছ, প্রতিটি লতাকুঞ্জের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—সমস্ত জীবনটাই যেন লতা হয়ে পত্রে-পুষ্পে, শাখা-তন্তুতে এই মহীরুহকে নিরবশেষ-ভাবে আবরণ করে রেখেছে।···কী যে মনে হচ্ছে স্পষ্ট ধারণায় বোঝা যায় না; তবে চোখ দু'টি জলে ভরে এল।

চুপ ক'রে চেয়ে বসে রইল নয়ান, শুধু দেখে যাওয়া নিয়ে; ভাবনার ক্লান্তি-টাকে পরিহার ক'রে।

ভাবনা কিন্তু ঠেলে আসছে—; কী ক'রে ছেড়ে যাবে এই আখড়াটা?

আশ্চর্য! আজ পর্যন্ত এত পরিকল্পনা আর সংকল্প, কিন্তু প্রশ্নটা এভাবে তো মনে হয়নি। ছেড়ে যাবে কি ক'রে?

আর ছেড়ে যাবে—তা ও বা কোথায়? দু'টো জায়গায়ই পাশাপাশি ভেসে উঠছে, আবার যাচ্ছে ডুবে—এই পলাশবাটির প্রাঙ্গন, বাল্য-কৈশোর আর নূতন যৌবনের স্বপ্নে ঘেরা; তারপর এই দেড় বছর ধরে নিজের অন্তরের দরদ দিয়ে রচা—এর রাধারমণ, এর গোসাঁই-দাদু, লক্ষ্মণ, সোনা, পেয়ারী, প্রসাদ-উদ্ধবের দল, এর অবারিত মুক্তি; তার পাশেই জিরেনের সেই সংকীর্ণ সঙ্কুচিত গৃহস্থালি, শাশুড়ী-ননদের ঈর্ষা-সন্দেহ, সেই সংকুচিত জীবন।···ননদও বৈকি;

বেশ লাগত অবশ্য টগরকে, অন্ধকারে ঐ যেন একটি আলো, কিন্তু ঐ আলোই তো আবার বিদায়ের পথ ধরিয়ে দিলে।

ভাববে না, তবুও ভাবনা আসছে ঠেলে।

না, যাবে না পলাশবাটী ছেড়ে, যেতে পারবে না। এখন পর্যন্ত ভিখারীর সঙ্গে এক বাড়ির খবর ছাড়া কোন কথা হয়নি, কেন এসেছে, কি উদ্দেশ্যে, কিছুই জানে না নয়ান। নিতে আসা—এই দেড় বছর পরে—হঠাৎ এমন কি হোতে পারে? যদি টগরের বিয়ের ব্যাপার হোত তো এসেই বলত। ঐ এক টগরের বিয়ে হলেই যেতে পারে—যেতে পারে বৈকি, টগরের বিয়ে! কিন্তু থাকবার জন্যে নয়।···কোথা থেকে যেন একটা আত্ম-বিশ্বাসও এসেছে - বোধ হয় স্বাধীনভাবে এদিকে এত কাজ করে ফেলার জন্যেই—আর এই দেড়টা বছর গেল, ঠিক সেই নব-বধূটিও তো নয়। বলবে—বিশ্বাস হচ্ছে ভালোভাবেই বুঝিয়ে বলতে পারবে শ্বশুরকে—আখড়াটা, এত বড় একটা সম্পত্তি, ওদেরই তো এখন, এটা নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক কি? না হয় সবাই এখানেই আসুন না চলে।

সম্ভব-অসম্ভব সব রকম যুক্তি ঠেলে উঠছে মনে—সবই কিন্তু ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ঐ একটি সিদ্ধান্তে; না, পলাশবাটী ছেড়ে যাওয়া হবে না। শ্মশানের সমস্ত কারুণ্য নিয়ে পলাশবাটী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও গেলে এই রকম হয়ে যাবে; আরও শ্মশান; দেড় বছর আগে এসে কি দেখেছিলো?

সংকল্পের দৃঢ়তায়ই চোখের জল এসেছে শুকিয়ে, তবুও একবার ভালো ক'রে চোখ দুটো মুছে নিলে; সেটাও যেন দৃঢ়তারই একটা অঙ্গ; তারপর নব-সংকল্পের অধৈর্যতায় একটা হঠকারিতা ক'রে বসতে যাচ্ছিল—ডেকে নয়, এটা-ওটা নাড়ার শব্দ ক'রে ভিখারীর ঘুম ভাঙাবে, তারপর আকারে-ইঙ্গিতে আসার কারণটা জেনে নিয়ে সুযোগ পেলে তুলবে কথাটা···

এমন সময় হঠাৎ একটা দৃশ্যে প্রস্তরবৎ স্থাণু হয়ে পড়তে হোল নয়ানকে—

এতক্ষণ একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে আসছিল, অতটা খেয়াল ক'রে নি, সেইটেই সরে গিয়ে যেন অন্য মূর্তি নিয়ে উঠল—পরিধি দেয়ালটার বাইরে বাঁশের আগল থেকে হাত কয়েক এগিয়ে আরোহীশুদ্ধ একটা শাদা ধবধবে ঘোড়া দুলতে দুলতে পড়ল দাঁড়িয়ে।

আরোহীর পোশাক আগাগোড়া সাহেবী। সাহেবরা যে-পোশাক প'রে ঘোড়ায় চড়ে,—হাঁটু পর্যন্ত বাদামি চামড়ার জুতো, তার ওপর ফোলা পেন্টলান,

গায়ে হাত-গোটানো কামিজ, মাথায় বাদামী রঙের পুরু টুপি ; বাঁ হাতে ঘোড়ার বল্গাটা ধরে আছে, ডান হাতে একটা হাতখানেকের ছড়ি। সাহেব বলেই ভ্রম হয়েছিল, কিন্তু সে ক্ষণমাত্রের জন্য, নিতান্তই পোশাকের বিভ্রমে, তারপর নয়ান চিনল—মৈনের জমিদার,—এরা যাকে কুমারবাহাদুর বলছে।

চেনা অবশ্য আন্দাজে ; কিন্তু তাতে সন্দেহের কিছু ছিল না, তারই তো আসবার একটা সম্ভাবনা ছিল।

নয়ানের শরীর থেকে সমস্ত রক্ত যেন নেমে গেল। কটা মুহূর্ত কি একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় অসাড় হয়ে গিয়ে একেবারে সামনে চেয়ে বসে রইল। ঘোড়া নিজের ঝোঁকেই আগল পেরিয়ে যে খানিকটা এগিয়ে গেছে তার জন্যে আরোহীর মুখটা ঐ দিকেই ছিল, রাস টেনে ঘোড়াটাকে ফেরাতেই দৃষ্টিটা সোজা এসে পড়ল নয়ানের ওপর।

মুহূর্তেই নয়ানের সার ফিরে এল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে প'ড়ে দাওয়ায় উঠে আসতেই রান্নাঘরটার আড়ালে প'ড়ে গেল।

শরীরটা কাঁপছে, বুকের ঢিপঢিপিনিটা যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। খানিকটা পর্যন্ত কিছুই মাথায় এল না। একবার খুব সন্তর্পণে গলাটা বাড়িয়ে রান্নাঘরের আড়াল কাটিয়ে দেখল—ঘোড়াটা আগলের সামনে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে, আরোহী মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে চাইছে, কি করবে যেন ঠিক করতে পারছে না ; একবার এদিকেও এসে পড়ল দৃষ্টিটা।

অনঙ্গ এখানে নেই, ওদিকেই শুচ্ছে তিন দিন থেকে। নয়ান ভিখারীর ঘরে ধাক্কা দিয়ে ডাক দিল—"বাবা! ও বাবা!"

পাতলা ঘুমই ভিখারীর ; সাড়া দিলে—"কে ?"

"আমি—বৌমা, শিগ্‌গীর উঠুন একবার, কে এসেচে—ঘোড়ায় চড়ে—আগলের বাইরে দাঁড়িয়ে আচে।"

ভিখারী বোধ হয় রাজার স্বপ্নই দেখছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে কপাট খুলে দাঁড়াল, জিগ্যেস করল—"ঘোড়ায় চড়ে! দেখতে কি রকম ?"

উত্তরটা আটকে গেল একটু নয়ানের গলায় ; একটা ঢোক গিলে বলল—"ঘোড়াটা দেখা যাচ্ছে শুধু⋯"

ভিখারী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মাঝের সিঁড়িটাতেই দাঁড়িয়ে প'ড়ে ঘুরে চাইল, ভীতকণ্ঠে বলল—"সাহেব যে!"

নয়ান পিরানটা নিয়ে আসতে গিয়েছিল, আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে ধরে বলল – "দেখুন তো, মৈনের কুমারবাহাদুর নয় তো ?"

"অ্যাঁ—কুমারবাহাদুরই তো !·· তাহলে···অনঙ্গ কোথায় ? আর এরাও ওঠে নি—বেয়াই—লক্ষ্মণ···

ভয় আর অস্থির অনিশ্চয়তায় একটু ওপর-নিচু ক'রে তাড়াতাড়ি পিরান-টায় হাত সাঁদ করাতে করাতে নেমে গেল।

ততক্ষণে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এসে জুটে গেছে, যারা সঙ্গ নিয়েছিল কিন্তু ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের কতকগুলো আগল সরিয়ে ঢুকে পড়ে হৈ-চৈ করে তুলে দিতে লাগল সবাইকে, সমস্ত আখড়া এসে সামনে জড়ো হোল।

নয়ান দাওয়া থেকেই টপকে নেমে রান্নঘরের পেছন দিককার জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

এদিকে কারুর মুখ দিয়েই কথা বেরুচ্ছে না। গেঁয়ো লোক, রাজা দেখে আশ্চর্য হতেই জানে, অভ্যর্থনা আর জানবে কোথা থেকে ? অধিকারী থাকলে একটা কিছু হয়তো বলতে পারতো, প্রসাদ সামনে দাঁড়িয়ে কৃতকৃতার্থভাবে একটা অপ্রতিভ হাসি মুখে নিয়ে আস্তে আস্তে শুধু হাত কচলাচ্ছে। ভিখারীকে দেখা যাচ্ছে না ; ভিড়ে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

সময় অবশ্য অল্পই গেল, আরোহীই প্রশ্ন করল – "অনঙ্গ কোথায় ? সে নেই ?"

দলটা যেন কণ্ঠে আওয়াজ পেল। বিশ-ত্রিশটা কণ্ঠে—একটা উৎসুক রব উঠল—"কুটুম কোথায় ?···জামাই কোথায় ?···নঙ্গদা !···গেল কোথায় অনঙ্গ ?"

প্রসাদ রয়েছে তার মধ্যে, ভিখারীও। কতকগুলো ছেলে ডাক দিতে দিতে ছড়িয়ে পড়ল আখড়ার চারদিকে। অনঙ্গ ঠাকুরঘরের পেছন থেকে বেরিয়ে লজ্জিত ভাবে মাথাটা নিচু করে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। আজকের দিনের হীরো ; উৎসুক দলটা কুমারবাহাদুরকে ছেড়ে দিয়ে যেন তারই চারিদিকে চাপ বেঁধে দাঁড়াল।

সেই প্রশ্ন করল, হেসে—"কি হে, তোমার এখানে এলুম আর তুমিই নেই ?"

অনঙ্গ লজ্জিত ভাবেই উত্তর করল—"আপনি এত রোদে এ-রকম কষ্ট ক'রে যে আসবেন…"

"কষ্ট হ'লে আর আসব কেন?… বেরিয়েছিলুম রাইডিঙে—সকালবেলায় ঘোড়াটা নিয়ে একটু বেরুই—হঠাৎ খেয়াল হোল পলাশবাটীর দিকেই তো এগিয়ে এসেচি আজ…একটু না হয় এগিয়েই যাই না আরও; ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়াটাকে…তা একটু কোথায়? অনেকখানি হে!"

সবার দিকেই বিস্মিত দৃষ্টি ফিরিয়ে চাইল। প্রসাদ কথা কইল—"আজ্ঞে, মৈনে থেকে পলাশবাটি—তা কোশ পাঁচেক বৈকি।"

দলের কয়েকজন সায় দিল, কয়েকজন বাড়ালেও।

অনঙ্গ যেন প্রমাণটা পেয়েই হেসে বলল—"হোল বৈকি কষ্ট!"

"বেশ। কষ্ট তো তার আসান হোক, তা যে করবে সেই তো…"

প্রসাদ কথাটা লুফে নিল, জিভের আগল একবার খুলে গিয়ে ওর জিভ চুলকাচ্ছে; বলল—"আজ্ঞে, তা তো হবার জো নেই, শাস্তোর যে তা বলচে না…"

বাধা দিয়ে হঠাৎ এ ধরণের কথায় আরোহী একটু চকিত হয়েই ফিরে চাইল, হেসেই বলল—"তোমার হেঁয়ালি তো বুঝলাম না বাপু, শাস্তোর কি বলচে তাহ'লে?"

"আজ্ঞে শাস্তোর বলচে 'কত্তার ইচ্ছেয় কম্ম' —মানে কিনা, কত্তা যদি স্বয়ং রইল তো অন্যের সাধ্যি কি যে এগিয়ে যায়, তা নিজের ছাওয়ালই হোক, কি ওর নাম কি পরের ছাওয়ালই হোক।" (নিজের রসিকতায় চারিদিকে চেয়ে একটু হেসে নিল) "তা কত্তা যে এই রয়েচেন সশরীলে। কৈ, বেয়াইমশাই গেলেন কোথায়? দেশের রাজা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে…এই যে আসুন …বলি, দেশের রাজা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, অভ্যর্থনা করুন। পাদ্যঅর্ঘ্যি দিন। 'আমি ভিকিরী' বলে লুকিয়ে থাকলে চলে?"'

একটু পেছন থেকে পিঠে হাত দিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে, নাম নিয়ে এই নূতন রসিকতায় আর একবার সবার উপর দৃষ্টিটা বুলিয়ে মিঠে মিঠে হাসতে লাগল। পেছন থেকে সেই রসিক লোকটি বলল—"আর ভক্তের ভগবান, তাঁর তো ভিকিরী বিদুরের খুদই বেশি মিষ্টি।"

ভিখারী এসে খুব নিচু হয়ে প্রণাম ক'রে মূঢ়ভাবে একটু একটু হাসছিল, দু'একজন সংগোপনে কাঁধে পিঠে আঙুলের চাপ দিতে, বোধ হয় কথাগুলাও

জুগিয়ে দিতে, একটু স্খলিতকণ্ঠে বলল—"তা হলে নামুন···দয়া করে য্যাখন এয়েচেন···বিদুরের কুঁড়েতে ···· "

"তুমি অনঙ্গের বাপ ?"

"আজ্ঞে, অধীন।"

"তা বেশ, দেখবার ইচ্ছে ছিল তোমাকে। নামা···মানে···নামব বলে তো আসিনি। রোদও চনচনে হয়ে উঠেচে।"

ভিখারীর আড়ষ্ট ভাবটা খানিক কেটে এসেছে, "দেখবার ইচ্ছে" বোধ হয় কিছু সাহায্যও ক'রে থাকবে তাতে, বলল—"তা এমন চনচনে রোদে যাওয়া যায় ? · কি গো বেয়াই ?"

পেসাদ সায় দিলে—"কথাই তো। না, ছাড়াই যায় ?"

পেছন থেকে সেই লোকটি মন্তব্য করল—"আর, দয়া ক'রে এয়েচেন, পালকিতে কাঁধ দিয়ে পৌঁছে দোব—কতবড় একটা সৈভাগ্যি ! ছাড়ি কখনও ?"

"কিন্তু "

আরোহী একবার নিজের দিকে কুণ্ঠিতভাবে দেখে নিয়ে উত্তর করল—"না হয় একবার দেখে যেতাম আখড়াটা, যখন এসেই পড়েছি ; কিন্তু এই ফিরিঙ্গী পোশাকে · "

একটা উল্লাসের কলরব উঠল—"ও কিছু নয়।···ওতে কি হয়েছে · নামুন দয়া ক'রে, এয়েচেন য্যাখন · আখড়ার সৈভাগ্যি···"

প্রসাদ একটা নজিরও এনে ফেলল—"এজ্ঞে, খোদ ফিরিঙ্গী এসে ঘুরে গেছে এ আখড়ায়, তা—এজ্ঞে আপনি তো কোন্ ছার।—ঘাটের স্বত্ব নিয়ে সেবার আখড়ার ফৌজদারির যোগাড় হতে মাচিষ্টের সায়েব এল না তদারকে ? ···কোন্ নবদ্বীপের গোসাঁই ছেল সেই বা ?···"

আরোহী হাসতে হাসতে নেমে দাঁড়াল।

জানলা দুটো ভেজিয়ে তার ফাঁকের মধ্যে চক্ষু দুটো বসিয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নয়ান। এদিকের নিশ্চিন্ত অন্তরালের পেছনে থেকে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক, এ ধরণের আতঙ্ক, ঠিক এই ধরণের অনুভূতি কখনো ওঠেনি মনে এর আগে। অপূর্ব সুপুরুষ যুবা, বয়স ত্রিশের এদিকেই হবে, দুধে-আলতায় রং, এত সুন্দর রূপ নয়ান এর আগে কোথাও দেখেছে ব'লে মনে পড়ছে না। মাথায় বেশ যত্ন ক'রে এক একটি দোলকে পাকানো বাবরি চুল, টুপিটা নামিয়ে বগলে করতে গুচ্ছে গুচ্ছে কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মুখ ঘুরিয়ে

কথা কইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর সূর্যের আলোয় চিকমিক করছে, শাদা পোশাক আর দেহের রঙের জলুসের মাঝখানে যেন আরও দেখাচ্ছে অপরূপ! ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল এক ঋজুদেহ দীর্ঘছন্দ যুবক। শুধু এইটুকুতেই যেন এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে, পলাশবাটীতে যা কখনও হয়নি, হবেও না। আখড়ার এই ক'দিনের অমন উৎসবের স্মৃতিচিত্রটা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল।

দু'হাতেই হীরার আংটি। কটা বোঝা যায় না, আঙুলগুলো একটু চঞ্চল হয়ে উঠতেই এত আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে! এই সৌন্দর্য, এই সম্পদ, এর সঙ্গে ঘোড়াটাও দিয়েছে যোগ, চঞ্চল অঙ্গক্ষেপ প্রাণের প্রাচুর্য দিয়ে সমস্ত-টুকুকে আরও করে তুলেছে জীবন্ত।

কি করে যেন বুকটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছে নয়ানের। কোথায়, মনের কোন্ সুদূরে একটা অদ্ভুত ভয়, এ যেন তার মৃত্যু, এর হাত থেকে যেন পরিত্রাণ নেই। এই রূপ, এই অর্থবল—এর থেকে কেউ কখনও পরিত্রাণ পায়নি।···ইচ্ছে করছে দেখি দাঁড়িয়ে। মুক্ত বোষ্টমের জীবন, কৈশোর থেকেই সৌন্দর্যের পূজারী, যৌবনে এসেও তাতে বাধা-নিষেধ এসে পড়েনি; দু'নয়নে অঞ্জলিভরে পান করে এসেছে সৌন্দর্য—দেশে-দেশে, তীর্থে-তীর্থে। তারপব এল এই বন্ধন; তাও ত সেই রূপ-পিপাসাই, দেহের রূপের সঙ্গে না হয় ছিল সুরের রূপ।

বন্ধন নিয়ে এল শাসন। বন্ধনই শাসন, শুধু এত শাসন যে তা জানত না। তবু মেনে নিয়েছিল, ঘোমটার হালকা শাসন না মানুক, বিবাহটা যেখানে প্রকৃত শাসন, অনঙ্গ যেখানে নিজের অসপত্ন দাবি নিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে—সেখানটাতেও মেনে নিয়েছে—আনন্দের সঙ্গে, আত্মবিলুপ্তির সঙ্গেই, তাই তো প্রতিদিনের এই এত হা-হুতাশাও যেন মাথার মণি করে নিতে পেরেছে।

কিন্তু আজ হঠাৎ একটা প্রশ্ন কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়েছে,—সত্যাই পেরেছে কি? এই প্রায় আড়াই বছরের জীবন, অনঙ্গকে দেখা অবধি, তার মধ্যে এই বিবাহিত জীবনের এই দেড়টা বছর, এর মধ্যে ঠিক এই ভাবে কে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, রূপ—যৌবন—অর্থবিলাসের এই রকম বিভ্রম নিয়ে? পরীক্ষাটা দিল কবে?

সেই ভয়; যেন পারবে না, কোন মতেই যেন পারা যাবে না, কেউ কখনও যেন পারে নি। চোখ ফেরাতে চাইছে, উঠে পড়তে চাইছে; কিন্তু পারছে

না। শুনেছে নাকি সাপের সামনে কোন কোন পাখী পড়লে এই রকম হয়ে পড়ে।

কুমারবাহাদুর এগুলো। প্রসাদ এগিয়ে ঘোড়ার বল্গাটা ধরতে যাচ্ছিল, কোথাও দেবে বেঁধে; শুনল, কোন দরকার নেই; শেখানো ঘোড়া, এক পা নড়বে না ওখান থেকে।

আখড়ায় প্রবেশ করে দলের সঙ্গে এগিয়ে এল। রান্নাঘরের খানিকটা কাছ দিয়েই যেতে হবে, নয়ানের মনে হোল মৃত্যুই যেন এগিয়ে আসছে; আরও স্পষ্ট, আরও সুন্দর, আরও ভয়ঙ্কর। কিন্তু জানলার ওটুকু অবকাশও বন্ধ করতে পারল না, কেন যে পারল না নিজে বুঝতেও পারল না; শুধু দলটা এগিয়ে চলে যেতে একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

একটা অপূর্ব গন্ধ এসে নাকে লাগছে, সূক্ষ্ম, স্বপ্নালু। তারপর এরই বিভ্রমে হঠাৎ একটা নূতন কথা মনে হয়ে আবার যেন সমস্ত শরীরটা হিম হয়ে গেল—এদিকের বন্ধনও কি শিথিল হয়ে আসছে না—অবহেলায়, অনাদরে? তা যদি হয়···তাহলে!···এই করেই যে হয় সর্বনাশ!···দলের মধ্যে যেন খুঁজেই একবার অনঙ্গকে দেখে নিলে—দৃষ্টি যেন অবাধ্যভাবে তার ওপর গিয়ে পড়ল; অবাধ্যভাবেই তুলনা করে নিল দুজনকে।···কত প্রভেদ সবদিক দিয়ে!

পাগল হয়ে যাবে নয়ান এবার। সোনাটাই বা কোথায়?

বেটাছেলেদের বেশ খানিকটা পেছনে মেয়েদের একটা দল। সোনা রয়েছে; কিন্তু চেঁচাতে হয়। এরপর আর একটু পেছনে রয়েছে লক্ষ্মণ, পেয়ারীকে কোলে নিয়ে। লক্ষ্মণ মেয়ে নয়, তেমনি পুরোপুরি পুরুষও তো নয়;—ওর জায়গা একেবারে আলাদা।। নয়ান একটু জোরেই ডাক দিল—"লক্ষ্মণ! এ্যামনে এসো!"

লক্ষ্মণ একবার যেন অভ্যাসবশে মেয়েদের দলটার দিকে চাইলে, মনিবের আদেশের জন্যে। মনিব শুনতে পায়নি, এগিয়েই গেল মেয়েদের সঙ্গে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে নয়ান পেয়ারীকে যেন ছিনিয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরল; লক্ষ্মণকে বলল—"সোনাকে ডেকে দাওগে শিগ্‌গীর···বেহায়া কোথাকার!"

এমন বেহায়াপনাই বা কি করেছে সোনা? তবে আদেশটাতে জোর দেওয়ার জন্যেই ওটুকু জুড়ে দিলে।

একটা অবলম্বন পেয়েছে। আরও নিবিড়ভাবে পেয়ারীকে বুকে চেপে

কোনদিকে না চেয়ে হনহন ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠে একেবারে ঘরে গিয়ে ঢুকল। হাঁপাচ্ছে, যেন কতবড় একটা দুঃসাহসের কাজ করল; কি ভয়ঙ্কর বিপদই এই দু'পা আসতে ঘটতে পারত এখনই!

"খেয়েছিস কিছু?"

কথা আরম্ভ করবার জন্যই একটা প্রশ্ন। পেয়ারীর উত্তরটাও বাঁধা, মুখটা তোলোপানা ক'রে বলল—"খেটে ড্যায়নি।"

"রাক্কুসী! নিজে খেয়ে বাঁচবে তবে তো তোকে দেবে। রোস্।"

কাঁচের জারে ল্যাবেঞ্চুস, বিস্কুট, হাট থেকে কেনা মুড়ির-চাকতি যোগাড় করা থাকে; একটা চাকতি হাতে দিয়ে চৌকির ওপর মুখোমুখি ক'রে বসিয়ে গল্প জুড়ে দিলে—"হ্যাঁলা, রাজা দেখলি? কেমন রাজা?"

একটা নিত্যদিনের শোনা গল্পই এসে পড়ল; পেয়ারী চাকতিতে কামড় দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল—"ছুন্দোল। ঘোঁলায় চেপে বিয়ে কলবে!"

অর্থহীন শিশুকাকলি, তবু কানে যেন একটা ধাক্কা দিলে; নয়ান বলল —"পোড়ারমুখী—বিয়েই চিনেচেন খালি! তা তোর···"

সোনা হন্তদন্ত হয়ে উঠে এল, সিঁড়ি থেকেই আরম্ভ করল—"ডেকেচ দিদিমণি? হ্যাঁগা, রাজা দেখলে নি! মাটিতে হেঁটতেচে—অবাক কাণ্ড!"

গালে আঙুল চারটে চেপে অবাক কাণ্ডটা দেখবার জন্যে একবার ফিরেও চাইল পেছনে।

নয়ান পেয়ারীকে কোলে নিয়ে উঠে এল দাওয়ায়, বলল—"তাইতো! আর মানষের মতনই দুটো হাত, দুটো পা! অবাক কাণ্ড বলতে!"

"ঠাট্টা করো, কিন্তুন সত্যি আশ্চয্যি বাপু, এমন তো শুনিনি। রাজা যদি হেঁটবে তো···"

"তাহ'লে লক্ষ্মণের সঙ্গে আর তফাতটা কোথায়?···মরণ আর কি!··· তা রাজকন্যেকে খেতে দিসনি কেন?"

সঙ্গী থাকার জন্যেই বোধ হয় সে আতঙ্কটা আর নেই। দাওয়ার মাঝখানে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়েই দেখতে লাগল, মাঝে মাঝে হালকা আলাপও হচ্ছে ঐ রকম, এক একবার রাজাকে নিয়েই এক-আধটা হালকা রহস্যালাপও; আর সে আতঙ্কটা নেই, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচটাও চলে গেছে; মুক্ত হাওয়ায় দোষের ভাবটাই গেছে কেটে।

বিন্দুর হঠাৎ চোখ প'ড়ে যেতে মেয়েদের দল থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে

এল। ঐ রকম একটা রহস্যালাপের মাথায় এসে পড়ায় নয়ানের মুখ দিয়ে ফস্ ক'রে বেরিয়ে গেল—"ঐ যে বৃন্দেদূতীও এসে গেচেন। কী খবর গো ?"

খবর আছে বৈকি বিন্দুর। এমন অভ্যর্থনা আশাও করেনি : "খবর …তা—আসল খবর, সে তো পথ চেয়ে সামনেই…" মাথা নিচু করে সিঁড়িটা একটু দেখে নিয়ে হাসিমুখেই আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, মুখ তুলে চাইতেই আর রা ফুটল না।

নিজের প্রগলভতাতেই চকিত হয়ে মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছে নয়ান। মুখটা একেবারে কঠিন, ঘুরিয়েও নিয়েছে সোনার দিকে, তাকেই কড়া ধমকের স্বরে বলল—"তোকে কি বললুম সোনা, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েচিস! ওরা যে ঘুরে মন্দিরের দিকে এসে পড়ল।"

সোনা হাঁ করে চেয়ে আছে।

"মন্দিরের রকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললুম না? খবরদার, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গেলেই রুকবি, বলবি মানা আছে।…বিন্দু, আয়।"

ঘরের দিকে যেতে যেতে মুখ অন্ধকার ক'রে বলল—"ঠাকুরবাড়িতে আমি রাজা-বাদশা মানিনে! ঢের অনাচার হয়েচে!"

অনুসরণ করতে বিন্দুর একটু আশা লেগেই রইল,—নয়ান হয়তো সরিয়েই দিলে সোনাকে।

সতেরো

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক আখড়ার চারিদিকে ঘুরে ফিরে কুমারবাহাদুর চলে গেল। বিপদটা তখনকার মতো কাটল, কিন্তু একেবারে কাটল না। গোসাঁইঠাকুর পূজার জন্যে এসে পড়েছিলেন; এদের কেউ অতটা পারত না, তিনি কিন্তু ঠাকুরবাড়িতে এসে এক রাত যাত্রা দেখে যাবার নিমন্ত্রণ করে বসলেন। একটু আমতা আমতা করে রাজী হোল কুমারবাহাদুর। দিন তিনেক মৈনেতে থাকবে না, ঠিক হোল চতুর্থ দিন আসবে। দূরের পাল্লা; জ্যোৎস্নারাত্রি অবশ্য, তবু সন্ধ্যা হতেই আরম্ভ হবে যাত্রা—যাত্রা নয়, এবার অপেরা। কালই শেষ হওয়ার কথা ছিল উৎসব; আরও দুটো দিন বেড়ে গেল।

খুব একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল—আখড়াতে তো বটেই; গ্রামে পর্যন্ত একটা

সাড়া পড়ে গেল—কুমারবাহাদুর এসেছিল, আবার আসবে কথা দিয়ে গেছে, পলাশবাটীর এ সৌভাগ্য তো কল্পনাতীতই।

ঠাকুরবাড়ির দিকে যেতে একটু দেরি করল নয়ান, হঠাৎ একটা কাল-বৈশাখী উঠে ওর দেহমন যেন তছনছ করে দিয়ে গেছে, একটু একলা থাকতে চায়। বিন্দু সোনা দু'জনকেই সরিয়ে দিয়ে চুপ করে ব'সে ছিল, অনঙ্গ এসে উপস্থিত হোল। উৎসাহে যেন কি করবে বুঝতে পারছে না।

জিজ্ঞেস করল—"দেখলি?"

সঙ্গে সঙ্গেই পিরানের পকেট থেকে পাঁচখানা একশ' টাকার নোট বের ক'রে বলল—"আর এই কটা রাখ।·· ওদের খাওয়া-দাওয়ার খরচ, ঐ যে দুটো দিন আরও বাড়িয়ে দিলে, তার মূল্য। এত কি পড়ে?—তা রাজারাজড়ার মেজাজই তো।"

নয়ান হাতটা না বাড়িয়ে মুখের দিকে ঠায় চেয়ে ছিল, খুব সূক্ষ্ম একটা অদ্ভুত হাসি—যেন বিস্ময়ের কূল পাচ্ছে না, এত বিপদে এমন নিশ্চিন্ত ঘুম কি ক'রে ঘুমতে পারে মানুষে! ভূষণের বেলায় যে উগ্র খোঁচাটা দিয়েছিল সেদিন, সে-ক্ষমতাটা আজ নেই; শুধু বলল—"তাহলে দেখছি, নেহাত পথ ভুলে আসা নয়; বেশ একটা মতলব করেই এয়েছিল, নইলে নিছক বেড়াতে বেরিয়ে এত টাকা······"

"বাঃ, ওরা হোল রাজা, ওদের···"

"নাড়া দিলেই টাকা পড়ে···"

হেসেই ফেলল নয়ান। বলল—"তা আমায় কেন?—টাকাটা বেশ মোটা দেখতে বলে?···সত্যি, লাগবেও না তো এত!"

পূজার আয়োজন করার সময় গোসাঁইঠাকুরের সঙ্গে স্বভাবত এই নিয়েই আলোচনা হোল। আর সবার যেন একটা উচ্ছ্বাস—রাজা এসেছিল, আবার আসবে বলে গেছে, ওঁর সে ধরণের কিছুই নেই। নয়ানের আসতে দেরি দেখে নিজেই চন্দন ঘষতে আরম্ভ করেছিলেন, বললেন,—"তুই আবার এলি কেন দিদি? আমি সেরে নিতুম। কদিন যা ধকোলটা যাচ্ছে, শরীর এলিয়ে আসবেই তো।"

নয়ান চন্দন-পিঁড়িটা টেনে নিয়ে হেসে বলল—"দাদুর কথার অন্ত পাওয়া ভার; শঠের পূজুরীই তো! নাতনীর জন্যে দরদও আছে, আবার দুটো দিন বাড়িয়েও দিলেন। নেমন্তন্নটা না করলেই তো হোত!"

"হ্যাঁরে, তা আমি কি ক'রে বুঝব যে নেমন্তন্নর জন্যে হাঁ ক'রে আছে এমন করে!"

কথাটা বলতে বলতেই হো হো করে হেসে উঠলেন। এমনই একটা কিছু ছিল নিমন্ত্রণ-লুব্ধের চিত্রটাতে যে নয়ানকেও হেসেই উঠতে হোল একটু, সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু হাসিটা নিভে গিয়ে মুখটা অন্যরকম হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি নিচু ক'রে নিয়ে হাত থামিয়ে চন্দন-পিঁড়িটার দিকে চেয়ে রইল--যেন পোকা-মাকড় কি পড়ে থাকবে। সেইভাবে চেয়ে থেকেই বলল,—"সেই জন্যেই লোক না চিনে নেমন্তন্ন করে বসাটা · "

এরপর আবার ভাবটা সামলেই নিল, যদিও কথাটা বলে ফেলবার লোভ সামলাতে পারল না। মুখ তুলে হেসেই বলল—"বলছিলুম—না চিনে নেমন্তন্ন করে বসা—কি বলি দাদু?—খুব দুঃসাহসের কাজ; কার মনে কি আছে টের পাওয়ার তো জো নেই।"

বৈষয়িক দিক দিয়ে দেখতে গেলে অতি-শুদ্ধ মনের একটা ত্রুটিও আছে—খারাপের দিকটা টপ করে ভেবে উঠতে পারে না। গোসাঁইঠাকুর সমস্তটুকুর মধ্যে 'দুঃসাহস' কথাটাই বেছে নিলেন, বললেন—"হুঁ! ঐ কথাটাই ধর না, সবাই বললে রাজাকে নেমন্তন্ন করেচি, কি একটা মস্ত বড় যেন সাহসের কাজ করেচি। আমি তো তার কিছুই দেখতে পাচ্চি না দিদি। আমি কোন্ রাজাধিরাজের চাকর সেটা আবার দেখতে হবে তো। একটা মানুষ এল আদর জানিয়ে, তাকে একটা মুখের কথা বলে একটু খাতির না করলে আমার চাকরিই বা কি করে থাকে বল্?"

"আমার কথাতেই যে আবার ফিরে এলে দাদু;—লোক না চিনে খাতির করতে গেলেও তো চাকরি থাকবে না।"

"এই দেখো কি রকম বোকার মত কথা বলে দিদি!—চেনাচিনির ব্যাপারে আমি যে একেবারে নিশ্চিন্দি রে। যার দরবারে খাতির করে তুলচি সে যে রাজা আর শঠ দুই-ই, চিনে নিতে পারবে না কে কোন্ বেশে ঢুকচে? আমি অত বাছাবাছির দায় ঘাড়ে করি কেন বল্! তারপর বেমোকায় শঠের বেশে সত্যিকার রাজাই যদি এসে পড়ে, চাকর দিয়ে বসে গলাধাক্কা—তাহ'লেই কি তার চাকরিটা থাকবে?"

নয়ান হাতের তেলোয় চন্দন তুলে নিয়ে চেঁছে চেঁছে বাটিতে রাখতে লাগল।···গোসাঁইঠাকুর কি তাহলে ইঙ্গিতটা পারলেনই ধরতে? অপেক্ষা,

করতে লাগল—আরও কিছু বলে যদি স্পষ্ট করেন।···একটা সঙ্কোচও ঠেলে উঠেছে মনে।

"একটু হাত চালা দিদি, দেরি হয়ে যাচ্চে।"

এক মুঠো দুর্বা তুলে নিয়ে বাছতে আরম্ভ করে দিলেন, তার সঙ্গেই আবার গল্পও—

"তোকে এর আগে বলেচি দিদি—'সর্বং সমর্পিতমস্তু'র চেয়ে বড মন্ত্র আর নেই; অবিশ্যি ওর চেয়ে শক্তও নেই কিছু। শক্ত এই জন্যে যে সব-তাতেই পোড়া অহংটা এসে সামনে দাঁড়াবে—কখনও বুক ফুলিয়ে—'আমি এই করলুম, আমি এই বললুম'—আবার কখনও পিঠ কুঁজো করে—'আমি গেলুম গো!'··· 'আমি মলুম গো!'···আরে তুই কে যে তুই 'আমি করলুম' বলে দেমাক করবি, কিম্বা 'আমি সইতে পারচি না' বলে নাকে কাঁদবি? ঐ 'আমি'টাকে একেবারে কেটে বাদ দে দিকিন, দেখবি ·"

নয়ান চোখ তুলে হেসে বলল—"হ্যাঁ দাদু, তাহ'লে ঐ 'সমর্পণ'-ই বা কে করবে?···আসল কথা তোমার ঐ রাজা আর শঠ—শঠরাজই বলি, ওঁর হেঁয়ালি বোঝা দায়, বলবার জন্যে, করবার জন্যে নিজেই দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এই 'আমি'টাকে—যেমন বলাচ্চেন, যেমন করাচ্চেন তার একটু এদিক-ওদিক বলবার বা করবার অধিকার নেই তার, অথচ পরিণামে যখন···"

হঠাৎ হাতের কাছে একটা উদাহরণ পেয়ে যাওয়ায় কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বলল—"এই যেমন তোমার যাত্রা-অপেরা দাদু, চোখের সামনেই তো দেখচি—পালা-বাঁধিয়েই বলো বা অধিকারীই বলো—তারা যেমনটি চায় ঠিক তেমনটি বলতে হচ্চে বা করতে হচ্চে···এই তো আমার এইটুক জীবনের মধ্যেই দেখছি দাদু, অথচ সাজা পাওয়ার বেলায় ··"

তর্কটা অন্য কথায় আরম্ভ হয়েছিল, তারপর নিঃসাড়ে কখন নিজের কথাতেই এসে পড়েছে; গলাটা একটু যেন ভার হয়েই আসছিল, গোসাঁই-ঠাকুর একেবারে হো হো করে হেসে উঠলেন, নয়ান চকিত হয়ে উঠতে বললেন—"ওরে শোন্, খুব কথা মনে করিয়ে দিয়েচিস, ও আর কি শঠ? ওর চেয়ে আমরা শত গুণ বেশি। তোকে উদ্ভটের একটা শ্লোক শোনাই—

আনিতানটবন্ময়া তব পুরঃ শ্রীকৃষ্ণ যা ভূমিকা
ব্যোমাবন্যনিলানলাম্বুরসবস্যৎ প্রীতয়েঽদ্যাবধি

প্রীতো যদ্যসি তান্নিরীক্ষ ভগবন্ মৎ প্রার্থিতন্দেহি মে
নোচেৎ ব্রুহি কদাপি নানয়পুনর্মামীদৃশীং ভূমিকাম্।

কবি বলছেন—হে শ্রীকৃষ্ণ, আকাশ পৃথিবী অনিল অনল জল—এই পঞ্চভূত সমন্বিত জীবন-নাট্যের ভূমিকা নিয়ে তোমার সামনে নটের মতো উপস্থিত হয়েছি তোমার প্রীতির জন্যে (অবশ্য তোমারই নির্দেশে, কেননা নাটকের রচয়িতা তো তুমিই)। এখন, তুমি তাই দেখে যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাক তো আমায় আমার প্রার্থিত বস্তু দাও, নয়তো বলো—আর কখনও তোমাকে এ-রকম ভূমিকা নিয়ে আসতে হবে না। আমিও অব্যাহতি পাই।

এখানে বসলেই বাহিরের গ্লানিটা অনেকখানি কেটে আসে, শ্লোকটার চটুলতায় একটু যে হাসি উঠল তাতে মনে হোল যেন আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। সে কিন্তু প্রথম দিকটা, তারপর ঐ চটুলতার মধ্যেই কেমন একটা অসহায়তা, একটা অভিমান তো আছেই, কথা গেল এক তরফা হয়ে, চন্দন ঘষতে ঘষতে কয়েকবারই মাথা নিচু ক'রে চোখ মুছলে নয়ান। শেষে একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ানও দরকার হয়ে পড়ল। লঘু-গুরু আলাপে হাতটা মন্থর ভাবেই চলছিল; তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল, হেসেই বলল—"নাটকের ভাষাতেই বলি দাদু, এবার দৃশ্যান্তর, রাঁধুনীর বেশে নয়ানের প্রবেশ।···আমি ওদিকটা দেখি একটু, কতদূর কি হোল, যাত্রাপাটিকে খাইয়ে দাইয়ে বিদেয় করতে হবে; তুমি দাদু ঐ অধিকারীর সঙ্গে সাজঘরে থাকো ততক্ষণ।"

বিন্দু অবশ্য ছাড়ল না, এত বড় একটা সুযোগ তো আসে না হঠাৎ। বেশ গুছিয়েই আরম্ভ করেছিল সকালে, নয়ানের ভাবগতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গেই থমকে পড়তে হোল; তারপর রাজার খাতিরটাও দেখল—নয়ান মন্দিরের দরজায় সোনাকে রীতিমত পাহারায় বসিয়ে দিল। রসের কথা আর জমাতে পারল না বিন্দু।

কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়।···রাজা আবার দু'দিন পরে আসছে তো! শনিগ্রহের মতো তর্কে তর্কে রইল, একটু রন্ধ্র দেখলেই প্রবেশ করবে। খুব বেশি খুঁজতেও যে হোল এমন নয়—সর্বক্ষণ চারিদিকে ঐ আলোচনাই তো চলছে,—রাজার রূপ, রাজার সম্পদ, রাজার মন-মেজাজ।

ঐ আলোচনাই চলছিল, পদ্মমণির চালা ঘরটায়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু জিরিয়ে নিয়ে রোজ আড্ডা বসে, পদ্মমণির রাজসভা বলাও চলে,

থাকে ওর দলের মেয়েরা, কিছু কিছু এদিক-ওদিক'কারও, যেদিন যেমন আমদানি, আর বিন্দু। বিন্দু নিয়মিত। আজকাল নিজের আস্তানা ছেড়ে অষ্টপ্রহর এইখানেই রয়েছে। কাজের মানুষ, তার ওপর রসের মানুষ, দুটোরই প্রাচুর্য এখন, আর নড়ে না, কতকটা নড়বার উপায়ও নেই; নিরঞ্জন দাস দুবেলা এসে এখান থেকেই খেয়ে যায়।

খুব যে রূপসী তা না হলেও আসর-মানানো রূপ পদ্মমণির। মোটা-সোটা, রংটাও আছে, ঘোরালো মুখে টানা দেওয়া নথ, গালে একটা পান টেপাই থাকে অষ্টপ্রহর; বাচাল নয়, তবে মুখে কথা আছে, আর হাসিও; শুধু কোনটারই বাজে খরচ নেই।

ও যে শিউড়ির পদ্মমণি, নিজেও জানে, লোকেরও যাতে ভুল না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি আছে।

তবে এই এক রূপেই শেষ হয়ে যায়নি পদ্মমণি; কিন্তু সে কথা যথাস্থানে।

জমাট গল্প চলেছে—মৈনে নিয়ে, আরও কোন্ কোন্ রাজবাড়ি ঘুরেছে পদ্মমণি—এমন সময় সোনা এসে বলল—"দিদিমণি জিজ্ঞেস করে পাঠালে, একবার ওদিকে যাওয়ার ফুরসৎ হবে কি? সেই আসত, তবে বাড়িতে কেউ নেই…"

পদ্মমণির একটা অভিমান ছিল। পাঁচদিন এসেছে, আশা করেছিল বৈকি একদিন বাড়িতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে নয়ান, রাজার রাণীরাই করে, এ তো একটা আখড়ার বোষ্টুমী…উত্তরটা সোনাকে না দিয়ে বিন্দুর দিকে ঘাড়টা একটু কাৎ ক'রে ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে বলল—"হুকুম হ'লে যেতেই হবে, কি বলো ভাই?"

কারণটা না বুঝুক, খোঁচাটা বুঝতে দেরি হোল না সোনার, বলার ভঙ্গিতে পদ্মমণি তো কিছু ঢেকেও রাখলে না। উত্তর করল—"হুকুম রেখে গেলুম, এখন আপনার যেমন অভিরুচি।"

যেমন খাড়া চালে গটগট করে এসেছিল, ঘুরে সেই রকম ভাবে চলে গেল।

বিন্দু মন্তব্য করল—"মরণ!"

পদ্মমণি কিন্তু হেসে ফেলল, বলল—"একেবারে—কি যে বলে, বাদশাহী সেপাই যে!"

বিন্দু মুখপাত দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল একটু, ব্যাপারটা হাসিতে হালকা

হয়ে যেতে বলল—"না, বাদশা নিজে কিন্তু ওরকম নয়। বুঝলেন না?—সূর্যির চেয়ে বালির তাত্ যে হবেই বেশি। চলুন।"

পদ্মমণি কি যেন একটু ভেবে নিল, বলল—"যাব তো নিশ্চয়, ডেকেচেন যখন।…একটু দেরি হবে। তাই বলছিলুম আপনি যদি এগিয়ে যেতেন। মানে, এ আবার গিয়ে অন্যভাবে না বলে।"

"অবিশ্যি অন্যভাবে নেওয়ার মানুষ নয় সে; তবুও মন্দ কি? যাই না এগিয়ে। আপনি কিন্তু আসুন শিগ্গীর।"

নয়ান আগেই ডাকত; কিন্তু সময় বা সুবিধা ক'রে উঠতে পারছিল না। ডাকতে হলে সমস্ত দিনরাতের মধ্যে এইটুকু সময়ই প্রশস্ত, খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামের পর আখড়াটা একটু ঠাণ্ডা হয়। নয়ানের কিন্তু ফুরসৎ থাকে না। খেয়েদেয়ে ভিখারী এই সময় এসে ঘরে শোয়; এই সময়টুকু নয়ান শ্বশুরের একটু সেবা করতে পায়। সেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্দেশ্যও থাকে, ভিখারী কেন হঠাৎ আসতে গেল এখনও ভাঙেনি, যদি এই কথাটা বের করে নিতে পারে; যদি আসার কারণ অন্য কিছু হয়তো ওপর-পড়া হয়েই তো বলতে হবে নিয়ে যাওয়ার কথাটা। তারও উপযুক্ত অবসর এইটুকুই।

চারদিন থেকে কিন্তু ওদিকেও কিছু করে উঠতে পারছে না। সমস্ত রাত জেগে যাত্রা দেখা, নয়ান এসে পা টিপতে টিপতে এদিক-ওদিক দু'একটা কথা তুলতে তুলতেই ভিখারীর চোখ বুজে আসে। ঘুমিয়ে পড়ার পরও একটু ব'সে থাকতে থাকতে নয়ানের নিজেরও আলস্য এসে যায়। তা ভিন্ন পদ্মমণিকে ডাকা মানেই গল্প-গুজবের সঙ্গে একটু গানটানও, শ্বশুর ঘরে থাকতে তা সম্ভব নয়।

এই ক'রে ডাকা হয়নি এখনও। আজ খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি পান মুখে পুরে সোজা আখড়ার দিকে বেরিয়ে গেল ভিখারী। অপেরা এসেছে, মন্দিরতলার সেই শ্রীকৃষ্ণ অপেরা, যার অধিকারীর সঙ্গে সেবার এত আলাপ হোল। নয়ান তবুও একটু গড়িয়ে নিতে বলল, সমস্ত রাত জাগা হয়েছে; ভিখারী ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব বিস্মিত হয়ে বলল—"শ্রীকৃষ্ণ অপেরার অধিকারী, আজকের আলাপ তার সঙ্গে! আগে জানলে যে এখানেই রান্নার ব্যবস্থা করতে হোত; কাল থেকে হবেও।"

আলাপের ইতিহাসটা শুনেছে অনঙ্গের কাছে। মুখে একটা হাসি টিপে ঘরে গিয়ে ঢুকল। যাক্, ভালোই হোল, শ্বশুরের মনটা আরও ভালো থাকবে;

আর কয়েকদিনের হিড়িকে নিজের শরীরও যেন বইছে না; সোনা আসুক, একটু ভালো ক'রে গা-গতর টিপিয়ে নেবে।

বাড়ির দুপুরের পাট সেরে সোনা এল একেবারে রাজার কথা মুখে করেই, আরম্ভ করতেই নয়ান বললে—"কানু ভিন্ন আর গান নেই!·· থাক্ তোর রাজা, তুই এখন রাণীর একটু সেবা কর দিকিন···"

মনটা খুব হালকা থাকার দরুনই কথাটা ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েই যেন উলটে এক ছোবল মারল·· সকালের সেই ভয়,—যেন দুর্নিবার গতিতে কি একটা অনিশ্চিত বিপদ চারিদিক দিয়ে ঘেরে আসছে। কথা কইতেও দেবে না নাকি এমনি করে!

শুয়েছিল, সোনা এসে একটা পায়ে হাত দিতে পা'টা টেনে নিয়ে বলল—"দেখো, সত্যি বসে গেল! আমার নাকি এখন আয়েসের ফুরসৎ আচে?··· কি যে বলছিলুম!···হ্যাঁ, ঢপউলিটাকে একবার ডেকে আন্, রাজবাড়ির পেয়ারের ঢপ, একবার ডেকে একটু জিজ্ঞেসপড়া ক'রতে হবে তো!"

নিজের প্রতি বিরক্তিতেই কথাগুলো একটু কটু হয়ে বের হয়েছে, সোনা উঠতেই বলল—"চলল অমনি ঢ্যাং-ঢেঙিয়ে! ঐ ক'রে বলবি নাকি গিয়ে—ঢপউলি গো, তোমার ডাক পড়েচে, চলো?"

পাছে কোন ভুল ক'রে বসে সেই জন্যে কিভাবে বলতে হবে বার দুই তিন বুঝিয়ে ব'লে, সোনাকে দিয়েও বলিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দিল।

সোনা চেষ্টা করল, তবু এ-ঘরের উষ্ণ হাওয়া ও-ঘরে একটু গেলই পৌঁছে।

বিন্দু সেয়ানা মেয়ে, পদ্মমণি যে একটা ছুতো ক'রে তাকে সরিয়ে দিল, বুঝতে বাকি রইল না, তবে তার একটা কথা মনে পড়ে যেতে দেখল সুবিধাই হোল। শীঘ্রই আসতে বলে উঠে পড়েছিল, দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—"তা তাড়াতাড়িই বা কিসের? হোলই একটু দেরি; ক্ষেতিটা কি? আমি তো বলছিলুম একটু না হয় গড়িয়েই নিতেন।"

নয়ানকে একটু একা পেতে চায় বিন্দু।

নয়ান দাওয়াতেই দাঁড়িয়েছিল; শুধু বিন্দুকে আসতে দেখে একটু উদ্বেগের সঙ্গেই ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল—"তুই একলা যে? এল না পদ্মমণি?"

বিন্দু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একটু মুখ টিপে হেসে বলল—"আসচে। তুমি ঘরে চলো, বাইরে বড় তাত্।"

"আমি মনে করলুম সোনাটা বোধ হয় ঠিক ভাবে বলতে পারেনি; কথা কইতে জানে না তো।"

বিন্দু সুযোগটা হাতছাড়া করল না, ঠোঁটটা কুঁচকে বলল—"ন্যাও, গুছিয়ে বলতে না পারলে নাকি আসবে না! কে ডাকচে সেটা হুঁশ নেই ওর?"

নয়ান একটু হেসে বলল—"তার ডাকে তো ওরা আসেনি আখড়ায়, এসেচে অন্যের ফরমাশে। এই এক কথা, তা ছাড়া—"

"যার ফরমাশে এসেচে, তাকেও তো দেখলে গো আজ এই আখড়ায়, একেবারে সশরীলে।·· যায় কখনও যেথায়-সেথায় ওরা?"

কথাটা প্রশ্নের আকারে ছেড়ে দিলেও, বিন্দুর মুখের কথা বলেই ইঙ্গিতটা বুঝতে দেরি হোল না নয়ানের। কিন্তু যেন বুঝেও বুঝল না। হঠাৎ ওর একটা অদ্ভুত খেয়াল হোল,—নিজের মনের আতঙ্কটা কত গভীর তা তো জানে, অন্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে কতদূর কি ভাবচে দেখাই যাক্ না একটু, বিশেষ ক'রে বিন্দু কি ভাবে।

মুখ ভার করবার দিকেও না গিয়ে বেশ সহজ রহস্যের গলাতেই বলল—"রাজা তাহলে আমাদের কদর বাড়িয়ে দিয়ে গেল বল্?···আমারই বলি, আমার ডাকের কথাই তো হচ্ছিল।"

বিন্দু একেবারে এতটা হকৃচকিয়ে গেল যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর জোগাল না; একটু চেয়ে রইল মুখের পানে, তারপর আবার সামলে নিল, বলল—"তা গেল বৈকি। আখড়ায় পা দিলে তোমাদের কদর বাড়বে না? অবিশ্যি কুটুমের খাতিরেই আসা, কিন্তু কুটুমের কাছে আবার কার খাতির সব চেয়ে বেশি সেটাও তো অজানা নেই।"

"আমার খাতির নিয়ে দুজনে রেষারেষি পড়ে গেচে বল্। আমি লোকটা তাহলে যে-সে নয়?"

বিন্দু আবার বিস্মিত দৃষ্টি তুলে নয়ানের মুখের ওপর ফেলে রাখল একটু; নয়ান হাসিমুখেই বলল—"তুই নিজেই তো তাই বলচিস্।"

"মিছে বলিনি।· অবিশ্যি রাজা কি ভেবে সাত-তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে গেল, রাজাই জানে, তবে বৌ নিয়ে মৈনের দেউড়ি পর্যন্ত একটা সাড়া পড়ে গেচে—কি ক'রে কথাটা রটল ভগবানই জানেন—গাইবার জন্যে অন্দর মহলে ডেকে পাঠিয়েচে—সেখানেও ঐ কথা—হ্যাগা, ঐ যে অনঙ্গ, কেষ্ট

সাজে, ওর বৌ নাকি ডাকসাইটে স্বন্দরী ?—নাকি সায়েব-মেমেদের মতন 'লব্' হয়ে বিয়ে হয়েচে ?"

নয়ান হেসে বলল—"নাকি সায়েব-মেমেদের মতন বাড়ি ছেড়ে আলাদা হয়েচে ?"

"ও মা! তা তো জানেই ; এমন কি একদিন জিজ্ঞেস করল—রাণীই—এখন নাকি আবার সায়েব-মেমেদের মতন একটু আবার মন কষাকষি ··"

নয়ানের হাসি হাসি চোখ দুটোয় হঠাৎ যেন আগুন ঠিকরে উঠল, বলল—"সব তুই-ই রটিয়েচিস বিন্দু, নইলে···"

বিন্দু একেবারে আকাশে চোখ তুলল—

"ওমা, আমি !···যে দিব্যি গালিয়ে নাও···"

নয়ান সংযত করে নিল নিজেকে, আবার আগের মতো একটু হেসে বলল—"ভালোই তো, রূপের যশ বাড়ে কে না চায় ? তুই-ই যদি গেয়ে বেড়াস—অপকার করচিস কি ? তবে হাঁড়ির খবরটা ও-রকম করে আর দিসনি কাউকে।"

"মাইরি বলচি দিদিমণি, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলচি···,"

"বোস্। রাজবাড়িরই গল্প বল্ একটু।···ইনি আবার এত দেরি করচেন কেন ; আসবেন তো ? রাজবাড়ির ছোঁয়াচ লেগেচে কিনা, তাই বলচি।"

"আসবে ওর ঘাড় ; ঐ যে বললুম না ?—রাজবাড়ি তো আজ এখেনে।"

নয়ান শুধু একটু হাসল, বলল—"তারপর এদিককার রূপের কথা তো ওদিকে জানিয়েচিস, এবার ওদিককার রূপের কথা বল্—রাণীকেও তো দেখেচিস···"

বিন্দু চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। নয়ান বলে চলল··· ওদিককার রূপেয়ার ব্যাপারটা তো চোখেই দেখলুম—কটা দিনে পঞ্চাশটা টাকা খরচ হয়েচে কি না হয়েচে—একেবারে পাঁচশ টাকার নোট তোদের কুটুমের হাতে গুঁজে দিয়ে গেল।"

একেবারে একটা নূতন ধরণের হাসি চোখে নিয়ে বলল—"তোদের কুটুম আবার আমায় সেই টাকা দেখাতে এসেছিল !"

বিন্দু ধাঁধা খেয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, কথা কয়েক সেকেণ্ড বেরুলই না মুখ দিয়ে, তারপর আরম্ভ করেছিল—"টাকা···তা···সব চেয়ে বড় কথা হোল দেওয়ার হাত—রাজার···"

এমন সময় কি ভেবে একটু ঘুরে চাইতে বাইরের দিকে নজর পড়ে যাওয়ায় বলে উঠল—"এই যে এসে গেচে!"

নয়ান একটু আড়ালে ছিল, উঠে দাঁড়াতে তাকে একটু টেনে নিয়ে কানের কাছে মুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—"ঐ সমস্তই রাজার দেওয়া —এইবারে—ঐ মটোর মালা, ঐ সোনার মেডেল, ঐ বেনারসী—ঐ…"

"জয় রাধে!"—ব'লে সাড়া দিতে এরা বেরিয়ে এল।

আসরেও এত জাঁক ক'রে কোন দিন সেজে বসেনি পদ্মমণি; কমের দিকে, অতগুলো মেডেল না পরে শুধু বড় সোনার মেডেলটা বুকের বাঁদিকে ঝুলিয়ে রেখেছে। তেমনি আসার মধ্যেও রয়েছে জাঁক; দলের পাঁচটি মেয়েই রয়েছে সঙ্গে, কমবয়সী একটির হাতে আংটা দেওয়া একটা পান-বাটা ঝোলানো। একজনের হাতে একটি রংচঙে পাখা।

অলস মন্থর চাল পদ্মমণির; চোখাচোখি হ'তে হেসে বলল—"এই এলুম ভাই—

দূতী আওল…স্বন্দরীকে সকাস্—

এখন যা হুকুম।"

নয়ান একটু স্খলিতচরণেই এগিয়েছিল, শুধু বলতে পারল, "আস্থন ভাই।"

বিন্দু বলল, "উত্তরটা তাহলে আমাকেই দিতে হোল—এমন দূতীকে পাঠানো তো নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনা ভাই!"

যাহক তবুও একটু হাসি নয়ানের মুখেও ফুটল।

আঠারো

ওটা পেশাদারী রূপ পদ্মমণির; নয়তো লোক বেশ ভালোই। দেমাকে ব'লে যে একটু রব উঠে গিয়েছিল সেও পেশাদারী, এইটুকুই হয়ত সত্য যে নয়ান যদি তেমন ভাব, দেখাত তো পদ্মমণিও ঐ মেডেল—বেনারসী—মটরমালার মধ্যে আটকে রাখত নিজেকে। খানিকটা মন-জানাজানি হ'তেই একটু যেন লজ্জায়ই পড়ে গেল। তাই থেকেই একটু বেশ মিষ্টি ব্যাপারও হয়ে গেল! কথা প্রসঙ্গেই নয়ান কতকটা দোষ কাটান্ দেবার জন্যেই বলল—"আমারও মনে হয় গিয়ে একটু বসি ভাই, হয়ে উঠে না; ঝঞ্ঝাটটা তো দেখচেনই…"

পদ্মমণির দৃষ্টি যেন আপনা থেকেই সাজানো গোছানো ঘরটির ওপর একবার গিয়ে পড়ল ; বলল—"না হয় ডাকিয়েই পাঠাবেন।"

"শ্বশুর এয়েচেন যে! আজ শুধু নেই ; শ্রীকৃষ্ণ অপেরার অধিকারীর সঙ্গে পুরনো আলাপ তো।"

"তাহলে নিজেই আসবেন।"

একটু হেসে বলল—"ওটা আমাদের জেনানা ক্লাব তো, ওখানেই বরং জমবে ভালো।"

বিন্দুর কি খেয়াল হোল, বলে বসল—"কিন্তু যাবেন যে, দিদিমণির অমন মেডেল কোথায়?"

হয়তো ভাবল ওকে খোঁচাটুকু দিয়ে নয়ানকে একটু তোয়াজ করাই হোল।

সবাই একটু কিরকম হয়েই গেল। পদ্মমণি কিন্তু এমন ভাবটা দেখাল যেন বাঁচল, বললও তাই—"বাঁচালেন ভাই। এই রইল। ওটা কি জানেন?—মনে হয় ঘটা ক'রে তকমা দেখালে দুটো দিনের গাওনার ফরমাশ যদি আরও বাড়ে।"

মেডেলটা খুলে মুঠোয় রেখে নিল। ওর শেষের কথাটায় একটা হাসি উঠে হাওয়াটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

পদ্মমণি যেমন ক'রে দূতী-সংবাদের ঐ কলিটুকু মুখে করে এসে উঠল তাতে নয়ানের আশঙ্কাটাও হয়েছিল সেও বুঝি বিন্দুর দলে, সত্যিই একটা কদর্য দৌত্যকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে ; হয়তো বা এর জন্যেই তার পলাশবাটীতে আসা। এই কারণেই হতচকিত হয়ে গিয়ে তখন তার ঠিক মতো অভ্যর্থনার ভাষাও জোগালো না, বিন্দুকে ওদিকটা সামলে নিতে হোল। আলাপ-পরিচয় একটু এগুতে ও আশঙ্কাটাও কেটে গেল। বোষ্টমদের রসনা সরস, তাই সুযোগ পেলেই মহাজনদের পদাবলির টুকরা-টাকরা তাদের মুখ থেকে ছিটকে ঠিকরে পড়ে—অত শীঘ্র আপন হ'য়ে পড়তে বা ক'রে নিতে তো আর কেউই পারে না। তারপর একটু কাছের হয়ে গেলেই ওদের সবাই শ্যাম, সবাই সুদাম, সবাই রাই, সবাই দূতী। এটাও ছিল তাই।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কাটল একটা নিতান্তই মধুর পরিবেশের মধ্যে। বিন্দু আশা করেছিল এই সাক্ষাৎকারটুকু কাজে লাগাবে—আর কিছু নয়, ওর মুখ দিয়ে রাজার প্রশংসার দুটো কথাও যদি বলিয়ে নিতে পারে তো তার দামও অনেক। চেষ্টাও করেছিল ঘুরিয়ে কথাটা তুলতে, জুৎ করতে তো পারল না

বরং উল্টো ফলই হোল। প্রসঙ্গটা একটু তুলতেই পদ্মমণি বলল—"আমাদের আর অন্য রাজার কথায় দরকার কি ভাই? আমাদের রাজা নবজলধর শ্যাম, রাণী কাঁচা সোনা—সে তো পেয়েই গেছি এই এখানে; সেখানে এসে দাঁড়াক না দেখি অন্য কোথাওএর রাজা আর রাজরাণী।"

বিন্দু তবুও একটু চেষ্টা করল, বোধ হয় থাবাটা খেল বলেই—মানানসই করেই করল চেষ্টা—নয়ানের দিকে প্রশংসার দৃষ্টি তুলে বলল—"না, রূপ—তাতে আমাদের হারায় কে? দেখলুম তো রাজার অন্দরমহল। আমি বলছিলুম · "

"মহাল, রথ, লোক-লস্করের কথা?···মাফ করো ভাই, তার জন্যে এত ভুগেও বৃন্দাবনের আমাদের আবার সাধ?"

নয়ানের দিকে চেয়ে হেসে বলল—"না ভাই, এই বেশ আচেন—দেখচি তো ঘুরে ঘুরে!"

পদ্মমণি এসেছিল নিদারুণ উত্তাপের মাঝখানে দক্ষিণা হাওয়ার মতো।

মৈনে থেকে যাত্রা পার্টি আসার পর থেকেই, আরও ঠিক ক'রে বলতে গেলে, বিন্দুর মুখে আসার খবরটা পাওয়া থেকেই একটা অসহ্য অবস্থা চলছিল। কি ভাবে শেষ হোত বলা যায় না, তবে ভিখারী অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়ায় সবটুকু সামলে গেল। আজ সকালে রাজার আসা থেকে অবস্থাটা কিন্তু নয়ানের পক্ষে নিদারুণ হয়ে উঠল। শক্তি-সম্পদের চোখ-ধাঁধানো আলোয় নিজের ওপর বিশ্বাস যাচ্ছে টলে, তার ওপর, স্বামী তো ছিলই, শ্বশুর পর্যন্ত ঐ মোহে। গোঁসাই-দাদুর দৃষ্টি পর্যন্ত বিপদের মুখে স্বচ্ছ নয়; বিন্দু তো দৌত্য আরম্ভ করেই দিয়েছে, কে জানে ওদিক থেকে কি ইঙ্গিত, কতখানি প্ররোচনা।

পদ্মমণির সঙ্গটুকুতে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। পেশাদারী এই ধরণের স্ত্রীলোক, ওর সম্বন্ধেই ভয়টা ছিল সবচেয়ে উৎকট; সেই জন্যই ওর সরল প্রাণ আর খোলা ব্যবহারে, ওর নির্দোষ আলাপে কোথায় দিয়ে একটা যেন মস্ত বড় সাহস ফিরে এল। রূপ নিয়ে এও তো প্রশংসা করল, অনঙ্গ-নয়ান দুজনকে ধরেই; কত মিথ্যা, কিন্তু কত নিঃশঙ্ক! মৈনে যেন কতদূরে সরে গেল। তারপর অর্থ-সম্পদের কথা উঠতে ঐ ছোট্ট মন্তব্যটুকু—"না ভাই, এই বেশ আচেন।"

পদ্মমণি চলে যেতে দোরের চৌকাঠে হেলান দিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি ফেলে এই কথাই ভাবছিল নয়ান। বিকেল হয়ে এসে রোদের প্রখরতা গেছে কমে, নিঝুম আখড়াটা আবার প্রাণের স্পন্দনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নয়ান

ভাবছে, এত নিচুতেও যখন এত উঁচু আছে তখন ভয় কি? একটা যেন নিঃশ্বাস-রুদ্ধ-করা কুয়াসা সরে গিয়ে আবার নূতন হয়ে দেখা দিচ্ছে ওর চক্ষে,—নিজের ওপর ভরসাটা আবার দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছে কি করে।...কথায় কথায় নিজের কথা এসে পড়তে পদ্মমণি তখন বলল—"কি জানো ভাই—দয়াল ঘুরিয়েচেন অনেক; ভুগিয়েচেনও অনেক, তবে আমরা হচ্চি কড়া-ক্রান্তি পর্যন্ত বোষ্টোম, যতই ঘোরান্, খুঁটি ধরেই ঘুরব, আমাদের মারে কে? আমাদের হাতে বিষও অমৃত হয়ে যায় যে। আমাদেরই প্রহ্লাদ দেখিয়ে দিলে না?"

অমৃতই হয়ে আসছে সব। নয়ান পারবে। ও-ও তো খোঁটা ধরেই আছে; সব দুর্ভোগ, সব অনর্থের মূল ঐ যে অনঙ্গ তার রূপে কি আর একজনের রূপ দেখে, তার বাঁশিতে কি আর একজনের বাঁশির স্বর শুনেই ও দেয় নি ধরা? সে যদি পদ্মমণিকেও না ভোলে তো নয়ানকেই যাবে ভুলে?

এখান থেকে ঠাকুরবাড়িটা সোজা নজরে পড়ে। রাধারমণের ঘরের কপাটটা দুপুরবেলায় তালাবন্ধ থাকে, অনঙ্গ নূতন চালাটার দিক থেকে এসে খুলে দিল। সূর্য খানিকটা নেমে গেছে, এক ঝলক রোদ বিগ্রহযুগলের গায়ে পড়ে ঝলমল করে উঠল; আজকাল আবার উৎসবের বেশে সাজানো হয়েছে।

নয়ানের ইচ্ছা হোল আজ ঐখানটিতেই গিয়ে বসে থাকে চুপটি করে, মনটি রাধারমণের পায়ে আর চোখ দুটি উৎসব-আয়োজনের ওপর ফেলে রেখে। যাবার জন্যেই ঘর দুটো বন্ধ করে তালা এঁটে সিঁড়ির দিকে এগুবে, দেখে অনঙ্গ হন হন করে এই দিকেই চলে আসছে। অন্যদিন হলে নয়ান নেমেই যেত, চাবিটা ওর হাতে দিয়ে চলেই যেত; আজ কি ভেবে দাঁড়িয়েই রইল।

অনঙ্গ উঠতে উঠতে হেসে বলল—"তালা এঁটেও পাহারায় দাঁড়িয়ে রয়েচিস?...ফিরে যাব?"

নয়ান ঘুরে দরজাটা খুলতে খুলতে বলল—"পাহারা দিয়েও ফল হোল ভারি!"

"পাহারায় থাকলেই কি হোত? দেখ না চেয়ে; বাবাকে পর্যন্ত টেনে এনেচি।...হ্যাঁরে, নয়ান, ঠিক কথা, জিজ্ঞেস করব করব ক'রে হয়ে উঠচে না,—বাবা হঠাৎ কি মনে ক'রে? বলেচে তোকে কিছু? ভাবটা কি?"

"ভাব তো দেখতেই পাচ্চ·"

"এটা তো বাবার ওপরটা, ভেতরটায় কি আছে?"

"ঐ একটি মানুষ যার ভেতর-ওপরে কোন তফাৎ নেই।...তাই তো ভাবি—অমন মানুষের ছেলে হ'য়ে..."

অনঙ্গ ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিল, ঘুরে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—"বাপের মতন হওয়া যায় সব বিষয়ে ?"

"উচিত তো হওয়া।"

"বাবা বলে ওই আমায় বাঁশি শিখিয়েচে···"

দুজনেই একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠল। বেশ খানিকটা জের চলল হাসির, থেমে থেমে আবার এসে পড়ে, একটু দম নিয়ে অনঙ্গ বলল—"হাসচিস্ তো, আমি কেন তাড়াতাড়ি এলুম বল্ দিকিন ?"

"কেন ?"

"বাঁশিটা লুকিয়ে ফেলতে। বাবার গুণ না পাই, বাবার মান রাখতে হবে তো।···শ্রীকৃষ্ণ অপেরার সেই অধিকারী এয়েচে, বাবার মুখে শোনবার জন্যে যদি চেয়ে পাঠায় বাঁশিটা···"

আবার হাসির ওপর হাসির তোড় এসে পড়ল! অনেক দিনই এত হাসি হাসেনি দুজনে; হাসিই নেই মুখে তো এতো আর ততো।

ও ঝোঁকটা কমে এলে অনঙ্গ বলল—"যাক ওসব, গুরুজন; তবে সত্যি ভয় হয়—এত হামড়ে পড়ে বাবা, জ্ঞান থাকে না, কোন্‌দিন অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে তো।···একটা কথা নয়ান, কদিন থেকেই বলব বলব করচি, তা পাওয়াই যাচ্চে না তোকে···।"

"আমি তো ঘরেই। অত বারমুখো হ'লে আর ঘরের লোককে পাওয়া যাবে কোত্থেকে ?"

"বাবা থাকে কি না। ফুরসৎ তো এই সময়টুকু, আর তো দেখচিসই।··· বাবাকে ওদিকে দেখে তাই তাড়াতাড়ি রাধারমণের কপাটটা খুলে দিয়ে আসচি।···একটা কথা বৌ, তুই কি ভাবে নিবি জানি না।···ইয়ে—আচ্ছা এই যে হচ্চে—ফাঁকতালে একটা মোচ্ছবের মতনই তো—মনে করচি একদিন গাঁয়ের লোকদেরও খাইয়ে দোব, টাকা তো রয়েচেই ··তা যা বলছিলুম—তোর কি একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকচে না ?···মানে, কি ক'রে বোঝাই তোকে ? কথাটা হচ্চে—একটা বড় কিছু হচ্চে, অথচ যারা না থাকলে আমোদটুকু পুরো হয় না···"

নয়ানকে যেন বাধ্য হয়েই একবার প্রাঙ্গনের ওদিকে রৌদ্রোজ্জ্বল বিগ্রহের দিকে চাইতে হোল—কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে; কথায় কথায় আজ এত চমৎকার মিল হয়ে যাচ্ছে কি ক'রে!

নরম দৃষ্টিটুকু অনঙ্গের মুখের ওপর একটু লজ্জিত ভাবে তুলে বলল—"তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, ঠিক এই কথাই আমিও ভাবছিলুম—দুটি লোক পড়ে রয়েচে জিরেনে, অথচ কতই বা দূর বলো,—এত যে একটা জাঁকজমক—আজ রাজা পর্যন্ত এসে গেলেন, একথা কি পৌছুবে না তাঁদের কানে? তাই আমিও ভাবছিলুম তোমায় বলব—এই এক্ষুনি মনে করছিলুম, গাড়ি পাঠিয়ে ওঁদের আনিয়ে নোব; মানে, তোমায় বলব আর কি, ব্যবস্থা করতে।"

শুনতে শুনতেই অনঙ্গের মুখের ভাবটা বদলে যাচ্ছিল; বেশ একটু অপ্রতিভ, একটু শঙ্কিত; জিজ্ঞেস করল—"তুই মা আর টগীর কথা বলছিস?"

নয়ান নিজের ঘোরেই রয়েছে, মাথাটা দুলিয়ে বলল—"হ্যাঁ, আর কার কথা বলব?"

চৌকাঠ ছেড়ে চৌকিটার ওপর অনঙ্গর থেকে একটু তফাৎ হয়ে বসল; মুখ তুলে একটু হেসে বলল—"তুমি হয়তো ভয় পাচ্ছ, কিন্তু আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি ঠিক পারব মানিয়ে নিতে—মানিয়ে নেওয়া-নেওয়ি কি, তেমন কোন ব্যাপারই হবে না।...হ্যাঁ, সত্যি, আনিয়ে নাও তাঁদের—সত্যি বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকচে—ঠিকই ধরেচ তুমি, এত হচ্চে-করচে, একেবারে যেন মন লাগচে না। টগর ঠাকুরঝির কথা তো বাদই দাও, অনেক পুণ্যে অমন ননদ পাওয়া যায়, মার কথা—তা দোষটা তো সিদিন আমারই হয়ে গেল..."

অনঙ্গ অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল, ফিরে চেয়ে বলল—"ও-দোষটা তো এখানে পদে পদে হবে..."

"ঘোমটার কথা বলচ তো? অনেক ভিড়, শ্বশুর-শাশুড়ী রয়েচেন—তা না হয় থাকবই আর একটু সাবধান হয়ে। বাবা রয়েচেন ব'লে সে-রকম ধিঙ্গিপনা তো চলচেই না, না হয় এ দুটো দিন একেবারেই ঘোমটা টেনে কনে বৌটি হয়ে বসে থাকব।"

দুজনেই একটু হাসল।

নয়ান বলল—"হাসি নয়। আমি ঠিক পারব, দেখো।...তোমায় তাহ'লে বলি, আর কাকেই বা বলব,—আমার আজ কেমন মনে হচ্চে আমি সব কিছুই পারব, সব—সব। আর না পারলেই বা চলবে কেন বলো, এবার তো এখানকার বাস উঠল..."

অনঙ্গ চকিত হয়ে প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ, তখন চাপা পড়ে গেল কথাটা,—নিয়ে যেতেই এসেচে বাবা?"

"আর কি করতে আসবেন ?"

"বলেচে তোকে কিছু ?"

"বলেননি এখনও ; ফুরসতও তো পাচ্চেন না বলবার।··· হয়তো এও ভাবচেন—এ-রকম গুছিয়ে বসেচে—যদি রাজী না হয়, মিছে খেলো হওয়া··· নিজের আন্দাজের কথা বলচি—তা যদি দেখি তেমন তো নিজেই বলব···"

"পারবি ?"

"খুব, খুব। মনে একটা কথা নিয়ে এয়েচেনই, শুধু মুখ ফুটে বলতে পারচেন না, একটু এগিয়ে দেওয়া···"

অনঙ্গ একটু চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর বলল—"ব্যাপারটা তুই যতটা ভাবচিস তার চেয়ে অনেকখানি শক্ত বৌ—অন্তত হয়ে পড়েচে। তুই যেমন ভেবেচিস মানিয়ে নিতে পারবি তেমনি আমিও পারব ভেবে আর একটা কাজ করে বসেচি। কিন্তু সে একা বাবা রয়েচেন বলেই ; টগীর কথা ধরি না, তবে মা এলে আর কোন মতেই যাবে না মানানো।"

"যাবে ; সে ঝুক্কি আমি নিচ্চি।"

নয়ান সরে এসে মিনতির দৃষ্টি তুলে অনঙ্গর একটা হাত দুহাতে চেপে ধরল। আগেকার মতোই অভিমানে-আবদারে গায়ে এলিয়ে পড়ে বলল—"আমি পারব, বলচি তো পারব—উঃ, কেউ বুঝবে না আমার কথা !"

অনেক দিনের অনেক কথা, তারপর আগেকার মতোই উভয়ের সমস্যা নিয়ে এই নির্ভর-স্পর্শ, হঠাৎ গলাটা ভারী হয়ে এল নয়ানের, এই সময় অনঙ্গ তাকে হঠাৎ একটু ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ল, একটু চাপা গলায় বলল—"বাবা আসচে রে !—আমি এই রান্নাঘরের আড়াল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্চি।"

দাওয়ার এক কোণ দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

ভিখারী এসে ডাকল—"কৈ গো মা আমার !"

কণ্ঠে মধু-ঢালা ডাক ; শ্রীকৃষ্ণ-অপেরার অধিকারীর কাছে খুব এক চোট খাতির নিয়ে এল তো।

মনটা উথলে উঠে নয়ানের চোখে একেবারে বান ডাকল।

"কি হোল !"—বলে অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে ভিখারী একটু চৌকাঠের বাইরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; কি করা দরকার ঠাহর করে উঠতে পারছে না। তারপর মন্থর গতিতে পাশের ঘরের দিকে এগুতে এগুতে কতকটা আত্মগতভাবেই বলল—"মারধোরও শুরু করেচে না কি হতভাগা !"

উনিশ

এমন মিষ্টি ডাক, তার ওপর এই দরদের আশঙ্কা,—ছোট মেয়ের মতোই নয়ানের মনটা আরও উদ্বেল হয়ে উঠল; আর সবই মুছে গিয়ে অনঙ্গর দুর্ব্যবহারের কথাটাই ওর কাছে হঠাৎ এত বড় হয়ে উঠল যে ইচ্ছে হোল ছোট মেয়ের মতোই মিথ্যা সাজিয়ে বলে—"হ্যাঁ বাবা, করেচে আরম্ভ মারধোর, আমি আর এখানে থাকব না।" একটা মস্ত বড় সুযোগও যাওয়ার প্রসঙ্গটা পাড়বার। কিন্তু একটু দ্বিধায় পড়ে দেরি হয়ে গেল; আর মুখ দিয়ে বেরুল না কথাটা। তারপর মনটা আবার একটু সুস্থির হলে টের পেল—খুবই অন্যায় হয়ে যেত।

কিন্তু আর দেরি করাও তো ঠিক নয়। বলব বলব ক'রে কটা দিন কেটে গেল, হাতে আর মাত্র তিনটি দিন বাকি, তাও রাজা এসে দুটো দিন বাড়িয়ে দিলে, তাই। এ তিনটে দিনও কেটে গেলে ভিখারী যেমন হুট করে এসেছিল তেমনি যদি হুট করে চলে যায় তো চিরজীবনের জন্যে সুযোগ গেল নষ্ট হয়ে।

একটা চরম অবস্থার মধ্যে এসে মনটা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছে নয়ানের। ভিখারী একটু নিরিবিলিতে তামাক খেতেই এসেছে, সেজে দিয়ে ঘুরে ফিরে এসে কয়েকবারই কপাটের আড়াল হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কোন মতেই পারল না; আজ কি হয়েছে—যতবারই চেষ্টা করতে যাচ্ছে, ঐ আদর আর আশঙ্কার কথাগুলি মনে ঠেলে উঠে কণ্ঠ যাচ্ছে রুদ্ধ হয়ে, চোখে জল উঠছে উপচে।

পরদিন সুযোগটা পাওয়া গেল; বরং নিজেই গ'ড়ে নিলে বলা ঠিক। দুপুরে খাওয়া শেষ হলে বলল—"আজ আর আপনি এখন বেরুবেন না বাবা; একটু জিরিয়ে নিন।"

"তা মন্দ বলিস নি, শরীলটে অবশ হয়ে আসচে।"

"শরীরের বড় দোষ! এমনি কদিন তো চলচেই, কাল থেকে আবার একবারও চোখের পাতা এক করেন নি…"

"দাসু অধিকারী যে একেবারে পেয়ে বসেচে; কি করি বল্? এর ওপর বলে আপনি নিজের বাঁশি একটা দিন লাগিয়ে; লোকে দেখুক একবার বাঁশি কাকে বলে…কেন, অধিকারী হ'লেও, আমিই কি পাট নিয়ে নামি না তেমন তেমন হলে?"

নয়ান মনে মনে শিউরে উঠে বলল—"অমন কাজ করবেন না বাবা, ব্যানা বনে মুক্ত ছড়ানো,—মস্ত বড় সমজদারের আসর, তাই খোদ আপনাকে বাঁশি বাজিয়ে শোনাতে হবে !···কেন, আজ এই যে মোচ্ছব পড়ে গেচে তার গোড়াতে তো আপনারই বাঁশি বাবা ; লোকে আন্দাজ করে নিক না, যে জিনিসের নকলই এতখানি তার আসলটা কি হওয়া সম্ভব।"

সুযোগটা বেশ ভালো ভাবেই এল। খানিকক্ষণ নিরিবিলিতে তো পাওয়া যাবেই, তার ওপর বাঁশি বাজানোর কথায় শ্বশুরের ফুলে ওঠায়, (হয়তো বা বাজানোর উৎসাহেও) মনটা চাপা হাসিতে এমন ছলছল করছে যে সেই চোখে জল ঠেলে আসার ভাবটা গেছে চলে। এবার থিতিয়েজিরিয়ে বেশ সহজভাবেই তুলতে পারবে কথাটা।

যতক্ষণ তামাক চলল, হোল না ; বড় সামনাসামনি হয়ে যায়—; ভিখারী খাটে শুয়ে পড়লে অন্যদিনের মতো পাশতলায় বসে একটা পা কোলে টেনে নিল নয়ান।

বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে ; একটা 'না' কিম্বা একটা 'হাঁ'—এর ওপরই তো সমস্ত জীবনের গতি করছে নির্ভর। তারপর আরম্ভ করল, তবে অনেকখানি দুর থেকে—

"ঠাকুরঝির বিয়ের কিছু ঠিক হোল বাবা ?"

বাঁশির আলোচনা থেকে একেবারে টগর! পরিষ্কার ভুলেও গিয়েছিল এ-কটা দিনের গোলমালে, বুকটা এমন ছাঁৎ করে উঠল যে খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না ভিখারীর। পাশ ফিরে শুয়েছিল, নিরুত্তর দেখে মনের উদ্বেগেই নয়ান জিভে ঠোঁট দু'টো ভিজিয়ে ডাকল—"বাবা··· ঘুমুলেন ?"

"না।···ঘুম কি এত সস্তা মা যে শুলেই সেই আগেকার মতন চোখ ভারী ক'রে এসে পড়বে ? ঘরে ঐ একটা ধুম্বো মেয়ে—আহার-নিদ্রে-ঘুম সবই গেচে। ঐ জন্যেই তো বেরিয়ে পড়েচি—মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল হয়ে। তোর শাউড়ী বলে—অত উতলা হলে চলে ?"

ভিখারী ঘাড়টা উলটে নয়ানের মুখের দিকে চাইল—

"শুনে থো একবার কথাটা ! ঘরে ধুম্বো মেয়ে, মুখে ভাত উঠচে না, বলে উতলা হলে চলে ?···তাও বলে কে, না, মা-জ্যাঠাই ! পুরুষেরাই বরং নিশ্চিন্দি থাকে।···তাই বেরিয়ে পড়লুম—তবে আর বলচি কি ?—হ্যাঁ, ঐ টগীর জন্যে।

এই দু' হপ্তা ধ'রে এ গাঁ, সে-গাঁ—যেখানে একটু সন্ধ্যান পাচ্চি—কাপড়ে গেরো বেঁধে বেরিয়েচি একটা না ঠিক করে ফিরব না। তা কোথায় ?—বিয়ের ফুল ফুটবে তবে তো। শেষ কালে মনে করলুম—পলাশবাটী তো আমাদের বোষ্টমদের বড় আড্ডা, দেখি না সেখানে যদি একটা ভাল সন্ধান-টন্ধান যায় পাওয়া,—আর তোদেরও কতদিন হোল দেখিনি—আসব আসব করে হয়েই উঠচে না আসা—তা দেখ না, এখানে এসেও এক হিড়িকের মধ্যে একেবারে…"

"আমাদের কপালজোরে এসে পড়লেন তাই তো হিড়িক সামলালো বাবা, নইলে…সে দেখেছিলেনই তো।…গোসাঁই-দাদু বলেন—এসব রাধারমণের টেনে আনা—তাঁর নিজের কাজে…"

ভিখারী আবার পাশ ফিরে শুলো—

"তা বেশ তো, রাধারমণ যেমন টেনে এনেচেন তেমনি দিন জুটিয়ে একটা, তবে তো বুঝি।"

"দেবেনই ; তার জন্যে তাঁর এমন কিছু দুর্ভাবনাও নেই। ঠাকুরঝির মতন মেয়ে—ঐখেনেই তো আমাদের অদ্দেক কাজ এগিয়ে রেখেচেন বাবা ; বলুন না।"

ভিখারী যে চুপ ক'রে রইল তার কারণ নিশ্চয় এই যে এত মিথ্যে ঠেলে জিরেনের নিদারুণ সত্যটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—এই নিষ্ফল বিলম্ব—শঙ্করীর সেই প্রলয়ঙ্করী মূর্তি…

চুপচাপই গেল খানিকটা। রাস্তা আরও পরিষ্কার হোল, তবু কিন্তু মোক্ষম প্রশ্নটা মুখ দিয়ে যেন বেরুতে চায় না। তারপর, আবার ঐ অবলম্বন ধ'রেই—"একটা কথা বলছিলুম বাবা…"

দু'হাতে পায়ের পাতাটা চেপে ধরেছে।

"বল্, আমায় বলবি তার জন্যে আর অত ইয়ে কেন ?"

"ঠাকুরঝির বিয়েতে আমি যাব…আমায় নিয়ে যেতে হবে…"

ভিখারী একেবারে ধড়মড়িয়ে উঠে ঘুরে বসল, নিজের চক্ষু-কর্ণ কোনটাকেই বিশ্বাস করতে পারছে না, জিজ্ঞেস করল—"তুই যাবি মা !!—জিরেনে !…তাই যেন বললি না ?"

নয়ান অনেক কষ্টে নিজেকে রাখল সামলে, তবু টস্‌টস্ ক'রে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লই। আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বসে রইল ; একেবারে ভেঙে পড়বার ভয়েই কোন উত্তর দিতে পারল না। ভিখারী বলে চলল—

"তা যদি বললি মা তো আমি যে টগীর বের জন্যে গা করি না, গা করি না—তোর শাউড়ী টিক্-টিক্ করচে চোপর দিন—তা কার জন্যে করব বল?—বাড়ি যে আমার ফাঁকা—আমার নিজের ঘর ভরলে তবে তো অপরের ঘর ভরিয়ে সুখ মা। তা বুঝবে তোর শাউড়া? এই দেখ না, এবার কি রকম লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিকিরী মণ্ডল ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে আসে শালার ব্যাটা শালাকে—করবে না বিয়ে! টগী আমার ফ্যালনা মেয়ে, নয়? পাঁচখানা গাঁয়ের মোড়ল আমি, কুলীন, একটা হাঁক দিলে ছুটে আসবে শালারা বিয়ে করতে—ছেলে নিয়ে এসে পায়ে যদি লুটিয়েই না পড়ে তো আমার নাম জিরেনের ভিকিরী মণ্ডল নয়! য়্যাদ্দিন করচিনে, করচিনে…তাও কেন বল না?—কার জন্যে করব?…তাহ'লে যাবি তুই—হ্যাঁগা!—যাবি টগীর বিয়েতে?"

আবার সহজ হয়ে এসেছে কথা বলা। সেই হাসি কোথায় যেন একটু ছলছলিয়ে ওঠেই কথার অসঙ্গতিতে, কিন্তু কত আপনা-ভোলা হলে সম্ভব হয় এটুকু?…হাসি অশ্রু দুটোতেই মিশে গিয়ে একটা অপূর্ব অনুভূতিতে মনটা ভরে দিল নয়ানের। চোখের জল ঠেলে আসচে, ঠোঁট কামড়ে কোন রকমে রেখেছে ঠেলে। মুখে কিছু বলতে পারছে না, তবে এক-একবার পা'টা যে দু হাতে চেপে ধরছে তাইতেই যেন অন্তরের অনুতাপটা প্রকাশ করে দিচ্ছে—কত অপরাধই না করেছে এতদিন এই পায়ে।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। দুজনে দুজনের চিন্তা নিয়ে রয়েছে। এত সুবিধা নয়ান আর ছাড়বে না, এত সহজ যখন বলা তখন সব কথাই বলবে; শুধু একটু সামলে নিচ্ছে নিজেকে।

এক সময় মনটা বেশ হালকা হয়ে এলে তুলল আবার প্রসঙ্গটা—

"তাহ'লে আমি বলছিলুম বাবা, আপনি যখন ঠিকই করে নিয়েচেন এবার দেবেন বিয়ে—আর আপনার একবার ঠিক ক'রে ফেললে হবেও না দেরি, এ আমি জানি—তা হলে আমি বলছিলুম, এদিকেও আর দেরি করা কেন? আমার যাওয়ার কথা বলছিলুম, তোড়জোড় করতে হবে তো বাবা—আপনাদের ঐ একটি মেয়ে, তা ছাড়া গাঁয়ে আপনাদের কি রকম মর্য্যোদা…"

ভিখারী না ঘুরেই একটু ধমকের সুরে সুধরে নিলে—"সাতখানা গাঁ নিয়ে…"

"তারও বেশি বাবা, নিজের যশ-মর্য্যোদার কেউ খবর রাখে না… তাই বলছিলুম, সেই হিসেবে তোড়জোড় করতে হবে তো। তা মা তো ঐ একলা

মানুষ, ঠাকুরঝি তো নিজের বিয়ের বাটনা নিজে বাটতে পারবে না, বলুন; তাই বলছিলুম আর দেরি ক'রে কি হবে? এই হিড়িকটা চুকে যাক, তার পরেই বেরিয়ে পড়ি আমরা...”

“দাসু-অধিকারী যে ছাড়তে চাইচে না, নইলে আজই বেড়িয়ে পড়তুম, যাত্রা নিয়ে কি পড়ে থাকলে চলে?—ঘরে একটা ধুম্বো মেয়ে—বল্ না...”

“কথাই তো। তবে আপনি গেলে—মানে আমায় সুদ্ধু তো নিয়ে যাচ্চেন, ইদিকে সবাই আতান্তরে পড়ে যাবে। কাজের সামনে তাও ধরি নে বাবা, সামলে নিতই সবাই একরকম ক'রে, কিন্তু নিজের পায়েই যে কুড়ুল মেরে বসে আচেন আপনি—কুমারবাহাদুরকে নেমন্তন্ন ক'রে।”

“কি করতুম তাই বল্? না ক'রে কোন উপায় ছেল?”

“ছিলই না তো, বাড়ি বয়ে এয়েচে একটা লোক কিন্তু জড়িয়ে তো পড়লেন। তাই বলচি—মিটে যাক্ হাঙ্গামটুকু, তারপরেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। ...একটা কথা বাবা, আপনি এ হাঙ্গাম আর বাড়াবেন না, সে কুমার-বাহাদুর বলুক আর যেই বলুক্। পরশু আসবে বলে গেচে—থাকবে সেই রকম ব্যবস্থা, এল ভালো, না এল, তুমি রাজা আচ তো নিজের ঘরে আচ—আমার ঘাড়ে একটা ধুম্বো মেয়ে, তোমার খাতিরে আমি এখানে পড়ে থাকতে পারি না ছেড়েছুড়ে।...ভুল বলচি বাবা?”

ভিখারী যেন রাজার তোয়াক্কা না করেই ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসল। বলল—“তুই এক ছিলিম তামাক সাজ দিকিন।”

তামাক সাজতে সাজতে আড়চোখে কয়েকবার দেখল নয়ান। হাঁটু দুটো মুড়ে দু' হাতে জড়িয়ে বসে মাথাটা নিচু করে আস্তে আস্তে দুলছে ভিখারী। মুখটা কি এক সংকল্পে কঠিন, কিন্তু এও নয়ানের দৃষ্টি এড়ালো না যে সেই মুখের ওপর থেকে থেকে কিসের যেন একটা ছায়া এসে পড়ছে, রেখাগুলো ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ যেন নরম হয়ে যাচ্ছে। অন্তর্দ্বন্দ্বটা কোথায় সেটা আর বুঝতে বাকি নেই নয়ানের। হুঁকোটা হাতে নিয়ে টানের সঙ্গে আরও যেন বেশি অন্যমনস্ক। নয়ান কিন্তু ঠিক করে ফেলেছে নিজের মন—কোন অন্তরায়ই আর দাঁড়াতে দেবে না সামনে—দাঁড়াতে দিলে যে ওর আর চলবে না।

একটু বাইরের দিকে গিয়ে নিজেকে বেশ সামলে নিয়ে একটু পেছন ঘেঁষে শ্বশুরের পাশে বসল, তার পরেই ছোট মেয়ের মতো পিঠে লুটিয়ে পড়ে বলল—“বাবা, আমি পারব।”

ভিখারী চকিত হয়ে হুঁকা থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল, প্রশ্ন করল—"কি পারবি ?…পারবার না পারবার কথা কি হয়েচে ?"

"আপনি মা'র কথা ভাবচেন—ঢুকতে দেবেন কি না দেবেন আমায়। আমার কিন্তু সে ভাবনা একেবারেই নেই আর বাবা। আমি পা জড়িয়ে ধরলে তাঁর সাধ্যি কি আমায় ঝেড়ে ফেলেন ? একটা কুকুর গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকলে তাকে তাড়ানো যায় না, আর আমি তো তাঁর ঘরের বৌ। দোষ বুঝি নি, ঘরের বৌয়ের মতনটি হয়ে থাকতে চাই নি, তিনি সাজা দিয়ে আমার চোখ খুলে না দিলে কে দেবে বাবা ? আমি জড়িয়ে পড়ে থাকব দুটি পা, বলব, একটু ঘোমটা টেনে থাকা তো অল্প কথা মা, যতদিন তোমার দাসী তোমার মনের মতন হয়ে তোয়ের না হচ্চে তাকে তুমি ঘরে শেকল দিয়ে রাখো ; বেঁধে রাখো, যে সাজা দেবে দাও…"

চেষ্টা করে করে ও সংযম হারিয়ে ফেলেছে, আর অশ্রু সংবরণ করতে পারল না, শ্বশুরের পিঠে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হুঁকোর টান দ্রুত হয়ে উঠেছে ভিখারীর, যতই লুকাক সমস্যা তো এই-টুকুই ছিল—ঐ শঙ্করী নিয়ে। হালকা হয়েছে মনটা ; একটা হাত বধূর পিঠের উপর গিয়ে পড়েছে, আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিচ্ছে ভিখারী, কিন্তু কিভাবে যে কথাটা বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। শেষে শঙ্করীকে উদ্দেশ করেই চটে উঠল—"না, দেবে না ঢুকতে—মাংনা ! আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চি, বলে ঢুকতে দেবে না ! ওর বাপের বাড়ি থেকে ভিটে তুলে নিয়ে এসেছিলো ! অষ্টপহর ঘোমটা টেনে থাকতে পারে মানষে ! ও কতখানি ঘোমটা টেনে থাকত—যাাখন কচি বৌ এসে শ্বশুলবাড়ি উঠল ? আর কেউ না জানুক ভিকিরী মণ্ডল তো মরেনি—জিগোই, ও নিজে কতখানি ঘোমটা টেনে থাকত চোপরক্ষণ ?…তা বেশ, ঘোমটা ঘোমটা বাই, তুইও তেমনি একগলা ঘোমটা টেনে ঘেরাটোপ দেওয়া গাড়ি থেকে নামবি—সাত চড়ে কথা কইবি নি—ও নিক কত ঘোমটা চাই ওঁর…"

"আমি একেবারে ঘেরাটোপ দেওয়া গাড়ি থেকে বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে নামব বাবা…ঘাট মানচি আমি।"

এরপর ধীরে ধীরে কথা বেশ সহজ হয়ে এল, এক এক করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার সমস্ত কথাই বলল নয়ান—পলাশবাটীর এতবড় সম্পত্তিটা এখন তো ওদেরই—নয়ান তো অনেক আগেই জিরেনে ফিরে যাবে ঠিক করেছিল—

বাব'-মা ছেড়ে যাওয়ায় সম্পত্তির বিশৃঙ্খলা দেখেই না থেকে যেতে হোল—ওঁদের ছেলেকে ও সেইজন্যেই তো ছাড়লে না—এত বড় একটা সম্পত্তি হাতে এল, কোথায় নিজের জিনিস বুঝে-সুঝে নেবে—না, সেই জিরেনে গিয়ে বাঁশি— বাঁশি —আর বাঁশি···এখন, বলতে নেই, সে ভাবটা অনেকটা কেটেছে, তবে এই যে নূতন উপদ্রব, মৈনের জমিদার—বড় লোক, ওদের কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকতে হয়···নয়ান ঠিক করেই ছিল, আর নয় এখানে—এমন সময় দৈবের খেলা, বাবা এসেই গেল।···এইবার ব্যবস্থা এমন পাকা করে ফেলেছে নয়ান যে জিরেন থেকেই যাওয়া-আসা ক'রে দিব্যি সব সামলে রাখা যাবে— কতই বা দূর ?—ওখানে নেয়ে এখানে এসে ভাতে বসা যায়···

আরও কথা সব···

"একটু শোবে না বাবা ?"

"ঘুম আসে ?—তুই বল্ না।·· এত বড় সম্পত্তিটা ; তুই বলচিস সামলেচিস, কিন্তু মেয়েছেলে তুই সামলাবিই বা কতটুকু ? আর জানিসই বা কি সামলাবার ? ···তারপর, হ্যাঁ, দুদিন বসে একটু থিতিয়ে জিরিয়ে দেখে নেব তারও উপায় নেই—নেহাত একটা হ্যাঙ্গাম করে বসেচি কুমারবাহাদুরকে নেমন্তন্ন ক'রে, নইলে আজ চলে গেলেই হোত—বিয়ের তোড়জোড়টা গিয়ে আমাকেই করতে হবে তো, না তোর শাউড়ী করবে, বল্ ?···মুখে দড়ো সবাই, ঢের দেখেচি।··· তা ইদিকে সম্পত্তিটা দেখেশুনে একটু ঠিকঠাক ক'রে নেওয়া, কাল বাদে পরশু কুমারবাহাদুরের হিড়িক—খালাস হয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোট্ জিরেন—ঘুম আসে, বল্ না মা ?···একবার ছিলিমটা বদলে দে। আর শোন্, বলি···"

এত অন্যমনস্ক হয়ে গেছে যে হুঁকার মাথা থেকে যে কলকেটা তুলে নিয়েছে নয়ান, সে হুঁশ নেই। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে গোটাকতক টান দিল, তারপর বলল—"বলি কি, দাসু অধিকারী বাঁশি বাঁশি করে বড্ড যেন ফ্যাচাখেউ লাগিয়েচে—তা ··অব্যেস নেই তবুও বাজিয়েচি তো একসময় নইলে নঙ্গা-বেটা পেলে কোথায় ও-জিনিস ?—তাই বলছিলুম, য্যাখন এতই জিদ ধরেচে···"

হালকা মনে হাসিটা হঠাৎ এত জোড়ে ঠেলে আসছে যে নয়ান বুঝি আর টাল সামলাতে পারবে না ! "হুঁকোটা দিন বাবা, জল ফিরিয়ে আনি।" বলে কতকটা যেন ছিনিয়ে নিয়েই তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। খুব সন্তর্পণে মুখে কাপড় গুঁজে খানিকটা চাপা হাসি হেসে নিয়ে সহজ

গলাতেই একটু অনুযোগের স্বরে বলল—"তামাকটা সেজে আমি খুঁজচি বাবা। কিন্তু পাব কি?—এই হিড়িকে কোথায় রাখতে কোথায় রেখেচে—আচে কি গেচে তারই ঠিক কি বাবা? দেখচেনই তো কি রকম ঢিলে-ঢালা বেহিসেব মানুষ…"

কুড়ি

একটানা আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে একটা; নয়ান একেবারেই গা ভাসিয়ে দিয়েছে তাতে! ভিখারী আসা থেকেই প্রবাহটা আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তবু তাতে মাঝে মাঝে দ্বিধা সন্দেহের আবর্ত ঘুরপাক খেয়ে উঠছিল বৈকি—কেন এল খামখেয়ালী মানুষ, শুনবে কি শুনবে না। এখন স্রোত একেবারে তরতরে—ঋজু, অনাবিল, অবিরাম।‥ শুধু যারা বড় ভুগেছে তাদের বড় সুখে যে এক-একবার অবিশ্বাস জেগে ওঠে তারই একটু-আধটু ঘূর্ণি এসে পড়ছে মাঝে মাঝে। তা সে কিছু নয়; দাঁড়াতে পাচ্ছে না।

অনঙ্গ শুনে বলল—"বড্ড ভালো হোল বৌ। বাবার মনটা যে তুই এমন করে গলিয়ে দিতে পেরেচিস, সত্যি বড্ড ভালো হোল।…আমি এর মধ্যে একটা কাণ্ড করে বসেচি কি না।"

নয়ান স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখের পানে চাইল।

"তোকে তখন বলতে বলতে বাবা এসে পড়ল না?—বলা হোল না তাই। আমোদ-আহ্লাদে নিজের লোক কাছে না থাকলে কেমন যেন তার পাওয়া যায় না—বলছিলুম তো তোকে? তুই মনে করলি মা আর টগীর কথা বলচি—আমি কিন্তু তা ভেবে বলে নি। অবিশ্যি ওরা এলে আরও ভালো, কিন্তু সে তো হবার নয়। মা আসবেই না, আর টগীকে যে আসতে দেবে তার কোন আশাই নেই। তাই ওদিকটা আমি ভাবিই নি, আমি ভাবছিলুম · বেশ, তুই-ই বল দিকিন কার কথা ভাবছিলুম?"

নয়ান হয়তো করেই থাকবে আন্দাজ, তবু একটু ধোঁকায় পড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল—"আর কার কথা তবে?"

"নে, খুব ভাজ দেখচি তাহলে তুই! অথচ ও বেচারী বৌদি বলতে অজ্ঞান। আমি ভাবছিলুম ভূষণোর কথা…"

নয়ানের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, উৎসুক কণ্ঠেই প্রশ্ন করল—"তারপর ?"

"ভেবে দেখ্ না, ওরই জন্যে কুমারবাহাদুরের কাছে এত খাতির আমার, আর ওই নেই—মনটা কেমন আনচান করে না ?—মৈনে থেকে আমাদের সঙ্গেই তো আসবে, তা হঠাৎ জিরেনে কাজ পড়ে যেতে বলল—'তোমরা এগোও নন্দদা, আমি তাড়াতাড়ি সেরেই ওদিক থেকে আসচি।'···তারপরে কেন যে আসতে পারচে না তার কারণটা তো বুঝচি—টের পেয়েচে তো বাবা এখানে—তা আমি কপাল ঠুকে খবর দিয়েই পাঠালুম তাকে—বাবার মনটা তো ভালো দেখচি···"

"এয়েচে ঠাকুরপো ?"

"এয়েচে ; আজ সকালে···"

"তা আচে কোথায় ?"

অনঙ্গ মিটি মিটি হাসতে লাগল মুখের দিকে চেয়ে।

নয়ান অধৈর্য হয়ে রাগের ভান করে বলল—"হাসচ!···কোথায় আচে, খেলে কোথায় ?"

"লক্ষ্মণের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেচি। ভাবচি ডেকে তো আনলুম, কিন্তু···"

"লক্ষ্মণের বাড়িতে! কৈ, সোনা তো আমায় কিছু বলে নি ; না সোনা, না লক্ষ্মণ!"

"ওদের বারণ করে দিয়েছিলুম—এখন যেন জানাজানি একেবারে না হয়। আগে হালচালটা বুঝি ভালো করে।"

"ও! ও-পোড়ারমুখীকেও দলে টানা হয়েচে! আসুক, তারপর বের করচি ওর দল-পাকানো। তাই তো বলি—আসচে আর টুপটুপ করে চলে যাচ্চে, ব্যাপারখানা কি! লক্ষ্মণটাকে ঘেঁষতেই দেয়নি ইদিকে চোপোর-দিন।···রোস!"

হঠাৎ ভীতভাবে মুখের দিকে চেয়ে বলল—"হ্যাগা, তা কি জন্যে বাবাকে ভয় এত তা সোনাকে লক্ষণকে বলোনি তো ? ওরা জানে, আমরা মন্দিরতলায় এসেছিলুম, বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে, এসে দেখি তাঁরা নেই, আখড়া খালি, তাই থেকে গেচি।"

"তা কখনও বলি ? ওদের বলেচি ভূষণো এয়েচে টের পেলেই অধিকারী একটা পাট গছিয়ে দেবে—বাবা রয়েচে, ও সেটা চায় না। রাত্তিরে চুপি চুপি

গিয়ে ভিড়ের মধ্যে একপাশে বসে ঢপ, যাত্রা শুনবে, দিনমানে একটু গা-ঢাকা দিয়েই থাকবে এ-কটা দিন—কাউকে যেন না জানতে দেয়।”

নয়ান ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে বলল—“নয়ানকেও নয়! অথচ ‘খুব ভাজ তো’ বলে খোঁটাটুকুও দেওয়া আচে। কী খেলে বেচারী, কী না; একটু রেঁধেবেঁধেও তো পাঠিয়ে দিতে পারতুম।·· না বাপু আমি চললুম, নিজেই ধরে নিয়ে আসচি···”

“বাবা···”

“এক কথা একশ’বার বোল না বাপু। বেশ, আমি বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চি, তাহলে হবে তো? তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো। বাবাকে তুমি চেন না···”

একটু হেসে বক্র কটাক্ষে চেয়ে বলল—“চিনবে আর কোথা থেকে? চিরটা কাল তো জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খেলে···”

“তা বলবি বৈ কি, তুই আর বলবি না?”

দুজনেই হেসে উঠল।

অনঙ্গ বলল—“বাজে কথা থাক্, সত্যিই আনাবি ডেকে? বুঝচিস সেই রকম?”

“ওমা, আনব না?···আর শুধু বাজে কথাই নয়, কাজের কথাও আচে।”

মুখের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগল। অনঙ্গ বলল—“আবার কি? এই তো একটা মস্ত বড় কাজ, অবিশ্যি যদি পারিস। সব গোলমালের জড়্ই মেরে দেওয়া হবে তো।”

নয়ান হেসেই যেতে লাগল সেইরকম; মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল—“আচে, আচে, সে এখন বলচি নে। আর সে কাজের কাছে এ কাজ?···হদ্দ এইটুকুই বলতে পার যে এটা তার গোড়াপত্তন—”

“তবু বল্ না, শুনি।”

“উঃ, উনি আস্থায় বড় বলচেন সব কথা! ঠাকুরপোকে এনে, উপোস করিয়ে রেখে···”

অনঙ্গর কথার প্রতিধ্বনি করে বলল—“বাজে কথা থাক্।···আমি সত্যি চললুম ঠাকুরপোকে ডেকে আনতে। নালিস করে বলতেও পারব—দেখো ভাই, আমার দোষ নেই, তোমার দাদা এই মাত্র বললে—সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেচি, যদি রাগ ক’রে থাক···”

দাওয়ায় বেরিয়ে পা বাড়িয়েছে, সোনা রান্নাঘরের দেয়ালের পেছন থেকে হনহনিয়ে বেরুল ; আজ দুদিকে সামলাতে হচ্ছে বলে যাওয়া-আসা এই রকম চলেই। হেঁট হয়ে আসছিল, নয়ান বলল—"হ্যাঁলা, তুই আমার দেওরকে ঘরে লুকিয়ে রেখেচিস যে বড়! কলঙ্কের ভয় না থাক্, আস্পদ্দাটা তো…"

সোনা হাত নেড়ে একটু ঝেঁজেই উত্তর করল—"আস্পদ্দা নয় গো ঠাকরুণ, কলঙ্কই। কেষ্ট তো রাধিকেকে গচ্ছিৎ রেখে এল, বলে লুকিয়ে রাখ, চাপাচুপি দিয়ে। তা থাকে কখনও?—পালানে কেষ্টর পালানে রাধিকে, কখন্ একটু চোখ ফিরিয়েচি আর সটকে পড়েচে ··এখন খোয়া মালের দায়ে গুনোগার দিই কোথা থেকে তাই বলো…"

অনঙ্গ আছে জানে না, গরগর করতে করতেই এগিয়ে আসছিল, অনঙ্গ ঘর থেকে নয়ানকে বলল—"ওরে, ও নৌকো নিয়ে বাচ খেলতে যাবে বলেছিল —ইদিকপানে তো আসতে পাচ্চে না·· "

সোনা মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে সিঁড়ির নিচেকার ধাপটায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, চাপা গলায় বলল—"এ কেমন্ বাচখেলা বুঝিনে, সন্ধে হয়ে এল, উদিকে নদীতে আজ ঢল নেমেচে ··"

নয়ানের মনে যে কথাটা সব চেয়ে ওপরে ছিল সেইটেই প্রকাশ করে বলল—"তুই কিন্তু আজ রাত্তিরে ওর রান্না করবিনে, খবরদার বলচি!"

সোনা শিউরে উঠল, বলল—"ওমা, কেন? এ আর এমন কি অপরাধ যে ভাত বন্ধ করে দিতে হবে একেবারে। চোরের মতন ঘরের কোণে আটকে রাখা, তার ওপর খাওয়া বন্ধ—ডেকে এনে একি হ্যানস্তা।"

আজ হাসি যেন বুনো ফুলের মতো যেখানে-সেখানে ছড়ানো। নয়ান পারবে, প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করছে কি যেন ওকে সেইসঙ্কল্প, সেই সার্থকতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

অনঙ্গকে বলল—"না বাপু, পরের ছেলে, ডেকে আনা হয়েচে, নদীতে ঢল নেমেচে শুনে আমার যেন গা ছমছম করচে, তুমি ধার দে ধার দে গিয়ে না হয় দেখো, কদ্দূর গেল ; ডেকে আনো।"

সরিয়ে দিল অনঙ্গকে। নদীর ঢলের মতোই, ভূষণের ওপর হঠাৎ একটা স্নেহের ঢল নেমেছে ওর মনে। তা ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ীর পরে ওই তো এখন প্রধান্ অন্তরায়, ওকে নিয়ে কৌতুক-কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠেছে,—কি খেলে,

কি বললে, কি ভাবছে, কি করবে! এর ওপরও একটা কথা আছে যার জন্যে ভূষণের আলোচনা ওর কাছে ক'দিন থেকেই বড় মিষ্ট হয়ে উঠেছে, কি ভাবছে, কোথায় কাকে কি বলেছে তাই থেকে কথা, ভাব, ভঙ্গি খুঁটে খুঁটে ওর মন জানতে চায়।...সোনাকে ডেকে নিয়ে চুলের গোছটা পিঠে এলিয়ে দিয়ে বসল; বলল—"দে দিকিন চিরুনি দিয়ে একটু টেনে।"

সন্ধ্যার পর রাধারমণের শেতলের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আবার এমন জড়িয়ে পড়ল যে এদিক'কার কথা ভাববার অবসর পেল না। জড়িয়ে পড়ল ইচ্ছে করেই। দুটো দলের খাওয়ার আয়োজনটা ঠিক চলছিল, তবে গতানুগতিক ভাবে; প্রসাদকে ডেকে বলল—"ও পেসাদ-কাকা, কুমারবাহাদুর খাওয়া-দাওয়ার জন্যে এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে গেচেন; সেই থোড়বড়িখাঁড়া খাঁড়াবড়ি-থোড় না করে দুটো ভালোমন্দ তরকারির ব্যবস্থা করো বাপু; আমিও রইলুম ইদিকেই।"

প্রসাদ বলল—"একটা ছুতো করে দিয়েচে টাকাটা..."

বুকটা একটু ছাঁৎ করে যে না উঠল এমন নয়, কিন্তু কথাটা মোটেই গায়ে মাখল না নয়ান। ওর কাছে আজ যেন সবাই ভালো, সব কিছুই ভালো, বলল—"তা হোক, দিয়েচেন তো ঐ বলেই। তুমি দেখো।"

একটু প্রশংসাও জুড়ে দিল—"অতবড় একটা লোক, অমন উঁচু মেজাজ, উনি যেটা মুখে বলে দিয়েচেন সেইটেই ধ'রে বসে থাকি না কেন আমরা?"

বাড়িতে আজকাল সোনাই রান্নাবান্না ক'রে, তাকে ডেকে বলল সেই যেন ভূষণকে ডেকে যত্ন ক'রে এখানেই খাইয়ে দেয়, লক্ষ্মণকে দিয়ে খবর দিলে নয়ান নিজেও আসবার চেষ্টা করবে। লক্ষ্মণ গিয়ে যখন খবর দিল সোনা তখন নিজে দাঁড়িয়ে পদ্মমণি আর তার দলের সবাইকে খাওয়াচ্ছে, বলল, "খাওয়া হয়ে গেলে যেন একবার ঠাকুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেয়, বলবে, বিশেষ দরকার।"

পরদিন সকাল থেকেই রইল মেতে। শুধু একলা নয়; উঠেই প্রথমে তো ভিখারীকে তুলল মাতিয়ে। বলল—"বাবা, নেমন্তন্ন তো করে বসলেন—জানতুমই আপনি না করে পারবেন না, কিন্তু লোকটা তো যে-সে নয়, সে কথা ভেবে দেখেচেন?"

ভেবে কতটা দেখে শ্বশুর তা জানেই তো; নিজেই বলল—"ভেবে সে

দেখেননি অবিশ্বি তা বলচিনে, তবে আপনি বোধ হয় মনে করেচেন হাঙ্গামের ওপর আবার হাঙ্গাম বাড়ানো কেন? কিন্তু সেকথা ভাবলে চলে বাবা? মানুষটা যে-দরের তার মতন করে আবার ব্যবস্থাটুকু করতেই হবে তো। তাতে আমাদের ঘাড়ে আর একটু চাপ পড়বে, তা কি করা যায় বলুন?—পলাশবাটীতে এই প্রথম দেশের রাজা এল, তার ওপর আপনি নিজে রয়েচেন; আমি বলছিলুম বাজনা-বাদ্যি আর এখন পাওয়া যাবে কোথায়—শহরে লোক ছুটিয়েও হবে না সে ব্যবস্থা—তবে রং-বেরঙের কাগজের পতাকা শেকল ফুল-পাতা দিয়ে সমস্ত আখড়াটা ভাল করে সাজানো, রাস্তার খানিকটা পযন্ত ভালো করে জল ছিটিয়ে ধুলোটা মেরে দেওয়া—এটুকুর ব্যবস্থা করে দিতেই হবে আপনাকে। আর, হ্যাঁ, বাঁশের বাতা চিরিয়ে দুটো গোল ম্যারাপ লাল শালু আর দেবদারু পাতা দিয়ে মোড়া, একটা একটু এগিয়ে রাস্তার মোড়টার ওপর, আর একটা আখড়াতে ঢুকতেই। আমি ইদিকে দুধ আনিয়ে খাবারের দিকটা দেখি, খান না খান সামনে ধ'রে দিতে হবে আমাদের, সাজিয়ে-গুজিয়ে। আর রাধারমণের পেসাদ বলে ধ'রে দিলে 'না' বলতে পারবেন আপনার কুমার-বাহাদুর—বলুন না বাবা?"

করবার লোক অবশ্য প্রসাদ, শ্বশুরকে শুধু সামনে এগিয়ে দেওয়া; প্রতি-দিনের একটা কর্মব্যস্ততা লেগে আছেই আখড়ায়, তার ওপর এই নূতন উদ্যোগে সারাদিন যেন কারুর নিঃশ্বাস ফেলবার জো রইল না।

নয়ানের খাবার তোয়ের ক'রে উঠতে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। সাহায্যের জন্য সোনাকে আটকে রেখেছিল, শেষ হলে একটা রেকাবিতে এক-একখানা ক'রে তুলে রেখে বলল—"এবার এক কাজ কর দিকিন, শ্বশুর কি করচেন দেখ, ডেকে আন, বলবি একটু জল খেয়ে নিতে ডাকচেন।"

সোনা বলল—"আগে শেতলে উচ্ছুগ্‌গু ক'রে দেবে নি?"

"তোকে যা বললুম তাই করনা। আমি ওর জন্যে আলাদা করেই করেচি ও-গুলো। বুড়ো মানুষ, শেতলের পর এত দেরি করে খেলে রাতের খাওয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে।...তুই যা—নিজের শ্বশুরকে খাইয়ে দিলে, আমায় দিলে না,—রাধারমণ অত হিংসুটে নয়।"

সোনা নেমে দু'পা এগিয়েছে, ডাকল, বলল—"ওরে শোন, সমস্ত দিন একঠায় বসে বসে গা'টা বড্ড ম্যাজ ম্যাজ করচে, ঘিনঘিনও করচে একটু—এক ন্যাগাড়ে ক্ষীর, সর, ছানা ঘাঁটা তো'। আমি এক কাজ করি, নদী

থেকে একটু গা ধুয়ে আসি, তুই বোস ; ফিরি তখন ডেকে দিবি। আমি এলুম বলে।”

খেয়া ঘাট থেকে একটু স'রে মেয়েদের নাইবার ঘাটটা। কালকে যে ঢল নেমেছিল সেটা বেরিয়ে গেছে, নদীর জল বেশ তরতরে, নয়ান কোমর-জলে নেমে গা ডুবিয়ে বসে রইল। এদিকে কয়েকদিনই নদীতে আসতে পারে নি বলে ওদিক'কার কোলাহলের গায়ে এই নিরিবিলিটুকু লাগছে চমৎকার। সামনে ভিড় নেই বলেই মনের ভেতর থেকে কত ছবি, কত মুখ বেরিয়ে এসে চোখের ওপর ভেসে ভেসে উঠছে, মন্দিরতলার আগের সেই মুক্ত জীবন থেকে। দু'একটা ছবি, দু'একটা মুখের ওপর নজর যেন আটকে আটকে যাচ্ছে।...অনেক দূরের একটি ছবি, সময় হিসাবেও অনেক দূরের, নয়ানের বয়স তখন কতই বা হবে?...বাবা-মা'র সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে।...নদীর তীর, এইরকম একটি সন্ধ্যা, সদ্য-ডুবে-যাওয়া সূর্যের রাঙা আলো আকাশ রঙিয়ে নদীর জলে এসে পড়েছে। অনেক নদীর তীরের অনেক সন্ধ্যাই ভিড় করে আসছে, তবু তার মধ্যে একটি—এইটি আলাদা। বৃন্দাবন, যমুনার তীর ; আর—হয়তো বৃন্দাবন আর যমুনার তীর বলেই একটি মুখ বড় ভালো লেগেছিল।

ভালো লাগায় কি কোনও দোষ আছে?...কে জানে? সেদিন কিন্তু নয়ানের মনে হয়েছিল বৃন্দাবনে যমুনার তীরে ঐরকম শ্যামকান্তি চোখে পড়লে যেন নিরপরাধিনী হয়েই ভালো লাগা চলে।..দোষ যদি তো সে বৃন্দাবনের, কালিন্দীর, শ্যামের, গোপিনী রাধিকার।...শুধু বৃন্দাবনই বা কেন? বাবা বলতেন, গোসাঁই-দাদু বলেন—বোষ্টম, তার সারা জগতটাই তো বৃন্দাবন, রসের যমুনা ভিজিয়ে দিয়ে সারাক্ষণই চলেছে বয়ে, শুধু বুঝে নেওয়া চাই—ভাবের ভাবুক হওয়া চাই।

গোসাঁই-দাদুর আর একদিনের কথা মনে পড়ে। মনে পড়লেই একটা সরস সন্দেহে নয়ানের ঠোঁট দুটি হাসিতে একটু কুঁচকে ওঠে : বোধ হয় নাতনীর উঠতি বয়স দেখে ঠাড়েঠোড়ে কথাটা বলেছিলেন গোসাঁই-দাদু। সেও এইরকম একটি রাঙা সন্ধ্যায় ; রাঙা সন্ধ্যার সঙ্গে মিলিয়ে।

বলেছিলেন—“নাতনী, দুপুরের তেজটাই সর্বনেশে, তখন এই সূর্যই নিজে পুড়ছে, আর সব কিছুকে পুড়িয়েচে ; সকাল-সাঁঝে কিন্তু আলাদা, তখন সে

নিজের শান্ত রং দিয়ে তো সব কিছু রঙিয়েই তোলে।·· আকাঙ্ক্ষার দাহ এলেই সর্বনাশ, নয়তো ভালো না লেগে উপায় আছে? সত্যিকার বোষ্টম হয়ে যদি চিনতে পারলি তো যাবি কোথায়? সে যে শতরূপে তোর আলো বুক পেতে নেবার জন্যে চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেচে নিজেকে—দয়িত, সখা, বৎস; আবার বাপ-মা, সখী, দয়িতা—সেও তো ওই; যাবি কোন্ দিকে?"

সত্যিই তো, সেই এক রসিকের রসেই তো অনঙ্গ, পেয়ারী, সখী বিন্দু, সোনা, ননদিনী টগর; শাশুড়ী শঙ্করীও, তার গঞ্জনা নিয়ে। কে নয়? একই রস, শুধু ভিয়েনের তারতম্য; সবই মিষ্টি, সবই মধুর। ··বৃন্দাবনের সেই শ্যাম-কান্তিই কি বাঁশিতে আরও পূর্ণ হয়ে মন্দিরতলায় অনঙ্গ হয়ে সামনে দাঁড়াল না সেদিন? গোসাঁই-দাদু বলেন, বোষ্টম, সে হোল ভাবের ব্যাপারী, আধার নিয়ে মাথা কুটতে গেলেই সে মরবে; তার জগতময় বিছানো ঘর তখন একটিকে ঘিরে আসবে গুটিয়ে—নকল একটিকে ঘিরে; পরম একটি তো ঐ রাধারমণই।

নয়ানের ঠোঁটে আপনিই একটু লজ্জার হাসি ফুটে উঠল জলের ওপর হাত বুলুতে বুলুতে। ও প্রায় বলে ফেলেছিল—ঐ নকল একটিকেই অত মিষ্টি করে রাখেন কেন তাহলে রাধারমণ, দাদু?

ভাগ্যিস বলে নি লজ্জার মাথা খেয়ে! ভাবের ঘোরে ও-রকম কত আলগা কথা মুখ থেকে যে গেছে বেরিয়ে!

নিজের চিন্তার এই সংঘর্ষটুকুতেই হুঁশ হোল, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। উঠে পড়ল।

গা ধুয়ে ও ভিজে কাপড়েই যায়। আজকাল নানা লোকের ভিড়, শুকনো কাপড় নিয়েই এসেছিল একটা; পরে নিয়ে, ভিজে কাপড়টা কেচে গামছায় জড়িয়ে আখড়ার দিকে এগুল।

কী যে অদ্ভুত হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে! যেন সমস্ত গ্লানি, সমস্ত বন্ধন গেছে ঘুচে। শুধু তো বারুণীতেই গা ডোবানো নয়, মনের মধ্যে দিয়েও যে যমুনার মুক্তির স্রোত গেল বয়ে এতক্ষণ ধরে।

লক্ষ্মণের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হঠাৎ খেয়াল হোল ভূষণ তো থাকতেও পারে।···কাল অত বড় ক'রে ওর কথা উঠল, তারপর কাজের হিড়িকে যেন বেবাক্ ভুলে গেছে।

ডাক দিল—"লক্ষ্মণ আচ?"

সোনা ওরই বাড়িতে, সুতরাং জানাই যে লক্ষ্মণ মেয়ে নিয়ে ঐদিকেই কাছাকাছি কোথাও; উত্তর পাওয়ার কথা নয়, পাওয়াও গেল না। ভূষণ বেরিয়ে এল, দোরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলল—"বৌদিদি যে!"

এসে প্রণাম করল।

নয়ান বলল—"শুনেচি সব। তা ভয় যে দেখচি ঘোচে নি এখনও, এ কী সাজা! বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি?"

ভূষণ একটু অপ্রতিভ হাসি মুখে করে দাঁড়িয়েই রইল।

"কি গেরো বলো দিকিন! এসো, চলো। বাঘ না ভাল্লুক?"

মিথ্যা তো আটকায় না মুখে, ভয় ভাঙাবার জন্য তাও একটু জুড়ে দিল—"কবার জিগ্যেস করলেন আমায় কাল থেকে, শুনচেন যে এয়েচ।"

যেতে যেতে গল্প হলো,—জিরেনের খবর কি? ওদের বাড়ির? আসার সময় মা কিছু বললেন? আছেন কেমন ওঁরা? বাবাতো পনের দিন বাইরে।...ভূষণের কাছে তো লুকুনো নেই কিছু, কেন যে এসে পর্যন্ত যায়নি নয়ানরা, তা এবার তো যেতেই হবে...

ভূষণ সংক্ষিপ্ত উত্তরেই চালিয়ে যাচ্ছিল, একটু উৎসুক হয়েই বলল—"নন্দদা বলছিল বটে, তা সত্যি যাচ্চ তাহ'লে?"

নয়ান একটু ঠোঁটের কোণে হেসে বলল—"সত্যিই; তবে তোমার পক্ষে যাওয়া-না-যাওয়া দুই-ই সমান..."

মুখটা ঘুরিয়ে ওর মুখের ওপর সোজা দৃষ্টি রেখে বলল—"হ্যাঁ, ঠিক তাই; সেইজন্যে বলচি তোমার বৌদিকে এখানেই যতটুকু পার ভালো করে দেখে নাও; সেখানে এবার একেবারে একগলা করে ঘোমটা—অষ্টপহর!"

ওর বিমূঢ় ভাব দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল।

ভূষণ কিছু বলবার জন্যই প্রশ্ন করল—"তা কাকা হঠাৎ যে এল নিতে?"

"ওমা, ঠাকুরঝির বিয়ে যে, জানো না?"

হঠাৎ এত থতমত খেয়ে গেল ভূষণ যে খানিকটা যেন কোন কথাই জোগাল না, তারপর জিভে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে জিগ্যেস করল—"কে ঠিক করলে?"

"আমি।"

"তুমি! কোথায়?"

"তাই তোমায় বলি আর ভাংচি দিয়ে পণ্ড করে দাও!"

কথা বলার সঙ্গে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখছিল, এবার একটু হাসিও মিশিয়ে দিলে। ভূষণ অপ্রতিভ মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করে বলল—"আমি কেন ভাংচি দিতে গেলুম ?"

"আমি তা কি করে জানব ?"

অদ্ভুত উত্তরটায় হেসেই ফেলল ভূষণ, তাইতেই জড়তাটুকু কেটে গিয়ে একটু ঠাট্টা করবার সুবিধেও হোল, বলল—"তা এ ঘটকালি ব্যবসা আরম্ভ করলে কবে থেকে ?"

"ওমা ! বলে এই ব্যবসা নিয়েই নেমেচি হাটে !···আমার নিজের বিয়ের ঘটকালি কে করলে গো ঠাকুর ?"

বেশ খিলখিল করেই হেসে উঠল ; ভূষণও হেসেই কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, নয়ানের মুখের হাসিটা হঠাৎ নিভে যেতে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দিকে চাইতে তারও মুখের হাসি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

ওরা আখড়ার কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রায় শ'খানেক হাত দূরে বাঁশের আগলের জায়গায় যে ম্যারাপটা তোয়ের হয়েছে যেন ইচ্ছে করেই তার একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ভিখারী। হুঁকো হাতে ম্যারাপে লাল শালু লাগানো তদারক করছিল নিশ্চয়, তারপর এদের দুজনের ওপর নজর পড়ে গেছে। অস্তরবির কিরণ এখনও একেবারে লুপ্ত হয়নি, তারই একটু আভা চোখে প'ড়ে ভিখারীর চোখ দুটো যেন জ্বলছে কোটরের মধ্যে।

একটুখানি থমকে যেতেই হোল, তবে মুহূর্তখানেক, তারপর হয়তো আর কিছু করবার নেই বলেই এগুল দুজনে। কাছে এসে ভূষণ পায়ের ধুলো নেবার জন্যে ঝুঁকতে যাচ্ছিল—"থাক, থাক, হয়েচে"—বলে ভিখারী একেবারে হাত দু'য়েক পিছিয়ে দাঁড়াল। ম্যারাপের মধ্যে অল্প জায়গা বলে দু'জনে একটু ঘেঁষাঘেঁষিই ছিল, নয়ান ভূষণের কাঁধের কাছে একটু আঙুল ঠেকিয়ে তাকে নিরস্ত করলে।

রান্নাঘরের কাছে এসে একটু মোড় নিতে হয়, দুজনেই ঘুরে দেখলে ভিখারী হুঁকো ছেড়ে খালি পায়ে হন হন করে খেয়াঘাটের দিকে চলেছে। ভূষণ দাঁড়িয়ে প'ড়ে বলল, "ডাকব নন্দদাকে ?"

নয়ান দাঁড়াল না, চলতে চলতেই বলল—"ফল নেই।"

তারপর আরও দু'পা গিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বলল—"না হয় ডাকো ; যদি নিজেও যেতে চায় তো যাক্ চলে এই সঙ্গে।"

ভিখারীর উপস্থিতি যত বড় একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অভাবটা সে হিসাবে কিছুই হোল না। দু'জন লোক পরস্পরের সাহায্যে ম্যারাপটায় শালু বাঁধছিল, নিচে গোটাকতক ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল, ঘটনাটুকু চোখে পড়ল মাত্র এই ক'জনের ; তাও এমন একটা বিশেষ কিছু হিসেবে নয়। প্রণাম করতে যাওয়া, প্রণাম না নেওয়া, খেয়াঘাটের দিকে যাওয়া—এর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধটুকু যার জানা নেই তার কাছে এর ভেতর কি বৈচিত্র্য পারেই বা থাকতে ?

কুমারবাহাদুর এল, দু'একজনের মুখে প্রশ্ন হোল—"কোথায় গেলেন আমাদের বেয়াই ?" দু'একটা ছেলে পেছন থেকে উত্তর করল—"তানাকে তো গাংপানে যেতে দেখনু।"...তারপর বাঁধা-ধরা যা অনুযোগ—"বাঃ, দিব্যি ! কম্মকত্তা, তানার এইটে গাংপানে যাবার সময় হোল ?"

তারপর কুমারবাহাদুরকে নিয়ে যাওয়া, আসরে বসানো, খাতিরের হুড়োহুড়ি, রেষারেষি ; ভিখারী বিস্মৃত হয়ে গেল।

নয়ান ভূষণকে মানাই করে দিয়েছিল—আর কাউকে যেন না বলে।

অনঙ্গকে বলল সে নিজে।

অনঙ্গ আজ বড় বেশি করেই খুঁজছিল নয়ানকে। কাজের হিড়িক, তার ওপর ভিখারী রয়েছে, এ ক'টা দিন ভালো করে পাওয়াই যাচ্ছিল না তাকে, আজ আবার যেন আরও বেশি ক'রে পাওয়ার মতো হয়েছে। নয়ানকে ভালো লাগে হাসিতে, ভালো লাগে কান্নায়, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে যখন ও হাসি-কান্নায় ঝলমল করতে থাকে। তখন, ওর চারিদিকে যে একটা রহস্য আছে সেটা আরও হয়ে পড়ে গভীর, ওর রূপের যেন কূল পাওয়া যায় না। আজ সন্ধ্যার পর থেকে পাশাপাশি এই দুটো রূপই দেখল অনঙ্গ। গোটাকতক টাকা দরকার পড়ায় বাড়ি আসছিল, ম্যারাপ দুটো দেখে নিয়ে বাইরের দিক থেকেই আসছিল, রান্নাঘরের আড়াল থেকে বেরুতে ভাখে, দাওয়ার একেবারে শেষ খুঁটিটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নয়ান। মুখটা একটু উল্টো দিকে ঘোরানো, কিন্তু পাশ থেকে সন্ধ্যার আবছায়া আলোয় যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাই থেকে, আর একলা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার ভঙ্গি থেকেও অনঙ্গ টের

পেল—যদি না-ই কাঁদতে থাকে তো কোন কারণে খুবই সে বিমর্ষ তাতে আর সন্দেহ নেই। বাবা নিশ্চয় বাড়িতে নেই, তাড়াতাড়ি এগিয়েই যাচ্ছিল, এমন সময় হৈ-হৈ উঠল—কুমারবাহাদুর এসে গেছে! নয়ান চকিত হয়ে ঘুরল, কিন্তু তখন অনঙ্গর আর দাঁড়াবার উপায় নেই।

দ্বিতীয়বার দেখল একেবারে অন্যরূপে, তবে অল্প সময়েরই ব্যবধানে। দেখাটা হোল বাড়ি আর ঠাকুরবাড়ির মাঝামাঝি, পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তাটা লতিয়ে এসে যেখানে একটা কামিনী ঝাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। অনঙ্গ বেশ একটু ত্রস্তপদে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, ঝাড়টা ঘুরেই দেখে সোনার সঙ্গে নয়ান কি একটা হাসির কথা কইতে কইতে এগিয়ে আসছে। চোখাচোখি হতে নয়ান দাঁড়িয়ে পড়ল, জিজ্ঞেস করল, "অত হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছ কমনে—ওদিকে তো…"

নিশ্চয় বলতে যাচ্ছিল—ওদিকে তো বাবাও নেই; কিন্তু চুপ করে গিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নয়ান কোঁচানো নীলাম্বরী শাড়িটা পরেছে, যা খুব অল্পই পরে, এমন উৎসব গেল, একদিনও পরে নি; নিশ্চয় বেশিরকম কিছু হাসির কথা হচ্ছিল, চোখে মুখে লেগে রয়েছে এখনও তার খানিকটা, তার ওপর দূর থেকে আসরের কড়া পেট্রোম্যাক্সের আলো খানিকটা এসে পড়েছে।…সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরটা যেন জুগিয়ে উঠল না অনঙ্গর।

সোনাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অনঙ্গর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে নয়ান বলল—"বাঃ, চললি কোথায় তুই!"

সোনা যেমন ক'রে বলে থাকে, বলল—"বাঃ, আমি আর হেথায় কি করব?"

কামিনী ঝাড়ের ওদিকে বেশ একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনেই একটু হাসল, তারপর অনঙ্গ আগেকার মতো ত্রস্ত হয়ে উঠে বলল—"কোথায় যাচ্চি? আমি যাচ্চি—রায়েদের কাছারিবাড়ি থেকে যে রূপোর আতরদান আর গোলাপপাশ দুটো রেখেছিলুম…মনেই ছিল না তাড়াতাড়িতে…আর নবীন মালী যে…একি সে-মালাটা যে দেখছি তোর খোঁপায়!"

সামনে পা বাড়িয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। নয়ানের মাথার কাপড়টা নেমে গেছে, এলো খোঁপায় জড়ানো একটা জুঁইয়ের মালা, মাঝে মাঝে করবী ফুল বসানো। একটু মুগ্ধ দৃষ্টি, তারপর অনঙ্গ বলল—"তা থাক্। মালা ওঁকে

দেওয়া হয়েচে। নবীন মালী বলল—আমার এটাও পরিয়ে দিও—ভেবেছিলুম যাবার সময় না হয়···ওকি খুলচিস কেন ?”

ততক্ষণে আলাদা হাতে নামিয়ে ফেলেছে নয়ান, বলল—“এই নাও।”

“খুলতে গেলি কেন ? · আর তোর খোঁপার মালা···”

নয়ান হেসেই বলল—“কিছু দোষ হয় না গো গোসাঁই—খোঁপার মালা, গলার মালা—ওসব ভাবলেই দোষ।···আর ওঁর নাম করে দিয়ে গেল একজন ···জানতুম না তো · ভেবেছিলুম ফালতু···”

“তবু ··”

নয়ান গলাটা বাড়িয়ে একবার কামিনী ঝাড়ের ওদিকটা দেখে নিল, তারপর অনঙ্গ কিছু বোঝবার আগেই মালাটা দুহাতে ওর মাথা গলিয়ে নামিয়ে দিয়ে হেসে বলল—“এই নাও, দোষটা কাটিয়ে দিলুম, এইবার খুলে নিয়ে যাবে তো ?”

আরও গভীর রাত্রের কথা। ঐ মালাটিই আবার খোঁপায় পরিয়ে দিচ্ছিল অনঙ্গ, সঙ্গে সঙ্গে কথা হচ্ছিল—

এদিককার হাঙ্গামা সব চুকে গেছে। আজ কুমারবাহাদুরের জন্যে অপেরাটা যেমন তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়েছিল, শেষও হয়ে গেল তেমনি আগে। বড়লোককে ডাকা, বেশ একটা হিড়িক গেছে, অন্যদিকে মন দেওয়ার আর ফুরসৎ হয়নি, কুমারবাহাদুর চলে গেলে ভিখারীর কথাটা আবার ক'রে মনে পড়ল—একবারও দেখেনি তাকে সন্ধ্যার পর থেকে। তখন যে শুনল গাঙের দিকে গেছে সে কথাটাও মনে পড়ল। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল; খেয়ালী মানুষ, যেমন এসেছিল, হঠাৎ চলেই গেল না তো !

বুকটা যে ছাঁৎ করে উঠল সেটা বিশেষ ক'রে নয়ানেরই জন্যে। ভিখারী আসতেই নয়ানের এতখানি পরিবর্তন। কুমারবাহাদুরকে নিয়ে এত আপত্তি, আজ এল, কত ভয় ছিল অনঙ্গর, তা আজ যেন আরও প্রফুল্ল নয়ান, সন্ধ্যার পর থেকে যে কবারই নজর পড়ল, দ্যাখে ওর চোখেমুখে সারা অঙ্গে খুশী যেন উছলে উঠেছে। আর সত্যই, জীবনেও তো একটা মস্ত বড় পরিবর্তন হতে যাচ্ছিল, বাড়ি যাবে, আখড়ার জন্যে নূতন ব্যবস্থা হবে—মনে মনে কত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে নয়ান তা অনঙ্গ তো বোঝে।···ভিখারী আসাতেই তো এত আশা, এত পরিকল্পনা, সেই ভিখারীই যদি চলে গিয়ে থাকে—আর গেছে নিশ্চয়—এত হঠাৎ যখন, তখন রাগেরই কিছু হয়েছে হয়তো···

অন্যদিন যাত্রা শেষ হয়ে গেলে ঠাকুরবাড়ির বারান্দাতেই শুয়ে পড়ে, আজ চিন্তা করতে করতে বাড়ির দিকেই এগুল। দূর থেকে দেখে দাওয়ায় আর এক যাত্রা,—পেয়ারী দুহাত তুলে ঘুরে ঘুরে নাচছে, নয়ান গুনগুন করে একটা গানের সঙ্গে হাততালি দিয়ে দিয়ে নাচাচ্ছে, পাশে সোনা, সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসে লক্ষ্মণ। অনঙ্গ এগিয়ে আসতে নয়ান বলল—"এত দেরি যে, গেছলে কোথায় ?"

অনঙ্গ বলল—"খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এলুম সবাই মিলে কুমারবাহাদুরের পালকিটা। দরকার তো। কি খুশী অপেরা আর ঠাকুরমশাইয়ের আরতি দেখতে! আরও পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে গেলেন ঠাকুরবাড়ির জন্যে।"

"খুব অপেরা, খুব আরতি! দেখতেন আমার পেয়ারীর নাচ! একদিন শুধু এই দেখাতেই নেমন্তন্ন ক'রে আনব, দেখি কত টাকা দিতে পারেন কুমারবাহাদুর···"

সোনা দাঁড়িয়ে উঠেছিল, নয়ান পেয়ারীকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে গোটাকতক চুমো খেলে গালে-ঠোঁটে, বলল,—"শেখ্ ভালো করে আরও, নাচবি—রাজার সামনে, রাজা মুঠো মুঠো টাকা দেবে।"

সোনার কোলে তুলে দিতে পেয়ারী ঘুরে যেয়ে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলল—"তাকা!"

"তোর মেয়ে আগাম চায় যে লো!"

সবাই হেসে উঠল। টাকা অনঙ্গর পকেটেই ছিল, গোটাকতক বের করে পেয়ারীর হাতে দিয়ে মুঠোটা বন্ধ করে দিয়ে বলল—"এই নে। নাচবি তো এবার ?"

ওরা চলে গেল। একটু দ্বিধায় পড়ে গেল অনঙ্গ—নয়ানের মেজাজটা আজ যেমন খুশী-খেয়ালের চড়া পর্দায় বাঁধা রয়েছে, ভিখারীর কথাটা তুলতে যেন মন সরছে না। তবুও তুলল। টাকাটা বাক্সয় রেখে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল—"বাবাকে সন্ধ্যে থেকে দেখচি না বৌ, বোধ হয় বাড়ি চলে গেল।"

নয়ান ঘরেই আলমারি খুলছিল, বলল—"বোধ হয় নয়, গেচেনই তো।"

অনঙ্গ চৌকাটের বাইরে থেকে ঘুরে চেয়ে অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"তুই জানিস—গেচেন ?"

নয়ান আলমারি থেকে একটা কি বের করে শেমিজের ভেতর বুকের কাছে রেখে দিল, চাবিটা দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে নিতান্ত নির্বিকারভাবে বলল—"ওমা, জানব না? আমিই তাড়ালুম।"

"তুই তাড়ালি!!"

নয়ান ওর পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, বলল—"সে কথা এখন থাক্, হবে'খন।...একটা কথা আজ রাখবে গোঁসাই?—চলো নদীর ধারে যাই একটু। যাবে?"

অনঙ্গ বিস্ময়ের যেন কূল পাচ্ছে না। একটু চুপ ক'রে চেয়ে রইল, তারপর শুধু বলতে পারল—"তোর মাথা খারাপ হয়েচে নাকি! হঠাৎ নদীর ধার—এত রাত্তিরে!"

নয়ান এগিয়ে এসে ওর একটা হাত ধরল, বলল—"তাই হয়েচে। মাথা খারাপ না হ'লে শ্বশুরকে তাড়ায় না কেউ; শ্বশুরকে তাড়ালে মাথা ঠিক থাকে না—যেদিক দিয়েই নাও। কিন্তু তুমি চলো দিকিন—হ্যাঁ চলো, লক্ষ্মীটি, বাঁশি বাজাবে।"

"হঠাৎ বাঁশি!"

নয়ান একটু চোখ ঘুরিয়ে একটা যেন মনগড়া ওজুহাত খুঁজে নিল, বলল—"সাত দিন ধ'রে একটানা যাত্রার গান, তাতেও তো মাথা খারাপ হয়ে যায় মানুষের! না, চলো, এই বাঁশি নিয়েচি আমি।" বুকের কাছ থেকে বের ক'রে আনল।

"তা এইখানেই বাজাই না। রাত কম হয়েচে ভেবেচিস?"

নয়ান রেগে উঠল।

"জোছনার ফিনিক ফুটচে! আর সে ঝোড়ো অন্ধকার রাত্তির, কোলের মানুষ চেনা যায় না, তাতে তোমার আটকায় নি!...না গোসাঁই, বড্ড খোশামোদ করাচ্চ আজ। চলোই না।"

•

ঘরে তালা ঝুলিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

অপেরা অন্যদিনের তুলনায় সকাল সকাল শেষ হয়েছে, তবু রাত্রি প্রায় দুপুরের কাছাকাছি হবে। কয়েকদিনের উৎসব-জাগর আখড়াটা ছুটি পেয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যেই নিষুপ্ত হয়ে পড়েছে, ভরা জ্যোৎস্না কার একখানি শুভ্র কোমল হাতের মতো তার শিয়রে আলগাভাবে রয়েছে পাতা।

পাশাপাশি চলছিল, আখড়া থেকে বেরিয়ে নয়ান আরও ঘেঁষে এসে অনঙ্গর হাত ধরল, সেই ভাবে খানিকটা চলে বলল—"ঠিক দেড় বছর হোল, না গোসাঁই—আমরা এমনি ক'রে জিরেন থেকে যে বেরিয়ে এসেছিলুম ?"

এই প্রথম কথা হোল।

অনঙ্গ ছোট্ট ক'রে বলল—"হুঁ।" ঐটুকু বলতেই গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিতে হোল। ওর গা ছমছম করছে, নয়ানের এই কথায় যেন আরও বেড়ে গেল।

মেয়েদের নাইবার ঘাটের কাছে এসে নয়ান একবার দাঁড়াল, আকাশের দিকে চেয়ে, বারুণীর দিকে চেয়ে কি একটা যেন খুঁজল—হয়তো সন্ধ্যার সেই হারানো সুরটুকু—পাশেই যে একটা মানুষ রয়েছে, যেন হুঁশ নেই। অনঙ্গর প্রশ্নে চমক ভাঙ্গল—"এইখানে বসবি ?"

নয়ান হেসে বলল—"হ্যাঁ, আর উদ্ধব, লক্ষ্মণ, সোনা সবাই ছুটে আসুক। দুজনের মধ্যে একজনের মাথাও তো ঠিক থাকতে হয়।···চলো এগিয়ে।"

কি শুনবে ব'লে মুখ খুলতে সাহস হচ্ছে না, তবু আর একবার টুকল, যেখানে ও নিজে ব'সে বাঁশি বাজায় সেখানটায় এসে—

"এইখানেই বোস্ বৌ, আর কত এগুবি ?"

নয়ান একটু দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু খেয়াঘাটের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"না, এখান থেকেও শোনা যায় ··"

একটু রহস্যের হাসি হেসে বলল—"কোনও রাজা বাহাদুর আবার এসে কেড়ে নিয়ে যাক্ আর কি তোমায় !"

ভয়ের জন্যেই যেন এতখানি কথায় ভরসা পেয়ে অনঙ্গ ওকে একটু টেনে নিয়ে নিজের পাঁজরায় অল্প চেপে ধরল,—বলল—"তোর কাছ থেকে ?"

"তোমার কাছ থেকে আমাকেও তো কেড়ে নিয়ে যেতে পারে গোসাঁই।"—আরও স্পষ্ট করে হেসে উঠল, বলল—"চলো।"

একদিকে বৈশাখের তৃণহীণ মাঠ, একদিকে শীর্ণা বারুণীর বালুচর, মাঝে মাঝে ক্বচিৎ জলরেখা; এতটুকুও সবুজের অভাবে জ্যোৎস্না যেন শুভ্রতায় ফেটে পড়ছে একেবারে। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা—কোথায় যেন এই নিরন্ধ্র জ্যোৎস্নার সঙ্গে একটা অদ্ভুত রকমই মিল রয়েছে তার; শুধু থেকে থেকে দুটো পাখি একটু করুণ কর্কশ কণ্ঠে নদীর তীরে আলাদা আলাদা দুটো জায়গা থেকে ডেকে ডেকে উঠছে—যেন এ ওর ডাকে সাড়া দিয়েই। দু'জনে

চলেছে, চলায় যেন ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে,—যেন শেষ হবে না চলা। একবার শব্দ দুটো শুনে নয়ান প্রশ্ন করল—"চেনো পাখি দুটোকে গোসাঁই ?"

অনঙ্গ বলল—"চখা-চখী তো।"

"ওরা শুনেচি নাকি মিলতে পারে না কখনও।"

একটু বিরতি দিয়ে বলল—"মানুষেই বা কৈ পারে ?—এত ভালবাসা, এত আকুলি-বিকুলি—সবই ফক্কিকার···রাগ করচ ?"

অনঙ্গ কিছু উত্তর দিল না।

পাখি দুটো কাছেই কোথায় ছিল, হঠাৎ নদীর এপার ওপারের দুটো তটরেখার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে বহুদূর চলে গেল, পরস্পরের সাড়া নিয়ে ওদের সেই ডাক মেলাতে মেলাতে শব্দের অতি ক্ষীণ একটা রেখায় বিলীনপ্রায় হয়ে গেল। সব একেবারে নিস্তব্ধ।

নয়ান উত্তরের জন্যে তাগাদা দিল না, এগিয়েই চলল, তারপর এক সময় আবার কথা কইল—

"বাবা-মা দিব্যি চ'লে গেল গোসাঁই। একদিন আমাদেরই মতন ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তারপর ঐ দুটো পাখির মতন—কোথায় যে গেল চলে, আর সাড়া-শব্দ নেই। এই ভালো·· অবিশ্যি তোমাকে ঐ পাখিদের একটার মত হ'তে বলচি না···।"

অনঙ্গ আর পারল না, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে, ঘুরে নয়ানের আর একটা হাত ধরল, যেন ওর পথ আগলেই, বলল—"যা বলবি স্পষ্ট ক'রে একেবারে বল্ বৌ ; আর এভাবে দগ্ধাস্‌নি।"

নয়ান যেন ঘুম-ভাঙার মতো হয়ে ওর দিকে একটু চেয়ে রইল ; তারপর বলল—"এইখানেই বোস।"

অনঙ্গ থেকে অল্প একটু ব্যবধান রেখে বালির ওপর পা ছড়িয়ে বসল। এক মুঠো বালি তুলে ঝির ঝির ক'রে মুঠোর ফাঁকে ফেলতে ফেলতে বলল—"গোসাঁই, আমায় এবার ছেড়ে দাও।"

কথাটুকু বলে আর থামল না, যা বলবার এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শেষ ক'রে ফেলল—

"আমি তোমার বাঁশি শুনতেই টেনে নিয়ে এসেছিলুম গোসাঁই, বিশ্বাস করো ; কিন্তু কি যে হয়ে যাচ্চে আজ !···কী ক'রে বুঝিয়ে বলি তোমায় ?—আচ্ছা, বলতে পার—রাধারমণ আমায় গড়লেন এক রকম ক'রে ; তারপর

একেবারে বিপরীত একটা অবস্থায় এ-রকম ক'রে এনে ফেললেন কেন? তাঁর হাতেগড়া সেই নয়ান যদি মাঝ-মধ্যিখানে এই রকম ক'রে সব ওলটপালট ক'রে আমার মধ্যে এসে পড়ে—ভূতের ভর হওয়ার মতন ক'রে, তো আমি করতে পারি কি? আজ সন্ধ্যে থেকে তাই হয়েচে। সে যে কী হওয়া কি ক'রে বোঝাই তোমায়? একবার হ'য়েছিল—জিরেনে, সে কিন্তু অভিমানের মধ্যে দিয়ে। আজ আবার সেই ভূত চেপেছিল গোসাঁই, যার জন্যে, ঐ যে বললুম না?—বাবাকে যেতে হোল…"

অনঙ্গ যেন ভুলে গিয়েছিল এত বড় কথাটা, চকিত হয়ে ঘুরে চেয়ে বলল—"হ্যাঁ, সে কথা তো বললি না—বাবাকে তাড়ালি—সে আবার কি?…সে তো বিশ্বাস করার কথাও নয়; তা ভিন্ন বাবা আসতে তুই যে কত খুশী হয়েছিলি তাও তো দেখছিলুম…"

"সে কথা তো অস্বীকার করব না, সত্যিই বড় ভালো লেগেছিল বাবা আসতে, নইলে এ কটা দিন যে কি করে কাটত।ভেবে পাইনে। কিন্তু তার সঙ্গে এটুকুও অস্বীকার করতে পারচি না যে বাবা যেতে আরও খুশী হয়েচি। গোড়ার কথাটা বলি তাহলে, একদিন—যেদিন জিরেন থেকে চলে আসি, টগর ঠাকুরঝিকে বলেছিলুম—তোমার সামনেই। কথাটা হচ্চে, আমরা জাত-বোষ্টম, বাবা বলতেন, গোসাঁই-দাদুও সেই কথা বলেন—আমরা অভিসারিকার দল—মেয়েপুরুষ সব্বাই, কেননা পুরুষ তো এক রাধারমণই, তাই আমাদের সমস্ত জীবনটাই আনন্দের অভিসার তাঁর দিকে—আমাদের কোনও বাঁধন থাকতে নেই—আত্মপর, ছোটবড়; এদিকে ঘেন্না-ভয়, হায়া-লজ্জা, মান-সম্ভ্রম—কোনও বাঁধনই থাকতে নেই আমাদের। এক তোমার ·বাঁধনে ধরা দিতে গিয়ে আমি সব বাঁধনেই বাঁধা পড়ে গেচি গোসাঁই। কিন্তু ধাতে সইবে কেন? পারব কি করে বাঁধা থাকতে? সেই কথাটাই আজ স্পষ্ট হোল,—বাবা আসতে অত আহ্লাদ—আবার ফিরে যাব বাড়িতে—শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ, ঘর-বাড়ী—কিন্তু বাবা চলে যেতে এখন আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠচি—যদি না যেত! যদি নিয়ে যেত আবার সেই বাঁধনের মধ্যে!"

দুজনে দু'জনের চিন্তা নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর অনঙ্গ প্রশ্ন করল—"কিন্তু গেল কেন বাবা—সে কথা বললি না তো।"

"গেলো…"—যেন কতদূর থেকে মনটাকে ফিরিয়ে আনল নয়ান, একটু চুপ করে থেকে বলল—"গেল, এই আখড়াতেই রাধারমণের যে একটা বাঁধন-ছেঁড়া

বাঁশির স্বর আচে সেটা সইতে পারল না বলে···দেখল, বারুণীতে গা ধুয়ে ভূষণ-ঠাকুরপোর সঙ্গে আসচি—গল্প করতে করতে, হাসতে হাসতে।”

ওকে যেন খুব উৎকট একটা সমস্যা দিয়ে ফলটা কি হয় দেখবার জন্যে মুখের দিকে চেয়ে রইল। অনঙ্গ দৃষ্টি নত ক'রে নিল।

নয়ান একটুও বিচলিত হোল না আজ, অথচ এর চেয়ে কত সামান্য কারণে একদিন মনে মনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে।··যে মুক্তিটুকু খুঁজছিল সেটাকে যেন পেয়ে গেল, যেন হয়ে গেল বোঝাপড়া; এত সহজে হবে আশাই করে নি। একটুও বিচলিত না হয়ে বলল—“কিন্তু একটা ভুল মনে পুষে রেখো না গোসাঁই—এ-কথা একটুর তরেও মনে কোর না যে আমি বলচি বাবা ভুল বা অন্যায় করলেন। তোমাদের যে রকম ··”

অনঙ্গ চোখ তুলে বলল—“বাবা তোকে তো সে রকম করে জানেন না বৌ···জানবার কথাও নয়। জানলে রাগ করবেন কেন?”

নয়ান হঠাৎ ধাঁধা খেয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল; তারপর প্রশ্ন করল—“আর তাঁর ছেলে?”

উত্তর পাওয়ার আগেই বলল—“তাহলে সবটুকু বলি গোসাঁই—ছেলের কাছেও কিছু অজানা থাকে কেন? আমার পাগলামিটা—পাগলামিই বলি তোমাদের কাছে—আজকে আরও বাঁধন-ছেঁড়া হয়ে যাচ্ছিল—যদি বল কেন, তো ঐ কথাই বলব—আজকে রাধারমণের বাঁশির স্বর হয়েই উঠেছিল বড় পাগল-করা।···আজ আমি ঠিক করেছিলুম কুমারবাহাদুরের সামনেই বেরুব—হ্যাঁ, যেমন সেজেগুজে রয়েচি আজ তেমনি সেজেগুজেই—আজ আমার মনে হচ্ছিল সাজাগোজা আমার যখন আর কারুর জন্যেই নয়—যদি রূপ থাকে তো সে রূপও আমার যখন আর কারুর জন্যেই নয় তখন পেছটানটা কিসের? আরও ঠিক করে বলতে গেলে—রাধারমণের রাজ্যে কেউই যখন লুকিয়ে নেই—কিছুই যখন লুকিয়ে নেই কারুর কাছে, তখন সহজ হয়ে থাকাটাই এত সোজা বোধ হচ্ছিল আমার যে কুমারবাহাদুরের কথাটা তত বড় ক'রে ভাবিও নি আমি।···অবিশ্যি সেভাবে বেরুই নি, কিন্তু তার কারণ দরকার হয় নি। কিন্তু যদি বেরুতুম দরকার পড়লে?”

অনঙ্গও আজ একটু ভব্য সাজগোজে ছিল, পিরানের ওপর একটা কল্কার ছাপ দেওয়া হলদে উড়ুনি, খুলে রাখবার অবসর পায় নি, কিন্তু উত্তর না দিয়ে উড়ানির ভেতর ডান হাতটা ঢুকিয়ে অল্প অল্প হাসতে লাগল।

নয়ান বলে চলল—"বেরুই নি তবুও কুমারবাহাদুর কয়েকবারই দেখেচেন—একবার আরতির সময়, তারপর আসরেও কাছাকাছি না বসে থাকলেও সামনাসামনি ছিলুম আমরা।"

অনঙ্গ হাসছিলই, বলল—"দেখেচি।"

একটু চেয়ে থাকতে হোল বৈকি নয়ানকে, তারপর সেও একটু হেসে বলল—"ও!...আচ্ছা, যদি দরকার না পড়লেও যেচে গিয়ে দাঁড়াতুম সামনে? —আমাদেরই অতিথি হয়ে এলেন তো একজন রাধারমণের দ্বারে..."

অনঙ্গ এবার একটু বেশি করেই হেসে ফেলল, বলল—"আর কত পরীক্ষে করবি বৌ?...তাহলে..."

মালাটা দেয় নি কুমারবাহাদুরকে, মন্দির থেকেই একটা প্রসাদী মালা দিয়ে দিয়েছিল, পিরানের ভেতর থেকে খানিকটা বের করে বলল—"তাহলে এইটে দিতুম তোর খোঁপায় আবার পরিয়ে।"

সমস্তটুকুই খুলে নিয়ে ওর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল—"বরং আয় দিই-ই জড়িয়ে বৌ, মনে করাটাই হচ্চে আসল; যখন পেরেছিলি তাই মনে করতে তখন আমিও ধরে নিলুম তুই রাধারমণের অতিথিকে আদর ক'রে ডেকেই নিয়েছিলি তাঁর মন্দিরে।"

বাইশ

ভালো হোল কি মন্দ হোল বোঝা যায় না, তবে একটা যেন পর্ব শেষ হোল। জিরানের সঙ্গে সম্বন্ধটা একেবারেই গেল ছিন্ন হয়ে।

ভালো হোক মন্দ হোক নয়ান যেন বাঁচল।

এর আগেও সম্বন্ধ ছিন্ন করে এসেছিল, নিজে হ'তেই। তবে নিজে হতেই বলে, নিজের একটা হঠকারিতা বলে, মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ চিন্তার অলস মুহূর্তে এক, একবার অনুতাপ জেগে উঠত মনে।—এটা করলে বোধ হয় এই রকমটা হোত না, এই রকমটা না করলে বোধ হয় এইভাবে দাঁড়াত জীবনের গতি। এলোমেলো চিন্তা, একেবারেই অনুতপ্ত না হোক, অনুতাপ-ছোঁয়া বৈকি।

এর মধ্যেই এসে পড়ল মৈনে নিয়ে ব্যাপারগুলো—ভূষণ, কুমারবাহাদুর, অনঙ্গর সঙ্গে কথা বন্ধ—একটা কালবৈশাখীর দুর্যোগ যেন সারা আকাশটা

এসেছিল ছেয়ে, যাতে মনে হয়েছিল জিরেনই যেন একটি মাত্র ভরসা, সব সমস্যার সমাধান। তাইতে ভিখারীর উপস্থিতিটা মনে হয়েছিল দৈব-নির্দিষ্ট। দেবদূতের পায়ে নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছিল নয়ান—পাছে তার মত যায় বদলে, নয়ানকে তার স্বর্গে না যায় নিয়ে।

এখন ভাবে কি করে সে নিজেকে এত হেয় করতে পেরেছিল! যেটুকু খোশামোদের অংশ ছিল সেটুকু তো পীড়া দিলই, যা ছিল সত্যই শ্রদ্ধা, আপন-জন বলে সত্যই টান, ঐ রকম আপন-ভোলা মানুষ বলে সত্যই দরদ—তা পর্যন্ত ঐ খোশামোদের আওতায় মলিন হয়ে গিয়ে সমস্ত দেহমনে গ্লানি ছড়িয়ে দিতে লাগল।

কাল অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, ঘুম ভাঙ্গল অনেক দেরি করে। এর পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত নয়ান বিছানাতে রইল পড়ে। উৎসব শেষ হয়ে গেছে, আর কোন তাগিদ নেই, অলস ভাবে এই চিন্তাগুলো নিয়ে পড়ে রইল। কাজের মধ্যে রাধারমণের নিত্য পূজা; সেদিক দিয়েও দেহে এত অবসাদ, মনে এত গ্লানি নিয়ে যেন মন্দিরে যেতে পা উঠছে না। তারপর হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে গেল গোসাঁইঠাকুরের অভ্যাসের কথা,—নয়ান না গেলে পরিষ্কার করা থেকে ফুল তোলা নৈবেদ্য সাজানো সব তিনি করে নেবেন।

উঠে পড়ে একটু এদিক-ওদিক করবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে এল অনেকটা। কাজের তাগিদ নেই কেমন ক'রে? এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আজই বরং বেশি। অপেরা পার্টি আজ যাবে, তার ব্যবস্থা করা, একটু ভালো করেই খাইয়ে-দাইয়ে দিতে হবে। তারপর উৎসবের সব গুটিয়ে ফেলে যেখানকার যা পাঠিয়ে দেওয়া—সেও একটা মস্ত বড় হিড়িক। সবই পাঠিয়ে দিতে হবে, উৎসবের স্মৃতিটা আর একটা দিনও ধরে রাখতে চায় না নয়ান—ধারকরা জিনিসগুলো—সামিয়ানা, সতরঞ্চি, আলো, এগুলো তো দেবেই পাঠিয়ে; যে চালাটা তোলা হয়েছে তারও শুধু একটা ঘর রেখে বাকিগুলোর বাঁশ-খড় সব বেচে দেবে, বিলিয়ে দেবে। উৎসবটা হয়েছিল ভালোই, এত বড় উৎসব পলাশবাটীর আখড়ায় কেউ কখনও দেখে নি এর আগে; তবু শেষদিকের ঐ যে একটু খুঁৎ ওতে যেন সমস্তটারই চেহারা গেছে বদলে।

লক্ষ্মণকে দিয়ে প্রসাদকে ডেকে পাঠিয়ে সব বলে দিয়ে নয়ান বারুণীতে চলে গেল। যখন মন্দিরে গিয়ে ঢুকল তখন মনটা বেশ প্রসন্নই, কর্মচঞ্চলতার মধ্যে

অনেকখানি অবসাদই গিয়েছিল কেটে, বাকিটুকু বারুণী ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

তবু ভিখারীর কথাটা ঘুরেফিরে উঠল আর একবার। ঠাকুরমশাই আয়োজন আরম্ভ করেই দিয়েছিলেন, নয়ান আসতে বললেন—"তুই আবার তাড়াতাড়ি আসতে গেলি কেন দিদি? চালিয়ে নিতুম আমি। কদিন থেকে মস্ত বড় ধকোলটা গেল, তারপর রাধারমণ আবার আর-এক বেশে সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা করেচেন তো···"

চন্দন ঘষছিলেন, "দিন আমায়"—বলে নয়ান এগিয়ে গিয়ে চন্দন-পিঁড়িটা টেনে নিল।

উত্তরের জন্যে খানিকটা অপেক্ষা করে গোসাঁইঠাকুর বললেন—"তোর শ্বশুরের কথা বলচি আর কি। ওদিকে তাঁর যাতে কোন কষ্ট বা অসুবিধে না হয় সেদিকটাতেও নজর রাখতে হবে তো। বরং বেশি করেই। নিশ্চয় ওঠেন নি এখনও; উঠেই কিন্তু তোকে খুঁজবেন।"

নয়ান চুপ করেই চন্দন ঘষে যেতে লাগল। রাধারমণের মন্দিরে মিথ্যা বলতে ওর বাধে না, অন্যত্র বরং ও এ-বিষয়ে সংযত; মনে মনে একটা মিথ্যাই রচনা করছিল, যাতে উপস্থিত ব্যাপারটা সামলে যায়; গোসাঁইঠাকুর নিজে হতেই ভিখারীর শয্যাত্যাগ না করার কথা বলায় একটা সুবিধেও ছিল, কিন্তু কি ভেবে নয়ান আর মিথ্যের দিকে গেল না। বেশ খানিকটা নিরুত্তর থেকে একসময় চন্দন ঘষা থামিয়ে বেশ সোজাভাবে গোসাঁইঠাকুরের মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে বলল—"রাধারমণ আমায় সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্দি করে দিয়েছেন দাদু; শ্বশুর কাল সন্ধ্যের আগেই চলে গেচেন।"

একটু হাসলেও।

এতক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তরটা দেওয়ার জন্যই গোসাঁইঠাকুরের বুঝতে বাকি রইল না যে কোথাও কিছু গুরুতর একটা হয়েছে। তবে স্বভাবের মধ্যে অশোভন কৌতূহল নেই, বরং পাছে কোথাও ব্যথা দিয়ে বসেন সেইজন্যে কোন প্রশ্ন না করে সাধারণভাবেই মন্তব্য করলেন—"কাজের লোক তো। যাক্, তবুও রাধারমণ কটা দিন যে নিজের কাছে আটকে রেখেছিলেন—অনেকটা সুসর হোল এদিকে।"

নয়ান মুখ নিচু করেই একটু হেসে বলল—"রাধারমণের ভাগ্যি—আটকে যে রাখতে পেরেছিলেন।"

গোসাঁইঠাকুরও হেসেই বললেন—"ভাগ্যি বলচিস ?…তা এক হিসেবে বলা যায় বৈকি। তবে কি জানিস দিদি ?—দোষটা তো শেষ পর্যন্ত ওঁর নিজেরই,—এমনভাবে অন্যদিকে মানুষকে মিছে কাজে জড়িয়ে রাখেন যে তাঁর নিজের কাজে আর পেয়ে ওঠেন না।"

"নিজের ঘাড়ে দোষ তুলে নেওয়ার একটা রোগও আছে তো রাধারমণের —তাইতে চাপিয়ে দেওয়ার বেশ সুবিধেও হয় লোকের।"

"উনি বলেন—দোষ চাপিয়েই যদি তোদের আনন্দ তো চাপা না কত চাপাবি। একদিন বলছিলাম না তোকে ?—দেহের রং করেচেন কালো—যাতে কালি মাখাতে আর কারুর না আটকায়।"

একটা যেন জেঁদাজেদী লেগে গেছে দুজনের মধ্যে ; উনিও আসল কথাটা শুনবেন না,—নয়ানও না বলে ছাড়বে না।

এরপর নয়ান ও-পথটাই দিল ছেড়ে। বাটিতে চন্দন তুলছিল, শেষ করে দুর্বার গোছাটা টেনে নিয়ে প্রশ্ন করল—"আচ্ছা দাদু, কেউ রাধারমণের মন্দিরের মুক্ত হওয়াটা বরদাস্ত করতে পারল না,—হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার জন্যে বেরিয়ে গেল ; সেখানেও কি দোষটা রাধারমণের ?"

উত্তরটা যা হবে তা তো জানাই, কিন্তু সে সুযোগ আর দিল না নয়ান। বলেই চলল—"শ্বশুরের কথাই বলি দাদু। আপনি যা বললেন সে দিক থেকে রাধারমণের যে ওঁর ওপর কত দয়া তা বলে শেষ করা যায় না। উনি একেবারে যাকে বলে মুক্তপুরুষ, অকাজ বলচেন যাকে আপনি তার বাঁধন একেবারেই নেই ওঁর। ওঁকে যেতে হোল ওঁর ছেলের বৌ অপর একজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে বারুণী থেকে নেয়ে আসছিল, তাই। একটু টীকাও করে দিই দাদু—সেই অপর একজন ওঁর ছেলের একেবারেই ছোট ভাই—তফাৎ শুধু এই যে এক মায়ের পেটে জন্মায় নি।"

এরপর নয়ান সমস্তই বলে গেল—ভূষণকে নিয়ে বাড়ির একটা কুটিল সন্দেহ থেকে আরম্ভ করে কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত যা হয়েছে, সব।

পূজার আয়োজন করতে করতেই বলছিল। শেষও করল আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে। বেশ খানিকটা আবেগ এসেই পড়েছিল, তবে সংযত করেই নিয়ে গেল সেটাকে। তবু কিন্তু শেষের দিকে গলাটা ভারী হ'য়েই এল। ঠাকুর-মশাই সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে আসনে বসেছেন, বলল—"সব তো শুনলেন দাদু, এখন…"

হঠাৎ সঙ্কোচ যেন কণ্ঠ চেপে ধরল। একটু থেমে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"এই দেখুন, নিজের কথাই পাঁচ কাহন করে পূজোর ব্যাঘাত ঘটাচ্চি। আপনিই দায়ী এর জন্যে দাদু; যে যা দোষ করবে সব রাধারমণের ব'লে ব'লে এমন আস্কারা দিয়ে এসেচেন যে আর হুঁশই থাকে না মানুষের। নিন, পূজোয় বসুন আপনি—এ ক'রে কি পূজো হয়?"

গোসাঁইঠাকুর আচমনের জন্য হাতে জল নিয়েছিলেন, হেসে বললেন,—"আজকের পূজোই তো সার্থক দিদি। শুধু জল-চন্দনেই কি পূজো হয় রে? আজকে তাঁর পায়ে যা নিবেদন করতে পারচি তার তুলনা কোথায় বল্? তুই পূজো হোল না, ব্যাঘাত হোল ভাবচিস—রাধারমণ আজ আমার ভাববেন—স্বর্গের পারিজাত তুলে কে আমার পায়ে এনে দিলে আজ!"

আচমনটুকু সেরে পূজোয় বসলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় আরতি শেষ করে গোসাঁইঠাকুর চলে গেলে নয়ান মন্দির-ঘরের বারান্দায় এসে চুপ করে বসল। সমস্ত আখড়াটা নির্জন, নিস্তব্ধ। কাল পর্যন্ত যে উৎসব-কলরবটা লেগে ছিল শুধু যে সেইটেই নেই তা নয়, উৎসবের আর চিহ্নমাত্রই নেই। নয়ান থাকতে দেয় নি বলাই ঠিক, যেভাবে তাড়াহুড়া করে সব পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছে। প্রবেশ পথের সেই লাল সালু মোড়া বাঁশের ম্যারাপটি পর্যন্ত; যেখানে দাঁড়িয়ে নাকি কাল সন্ধ্যায় নয়ানের উৎসব অমন করে শেষ হয়ে গেল।

আখড়ার উৎসবটা যখন ছিল তাও ভালোই লেগেছিল,—আনন্দ-উদ্বেগ নিয়ে তার স্মৃতি মনটাকে মাঝে মাঝে ব্যাথাতুর করে তুলছে। তবুও বড় ভাল লাগছে এই নির্জনতা, এই স্তব্ধতা, আখড়ার এই নিরাভরণ বেশ। বহু পূর্বের কোন্ একদিনের শান্ত, তৃপ্ত, নিরুপদ্রব আখড়া যেন—তার মনের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিলে গেছে, এই মন আর এই আখড়া নিয়ে নয়ান আবার নূতন করে পাতবে জীবন।

আজ সমস্তদিনের কর্ম-চঞ্চলতার মধ্যে ভাবনার একটুও বিরাম ছিল না নয়ানের, আর যতই ভেবেছে ততই এই কথাটাই স্পষ্ট হয়েছে তার কাছে যে ভালয়-মন্দয় যা হয়ে গেল তার মধ্যে কিছু ভুল হয়নি—একটা অপরিসীম বিশ্বাস আর কৃতজ্ঞতায় ক্রমাগতই ঘুরে ফিরে মনটা রাধারমণের পায়ে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। ভিখারীর কথাই ধরা যাক না—কোথা থেকে কি ভাবে অমন করে এসে না পড়লে সমস্ত উৎসবটা কি বিষ হয়ে থাকত না নয়ানের কাছে? একটা

অতবড় লোককে কেন্দ্র করে সমস্ত ব্যাপারটা, নয়ান বিরূপ হয়ে মুখ ঘুরিয়ে থাকলে কী অপবাদই না পড়ে যেত আখড়াটার ওপর! আর মুখ ঘুরিয়ে থাকাই শুধু কেন?—সে তো নিজেকে চেনে; আক্রোশের বশে সে খোলাখুলিই তার বিরূপতার পরিচয় দিয়ে একটা বিপ্লব এনে ফেলতেও পারত না কি? গোড়াপত্তন তো হয়েই ছিল সোনাকে দিয়ে।

ঐ ভিখারীই কি সেটুকু হতে দিলে না তার উপস্থিতি দিয়ে? তারপর যখন গেল তখন তাকে কি আরও মুক্তই করে দিয়ে গেল না?

তারপর, ভিখারীর সূত্র ধরেই অনঙ্গর সঙ্গেও কি একটা চরম বোঝা-পড়া হয়ে গেল না কাল রাত্রে বারুণীর তীরে? একেবারে সম্বন্ধ কাটিয়ে দেবে বলেই তো নিয়ে গিয়েছিল টেনে তাকে, পরিণামে পেল তার এক যেন নূতন পরিচয়; দেখলে শত সংঘাতের মধ্যেও সে বদলায় নি, নয়ানের গলার মালাটি বুকের মধ্যে সংগোপনে নিয়ে তারই জন্যে আছে বসে।

সমস্ত দিনের চিন্তাগুলা, এই নূতন পরিবেশে আরও একটা শান্ত স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে ঘুরেফিরে আসছে মনে। মন্দিরের ধূপ-গন্ধে একটা যেন দেব-মুখী আহ্বান—মাঝে মাঝে ফিরে চাইছে নয়ান রাধারমণের পানে। মনে হচ্ছে মুখের অনির্বচনীয় হাসিটি কি একটা অশ্রুত ভাষায় মুখর হয়ে উঠছে যেন।

অনেকক্ষণ একঠায় বসে রইল। রাত্রি চলল বেড়ে। স্তব্ধতা হয়ে উঠল আরও নিটোল। ওদিকের কোন হাঙ্গাম রাখে নি, আজ শীতল-আরতির ভোগ খেয়েই কাটাবে। একবার শুধু প্রদীপটা ভাল করে উসকে দিয়ে আবার এসে বসল নয়ান।

মন্দিরের ভেতরে যেতে রাধারমণের কাছাকাছি হয়ে বুকটা যেন হঠাৎ উথলে উঠল। ফিরে এসে বসতেও চোখ দুটো হঠাৎ ছল-ছলিয়ে উঠল নয়ানের। সবই তো ঠিক, সবই তো ভাল, তবুও হঠাৎ বুকটা যেন হু-হু করে উঠল। কেন, বোঝা যায় না তো, শুধু কতদূর কোথা থেকে কার যেন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত —সব ভালো সব ঠিক-এর ওদিকে একটা যেন মস্তবড় কি বাকি থেকে গেল—কে যেন ডেকেছিল কি এক অভিসারে, নয়ান বেরিয়েও ছিল—তারপর —তারপর...

এই সময় অনঙ্গর বাঁশি হঠাৎ উঠল বেজে। কাল আর বাজানো হয় নি, নয়ান যে সুরটি সবচেয়ে করে পছন্দ—ব'লে ব'লে কতবার বাজিয়েছে, ঠিক

সেই সুরটিই স্তব্ধ আখড়াটাকে দিলে চকিত করে। নদীর তীরে নয়, আখড়ার কোথাও নয়, ঘরের মধ্যে থেকেই সুরের ডাক দিয়েছে অনঙ্গ।

বেদনাটা এক মুহূর্তেই স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠল। যেখানে বসেছিল, রাধারমণের দিকে মুখ করে সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল—একটি অস্ফুট অনুযোগ মুখে—ঠাকুর আবার কেন এ প্রবঞ্চনা?—ফিরে তো এসেছিলুম, আবার কেন ঐ মায়ার বাঁশি বাজিয়ে ফেলছ দূরে ঠেলে?

তেইশ

দিন ভালোই, রাত্রিও সহনীয়, অন্তত তার একটা স্পষ্ট রূপ আছে; কিন্তু দিবা আর রাত্রির মাঝামাঝি যেখানে, সেই সন্ধ্যার সুরটা বড় অশান্ত, বড বিষাদময়।

আসল কথা মানুষ অস্পষ্টতা জিনিসটাকে সহ্য করতে পারে না। নয়ানের জীবনে এসে পড়েছিল সন্ধ্যার এইরকম এক অস্পষ্টতা, পূরবীর বিষণ্ণ সুর উঠেছিল ঘনিয়ে।

এই অস্পষ্টতার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যই নয়ান গভীর রাত্রে অনঙ্গকে বারুণীর তীরে নিয়ে গিয়েছিল। আখড়া থেকে নিয়ে গিয়েছিল বহু দূরে—সে যেন বর্তমান জীবন থেকে—তার স্মৃতি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা বোঝা-পড়া করা। বললও একেবারে চরম কথাটি—গোসাঁই, আমায় ছেড়ে দাও এবার।

কিন্তু দেখল, যে-মালা বদল করে একদিন দিয়েছিল ধরা ওর হাতে, সেই মালা এখনও রয়েছে তেমনি টাটকা, তেমনি অম্লান!

আবার বাহুবন্ধনে ফিরে এল নয়ান।

কিন্তু অশান্তি কি এত সহজে যায়?—জাত-বোষ্টমের মেয়ে, দূরাভিসারের বাঁশিই যে তার জীবনের পরম সত্য। সেই আশঙ্কাই থেকে যায় মনে—এ পাওয়া, না হারানো?

ঘরের বাঁশি কানে যেতে সেই আশঙ্কাতেই নয়ান রাধারমণের কাছে পড়েছিল লুটিয়ে।

কতক্ষণ পড়েছিল বলতে পারে না, তবে এক সময় মনে হোল কাছের বাঁশি

মিলিয়ে গিয়ে দূর-দূরান্তে কোথায় এক সুর উঠেছে জেগে; অতি ক্ষীণ, সমস্ত চৈতন্য কানে জড়ো ক'রে এনে তবে যেন যায় শোনা। কিন্তু ঐটুকুতেই সারা অঙ্গ যেন কদম্ব পুষ্পের মতো পুলক-কণ্টকিত হয়ে ওঠে।...চেনা সুর যে—রাধার—বৃন্দাবনের সুর, অনন্ত অতীতে কবে এই সুরের ক্রন্দনেই না লাজ-লজ্জা, কুল-মান সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল?...তারপর জন্ম-জন্মান্তর নিয়ে সে কি দুঃসহ বিরহ—কোটী জন্মেও যেন তার আর শেষ নেই!.. অনন্ত তামসী রাত্রি, অশ্রু-পিচ্ছিল পথ—চলেছি—চলেছি।...চলবই আমি, শুধু হে শ্যাম, তোমার মুরলীটি একবার তুলে ধরো, একটু দিক-সংকেত দাও—একটুখানি...

পেয়েছে সেই দিক-সংকেত নয়ান। বাঁশির সুর। অতি ক্ষীণ, তা হোক; নয়ানের সমস্ত তনুমন এখন গতিবান—নিঃসংশয় প্রত্যয়ের আনন্দ যমুনার তরঙ্গের মতোই দেহতটে পড়ছে আছড়ে। এবার তো পাবেই। এ বাঁশিতে যে তারই কান্নার সুর—শ্যামও যে তারই মতো অসীম প্রতীক্ষায় রয়েছে উন্মুখ হয়ে—সেও যে—"পলক ফেলে মানয়ে মনে বিতিয়া গেল যুগ..."

বাঁশির সুর স্পষ্ট হ'তে হ'তে কোথায় এসে একসময় থেমে গেল।...মিলন যে; ক্লান্ত অভিসার যে শেষ হোল! · বিরহই বা ছিল কোথা? সে ছিল চির মিলনের মধ্যেই একটা দুঃস্বপ্ন, ছলনাময় শ্যামের আর একটা ছলনা। নয়তো রাধারমণের বিগ্রহের অন্তরালে একটু লুকিয়ে শ্যাম তো নিত্যনিয়তই ছিল তার পাশে পাশে, সেই আড়াল থেকেই না বেরিয়ে এসে তার একেবারে কাছটিতে এসে এই দাঁড়িয়েছে—বসল তার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে...

কী দুঃসহ পুলক! নয়ান এবার দেখবে আশ মিটিয়ে। কিন্তু পুলকই যে পাষাণভার হ'য়ে চোখ দুটিকে রেখেছে বুজিয়ে...

চোখ মেলে নয়ান অপলক দৃষ্টিতে অনঙ্গর মুখের দিকে রইল চেয়ে। মাথাটা নিচে যে লুটিয়েছিল, অনঙ্গ সে কখন কোলে তুলে নিয়েছে; কণ্ঠে একখানি হাত, নত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর মুখের পানে।

বলল—"এখানে এসে ঘুমিয়ে পড়েচিস? রাত যে অনেকখানি হোল।"

স্বপ্নের ঘোরটা কাটে নি, সত্যকে চিনতে পারছে না, চেয়েই রইল নয়ান ফ্যালফ্যাল ক'রে।

"ওঠ্, চল্ ঘরে।"

তুলে বসিয়ে দিতে নয়ান আবার রাধারমণের ওপর থেকে দৃষ্টিটা মন্থরভাবে বুলিয়ে নিয়ে এল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, একটু খুব সূক্ষ্ম হাসি হেসে নিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে উঠতে বলল—"হ্যাঁ, চলো ঘরেই যাই। · রোস, কপাটটা দিয়ে দিই।"

হঠাৎ কি মনে হ'তে একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—"তুমিই না হয় দিয়ে দাও গোসাঁই ; সেই ঠিক হবে।"

ঘুম-ভাঙা চোখে একটা নূতন রকম হাসি নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনঙ্গ বলল—"কেন, তোর কি হোল ? · খেয়ালী মেয়ে !"

"বাঃ, তুমিই ঘরে ডেকে নিয়ে যাচ্চ রাধারমণের কাছ থেকে !"

"গেলুম ; তাতে হয়েছে কি ?···বেশ, দে, আমিই বন্দী করে যাই ; বড় জ্বালাচ্চেন আমায় তোর রাধারমণ।"

"কিন্তু তিনি যে বন্দী হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়েচেন। আর, জানো গোসাঁই ?"

তালায় চাবি দিতে দিতে অনঙ্গ প্রশ্ন করল—"কি, বল্।"

"যে গায়ে লেপটে থাকে তাকে আঘাত করাও যায় না, বন্দী করাও যায় না।"

"অন্তত বন্দী করা যায় বৈকি।"

নয়ানকে বাহু-বেষ্টনে বন্দিনী করে বাড়ির দিকে অগ্রসর হোল।

এদিকে নূতন তেমন কিছু আর ঘটে নি। শান্ত, নিরুদ্বেগ গতিতে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত—তিনটে ঋতু বয়ে গেল আশ্রমের ওপর দিয়ে। ঘটে নি, তার কারণ হয় তো যে, ঘটবার সরঞ্জাম যা একত্র হয়েছিল সেসব রয়েছে অনুপস্থিত। আষাঢ়ের শেষাশেষি একটা বেশ বড় দল তীর্থ-পরিক্রমায় বেড়িয়ে পড়ল। স-পরিবার কুমারবাহাদুর ; এদিক থেকে গেল বিন্দু বোষ্টমী, ভূষণ আর প্রসাদ। প্রসাদ গেল অনঙ্গর সুপারিশে। শ্রাবণে ঝুলনটা ওরা বৃন্দাবনেই দেখল, তারপর দু'টো মাস ঐ দিকেই কাটিয়ে, দুর্গাপূজার মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য মৈনেতে ফিরে এসে আবার নেমে পড়ল দক্ষিণের দিকে, রামেশ্বরম পর্যন্ত দৌড়। সমস্ত শীতটা কাটবে ঐদিকেই।

আখড়ায় ছোট-খাট পর্ব-উৎসবগুলা নিতান্ত গতানুগতিকভাবে গেল কেটে। বড় একটা ছিল শ্রাবণ মাসে···কিন্তু এবার বর্ষাটা হোল বেশি,

কাছাকাছি যেন আরও এল চেপে। উৎসব বলতে কিছু করে ওঠা গেল না। নয়ানের ইচ্ছা ছিল অন্তত পদ্মমণিকে আনায়, তাও হয়ে উঠল না।

কিন্তু ওদিক দিয়ে কিছু ঘটতে পেল না বলেই (ভালোই হোক বা মন্দই হোক), অন্য দিক দিয়ে জীবন আরও সার্থক, আরও পূর্ণ হয়ে ওঠবার পেল অবসর। হ্যাঁ, পূর্ণ হওয়াই বৈকি। ঐ বারুণীর কথাই ধরা যাক।—

বৈশাখে কাল-বৈশাখী উঠত, ঢল নামত নদীতে, উচ্চকিত বারুণী চারিদিক করে তুলত উচ্চকিত ; তারপর বর্ষার প্লাবন, অবিরাম ধারাপাতের ওপর কত দিক থেকে কত স্রোত নেমে বারুণীর স্রোতকে করে তুলত আবিল, আবর্ত-সঙ্কুল, বিভ্রান্ত ; ক্ষিপ্ত বারুণী দুকুল ভেঙে পড়ত ছড়িয়ে। কিন্তু বারুণীর সেই কি আসল রূপ ? সেই কি তার পূর্ণতা ?

তাহলে এটা কি ?—এই যে তটসমাহিত, স্বচ্ছ, নিস্তরঙ্গ, অচপল স্রোত, তার বুকে অনন্ত নীরব আকাশের প্রতিচ্ছবি, এই যে বালুর চরে জল-বিহঙ্গমদের শান্ত নিরুদ্বেগ গতিবিধি ; আর এই যে নূতন এক প্লাবন—দুদিকের তটভূমি আচ্ছন্ন করে ফসলের বন্যা—হরিৎ-পীতের প্রসন্ন হাস্য—এও কি শীর্ণকায়া বারুণীর পরিপূর্ণতা নয় ?

নয়ান এইভাবে আস্তে আস্তে হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ ; নিজেকে পেয়ে, নিজের যা তাকে পেয়ে, তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে। একটা তেমন চোখ-ধাঁধানো বড় কিছু না হোক, ধীর-সঞ্চারে, অনাড়ম্বর ভাবেই, তবু মস্ত বড় একটা কিছু তো হ'য়েই গেল : ভাবতে পারত নয়ান ?—এতবড় একটা ব্যাপার—সদলবলে কুমারবাদাদুর দেশ-দেশান্তর গেল ঘুরে আসতে—নয়ান জানে উপরোধের কসুর হয় নি, তবু অনঙ্গ কিন্তু গেল না ! নয়ান পর্যন্ত বলেছিল ; অবশ্য মুখের বলা, একরকম যাচাই করাই, অনঙ্গ ঠাট্টা করে হেসে উত্তর দিল—"বৌ, কত বড় পুণ্যবান আমি দেখ্‌না—এক তীর্থে গিয়েছিলুম, তা ঠাকুর সদ্য সদ্য সুফল দিলেন। মেলা লোভ করাও তো ঠিক নয় ; তীর্থে তীর্থে ঘুরে অত ফল একত্র ক'রে রাখব কোথায় ?"

যাদের নিয়ে ছিল ভয়—অন্তত সংশয়, তারা গেছে স'রে, দু'জনে দু'জনের মধ্যে নিবিড় হ'য়ে কাটিয়ে দিল কটা মাস। ওদের নিবিড় করে এনেছে বর্ষার অবিরাম ধারা, শরতের জ্যোৎস্না, হেমন্তের ম্লান গোধূলিও ; সব কিছুর মধ্যে সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে ওরা ক্রমেই গেছে পরস্পরের মধ্যে বিলীন হ'য়ে। সমস্ত মুছে গিয়ে দুয়ে মিশে এক হয়ে থাকা—এই পূর্ণতাই তো পূর্ণতা।

এর সঙ্গে আরও আছে ; সেটা যেন বারুণী-তটের সোনার ফসল। সে এক অপূর্ব উপলব্ধি, ভাবতে গেলেই অসহ্য আনন্দে চোখ দুটি বুজে আসে নয়ানের। এত সম্ভাবনাও লুকিয়ে ছিল তার জীবনে!

অনঙ্গকে এখনও জানাতে পারে নি। সব লজ্জা কাটিয়ে ওঠা যায়, এ নিগূঢ় আনন্দের লজ্জা যেন কাটিয়ে উঠতে পারছে না নয়ান। হয়তো চাইছেই না কাটিয়ে উঠতে। একদিন তো বলবেই, যতদিন না বলছে ততদিন বলার সেই পরম আনন্দ, পরম লজ্জার মুহূর্তটিকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে না কি?

তবে সম্পূর্ণ অপ্রকাশও নেই। সোনা তো রয়েছে, নারীর সাধারণ ধর্মেই সে টের পেয়েছে। আজকাল পেয়ারী যখন বায়না ধরে, কি, এমনই নয়ানের আদরের একটু বাড়াবাড়ি দেখে, সোনা মিষ্টি ক'রে খোঁচা দেয়—"হ্যাঁ, খেয়ে নে আদর যতদিন পাস, এবার যার হকের আদর সে আসচে, তাহলেই ..."

"তাহ'লেই তোর নির্বাসন, এই বলবি তো?"—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রশ্ন করে নয়ান, বলে—"বলে নে তুইও সোনা, যতদিন না আসচে সে, তারপর দেখবি আদর আরও বাড়ে কি কমে।...যে আসচে তার জন্যেই তো আদর পেয়ারীর, নইলে পরের মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে ব'য়ে গেচে আদর করতে আমার, কথায় কথায় মেয়ে নিয়ে যা ঠ্যাকার। মেয়ে নিয়ে যা চোখরাঙানি!"

কপট-গাম্ভীর্য ঠেলে হাসি ফুটে ওঠে মুখে। সোনা চোখ কপালে তুলে বলে—"ওমা, কবে ঠ্যাকার দেখালুম, কবে চোখরাঙানি দেখলে নয়ান-ঠাকুরঝি? ছ্যাখো, অধম্মের কথা!"

নয়ান যেন শুনেও শোনে না, শুধু ঠোঁটে হাসিটা লেগে থাকে। পেয়ারীকে বুকে চেপে দুলতে দুলতে নিজের কথারই জের ধরে বলে - "তার জন্যেই তো আদর পরের মেয়ের। একজনের আদর দুজনের মধ্যে ভরাট হয়ে উঠবে আমার। পরের মেয়েকে আপন করে নোব বলেই তো..... "

"তাহলে আগেই হুঁশ করা উচিত ছিল গো ঠাকরুণ; হিসেবে ভুল হয়ে গেচে। মেয়ে আমার তিন বছর এগিয়ে ব'সে আচে, যাকে নিয়ে তোমার এই মতলব সে আসতে আসতে চার বছর পেরিয়ে যাবে।...ভাবিতে উচিত ছেল প্রেতিজ্ঞা য্যাখন!"

মাথা দুলিয়ে চোখ নাচিয়ে যেমন বলে। নয়ান খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বলল—"রঙ্গ দেখো পোড়ারমুখীর!"

হাসিই চলে একটু। তারপর খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলে—"হিসেব ভুল

আমার, না, তোর? বোষ্টমের সন্তান, চিরকিশোরকে নিয়ে যাদের রসের কারবার, তারা আবার বয়েসের হিসেব নিয়ে কবে মাথা ঘামিয়েচে লা?"

"ওসব সেই চিরকিশোরের বেলায়ই মানায়, দেবতার নীলে-খেলা, আমাদের মানুষের বেলায়…"

নয়ান বাধা দেয়, কপট গাম্ভীর্যে বলে…"তার মানে তুই দিবিনে তোর মেয়েকে—এই তো?…তবে যে এখুনি বলছিলি মেয়ে নিয়ে ঠ্যাকার-চোখরাঙানি নেই?"

সোনা একটু থতমত খেয়ে যায়। বলে—"মেয়ে আর আমার মেয়ে আচে কিনা যে আমার দেওয়ার ওপিক্ষে! যেটুকু আচে তাও না হয় পাট্টা-কেবালা ক'রে দিচ্চি, তোমার পেয়ারী তোমার কাছেই থাক্। আমি বলচিনু মানুষের যা রেওয়াজ সেই কথা। তার ওপর নিজের পায়েই কুড়ুল মেরে ব'সে আচ যে, বৌকে যা ক'রে তোয়ের করেচ, তার ওপর বয়েসে এগিয়ে থাকলে ছেলেকে তোমার যে বুড়ো-আঙ্গুলে টিপে রাখবে। হিসেবের ভুল হচ্চে না যেন!"

"বয়েসে পিছিয়ে থাকলেও রাখে টিপে।"

"দেখি নি তো আজ পজ্জন্ত।"

"দেখবি কোথা থেকে, নিজের দিকে কি চোখ যায় কারুর? তবে, পাঁচজনে দেখচে। বলি, তুই পোড়ারমুখী লক্ষ্মণের চেয়ে কত বড় শুনি? অথচ · "

কথাটা সে ঘুরিয়ে তারই ওপর নিয়ে আসবে একেবারে ভাবতে পারে নি সোনা। হঠাৎ বিপর্যস্ত হ'য়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে উঠল—"অথচ কি বলচ?—জিগোও গে দিকিন আগে ওই ঠ্যাঙাত কি না আমায়…"

নয়ান কতকটা ওর ভাবগতিক দেখে, কতকটা একটা নূতন কথা পেয়ে একেবারে ডুকরে হেসে ওঠে, বলে—"হাঁরে, তুই ঠ্যাঙাচ্চিসও নাকি ওকে আজকাল? একে তো হাড়ির হাল ক'রে রেখেচিস বেচারীর। বলে কিনা আগে ওই ঠ্যাঙাতো…তার মানে তো এই দাঁড়ায় ঐ আবাগীই এখন উল্‌টে শোধ নিচ্চে·· "

আঁখর দিয়ে দিয়ে বলে আর দুলে দুলে হাসতে থাকে। সোনা যতই জ্বালাতন হয়ে ওঠে, যতই যায় সামলাতে, ততই ওর হাসি যায় বেড়ে। হাসি-মস্করার কথা কিন্তু গড়িয়ে গড়িয়ে যেখানেই গিয়ে পড়ুক, শেষপর্যন্ত

সেই একই কেন্দ্রে আসে ফিরে; পেয়ারীর মুখটা একটু তফাতে ঠেলে ধ'রে প্রশ্ন করে নয়ান—"হ্যাঁলা, তুইও আমার ছেলেটাকে ঠ্যাঙাবিনে তো তোর মার মতন? তাহলে বল্।"

সোনা আপত্তি করে—"অধম্মের কথা শুনিওনি বাপু নিষ্পাপ শিশুকে..."

ওর কথায় কান না দিয়ে নয়ান বলে—"ছলা-কলা দিয়ে বশ ক'রে রাখিস, তোর মা যেমন তোর বাবাকে ক'রে রেখেচে, আপত্তি নেই, কিন্তু..."

পেয়ারী বলে—"তলা খাব।"

আরও ঠেলে দেয় নয়ান, বলে—"হ্যাঁ, আমি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষি! তুই ঠিক মারবি। ঐ মায়ের মেয়ে, তায় বয়সেও হবি বড়, ঠিক মার ধরবি তুই। যা, বেরো, কাজ নেই আমার এমন বৌ করে..."

যখন সোনা থাকে না, অযথাই বুকে চেপে চেপে ধরে পেয়ারীকে। ওর মধ্যে দেখে অনাগতের প্রতিচ্ছবি; আদর ক'রে, আবোল-তাবোল ব'কে যেন আশ মেটে না; চুমায় চুমায় বোঝাই করে—যেন নিজের দেহের মধ্যে কোথায় কচি পাতার মতো দুটি রাঙা ঠোঁট দিচ্ছে আরও রাঙিয়ে।

অনঙ্গ একদিন হঠাৎ টের পেল—

পৌষের দুপুর গড়িয়ে গেছে। দাওয়ায় এই সময় একফালি রোদ এসে পড়ে। আজকাল একটা আলস্য লেগে থাকে; একটু ঘুমিয়ে উঠে মিষ্টি রোদটুকুতে পিঠ দিয়ে চুল এলিয়ে ব'সে ছিল নয়ান। অনঙ্গ নেই। ও বাড়ি না থাকলে একটা ছোট্ট উলের জামা বোনে নয়ান আজকাল, সেইটে নিয়ে ব'সে ছিল, এমন সময় বাঁশের আগলের বাইরে শব্দ উঠল—"জামা—বেলাউস্—পেনি—ফ্রক!—চাই নাকি গো দিদিমণি!"

তারণ-ব্যাপারী, কাটা কাপড়ের ফিরি ক'রে বেড়ায়, দু'মাস তিনমাস অন্তর আসে। নয়ান ডাক দিল।

পেয়ারীর জন্য দু'টো ফ্রক নিল, যেমন নিয়ে থাকে; তার সঙ্গে বেছে বেছে ছোট্ট একটি নিকার-ব্রোকার এবার।

তারণ প্রশ্ন করল—"এবার ছেলের পোশাকও নিলে যে দিদিমণি?"

এক ঝলক রক্ত ঠেলে উঠে মুখটা রাঙিয়ে দিল নয়ানের, হেঁট হয়ে ছিল ব'লে তারণ টের পেল না। উত্তরটা ঠিক করাই ছিল, বলল—"পেয়ারীর ভাই আসবে।"

"আহা আসুক, বেঁচে থাক। সেই কথা তো রাধারমণকে বলি—দল বেঁধে

আসুক সব গাঁয়ে—কতদিন আর বাইরে বাইরে ফিরি ক'রে বেড়াব? তুমিই বলো না দিদিমণি।"

"বটেই তো। তা, বলিস নি কিন্তু কাউকে। সোনা চায় না।"

জিভ কাটে তারণ—

"এই দেখো, তা কখনও বলে? কানাই য্যাখন লুকিয়ে থাকে, প্রেকাশ ক'রে কে পাপের ভাগী হবে দিদিমণি?"

কথাটায় কি আছে, খোলাখুলি একটু হেসে বাঁচল নয়ান। তারণ বলল —"তা ঐ সঙ্গে একটা মেয়েছেলের ফ্রাকও কিনে রাখো না দিদিমণি; কানাই আসবেন, কি রাইমণির দয়া, বলা তো যায় না।"

সরল প্রাণের কথা, তবু লজ্জা যেন ঘিরে ফেলেছে নয়ানকে। একটু হেসেই বলল—"তুই যা এখন। সোনা বলেচে—এবারেও মেয়ে হলে তাকে কলার ভ্যালায় করে বারুণীর জলে ভাসিয়ে দেবে।"

তারণকে বিদায় ক'রে আবার তেমনি রোদে পিঠ দিয়ে জামাটাকে উলটে-পালটে দেখছিল নয়ান। পেছন ফিরে রয়েছে, তার ওপর মনের মধ্যেও কত কথা ওলট-পালট খাচ্ছে তো, অনঙ্গ কখন্ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে টের পায় নি। অনঙ্গ এসেছেও পা টিপে টিপেই; আজকাল সুবিধে হলেই একটু লুকোচুরি খেলা চলছেই তো। একেবারে পেছনটিতে এসে প্রশ্ন করল—"কিনলি এখুনি?…তা ব্যাটাছেলের বোধ হচ্চে যেন!"

কথাটা ভালো ক'রে কানে যেতে না যেতেই নয়ান একবার চকিতে ঘুরে চেয়ে নিয়ে জামাটা বুকের কাছে লুকিয়ে ফেলল। ঘাড়টাও ফেলেছে গুঁজড়ে; অনঙ্গ পাশে ব'সে প'ড়ে হাতটা আলতোভাবে পিঠের ওপর রাখল, প্রশ্ন করল —"কিরে, কথা কইচিস না যে?"

তারণ-ব্যাপারীকে যা বলল সেই কথাই বলল নয়ান—"পেয়ারীর ভাই হবে…তাই….. "

মাথাটা আরও গুঁজড়ে দিয়েছে—এবার একটু হেলে প'ড়ে স্বামীর বুক ঘেঁষেই। অনঙ্গও একটু উষ্ণ চাপ দিল, প্রশ্ন করল—"তাতে তোর এত লজ্জা কিসের বল্?"

পিঠের ওপর আস্তে আস্তে ডান হাতটা টেনে দিতে দিতে বলল—"এমন একটা কথা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলি বৌ?"

চব্বিশ

আরো দুটো মাস কেটে গেল। দোল এগিয়ে আসছে।

ওদিককার উৎসব-পর্বগুলো নমো-নমো করে সেরেছে, দোলটা বেশ ঘটা করে করবে নয়ান। কুমারবাহাদুরও তাঁর দলবল নিয়ে দোলের আগেই আসছেন ফিরে। ওদিকে যে জাঁকজমক হয়ে গেল আখড়ায় তা কুমারবাহাদুরের টাকায়, নয়ানের ইচ্ছা এবার দোলের সময় একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে আনবে তাঁকে। ওটা ছিল ওঁর নিজের পাঠানো দলের গাওনা শুনতে আসা, ওঁর নিজের টাকা কি ক'রে খরচ হচ্ছে দেখাতে। এবার নিতান্তই আখড়ার তরফ থেকে।

আসল কথা, অন্তরে-বাহিরে যে পূর্ণতা সেটা যেন ওকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে, কিছু একটা না করিয়ে ছাড়তে চাইছে না।·····পরামর্শ চলছে—গোসাঁইঠাকুরের সঙ্গে, অনঙ্গর সঙ্গে। তোড়জোড়ও হয়েছে কিছু কিছু। প্রসাদ নেই, তেমনি অনঙ্গ উঠে পড়ে লেগেছে। বায়না হয়ে গেছে কয়েক জায়গায়। পদ্মমণি আসবে। বায়না কোন মতেই ধরল না। বলেছে আসবে রাধারমণের সেবায় আর নয়ানের টানে। যখন দেন, জীবনটা চারিদিক দিয়ে এত সার্থক কী ক'রে ক'রে দেন রাধারমণ—নয়ান তো ভেবেই পায় না!

এবার বাইরেও কি দু'হাতে দিচ্ছেন লুটিয়ে? পলাশ—কাঞ্চন—মউল—বকুলের বর্ণে গন্ধে যেন বোঝাই হয়ে রয়েছে আখড়া। গাছে গাছে লতা, ফুলের ভারে এত লুটিয়ে পড়েছে, গাছগুলো যেন আর বইতে পারছে না ওদের বোঝা।

দোলের সময় আরও ডাকবে রংয়ের বান, গন্ধে বাতাস আরও হয়ে উঠবে উতলা।

এইসব আলোচনা করতে করতেই বারুণীতে গা ধুয়ে আখড়ার দিকে আসছিল নয়ান আর সোনা। সোনা বলল—"দোলের সময় তোমার খোকা ঠিক চার মাসেরটি হবে।"

নয়ান কপট ধমক দিয়ে উঠল—"নে, তোর ঐ এক চিন্তে! কোথায় কি তার ঠিক নেই······চার বছর বললি নে কেন?"

সত্যই মনটা সর্বদা ভরে থাকে ঐ চিন্তায়, সময় নেই অসময় নেই, বেফাঁস

বলে ফেলে, ধমক খায় সোনা। একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠে বলল—"না, পেটে চার মাস বলছিলুম।"

আগল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে নয়ান এবার একটু হেসে কি বলতে যাচ্ছিল, দেখে পলাশবাটী গাঁয়ের এককড়ি পালের বৌ হন্তদন্ত হয়ে ওরই বাড়ীর দিক থেকে এগিয়ে আসছে। প্রশ্ন করল—"কি গা বেনেবৌদি, অমন করে…… ?"

পালবৌ যেন হাতে স্বর্গ পেল, বলল—"এই যে এসে গেচ! আমায় একটু রাধারমণের চন্নামৃত দেও দিদি……বুঝি বাঁচাতে পারব না নাতিটাকে।"

নয়ান মুখ শুক্‌নো করে প্রশ্ন করল—"কি হয়েচে ?"

"মা একেবারে সারা অঙ্গে ঢেলে দিয়েচেন—গা ধুয়েই তো আসচ, চলো সোজা মন্দিরেই।"

যেতে যেতে সোনা বলল—"মার দয়া, তোমার তো শিবতলার মা-শেতলার দোর ধরতে হবে।"

"তিনকোশ পথ—এদিকে নড়বার জো নেই কাছ থেকে। একলা মানুষ তো।"

একটু থেমে, কতকটা যেন দুজনকেই খুশী রাখবার জন্য বলল—"পলাশ-বাটীর মা-শেতলা রাধারমণই।…ঠেকিয়ে তো রাখুন, একটু ছুটি পেলেই গিয়ে তাঁর পায়েও মাথা খুঁড়ে আসব।"

চরণামৃত নিয়ে চলে গেলে সোনা বলল—"নিয়ে যাক, বিশ্বেসই তো সব, তবে এক দেবতার কাজ অন্য দেবতাকে দিয়ে নাকি করিয়ে নিতে নেই বলে শুনেচি; আমরা তো ভারী জানি!"

হঠাৎ কিরকম যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ পেয়ারীকে নিয়ে আসছিল, সোনা বলল—"তুই মায়ের কোলের মেয়ে বাপকে দিয়ে বওয়াস না যেন!"

হালকা করে ফেলবার জন্য বলা। কিন্তু সোনা মুখটা ভারীই ক'রে রইল।

এককড়ির নাতি ছিল প্রথম, তারপরেই পলাশবাটী নিয়ে চার পাঁচখানা গ্রাম বসন্তের মহামারিতে টলটলায়মান হয়ে গেল।

শেষে এদিকেও দিলে ধাক্কা। উদ্ধব পড়ল। তবে হাম, অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেল। তারপরেই ধরল নয়ানকে।

সোনা এককড়ির বৌকে উদ্দেশ করে যা-তা গালাগাল ঝাড়তে লাগল। নয়ান হেসে বলল—"তুই চুপ কর দিকিন। হাম বৈ ত নয়। ছিটকে এসে পড়েচে, তোর চেঁচামেচিতে মা-শেতলার টনক নড়লে আসলকে দেবেন পাঠিয়ে।"

হামই, কিন্তু লাট খেয়ে গেল। বাইরে বেরুল অল্পই, এখানে ওখানে গোটাকতক করে ক্ষুদে-ক্ষুদে রাঙা দাগ—কিন্তু ভেতরটা যেন একেবারে ছার-খার করে দিলে। সাতটা দিন সোনা আহার-নিদ্রা ভুলে যমের সঙ্গে লড়াই করল। বাজে খাটানো হয়েছিল বলে রাধারমণের চৌকাঠে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে কপালটার আর কিছু রাখল না। শিবতলায় গিয়েও আর বাকি-বকেয়া না রেখে বুক চিরে মা-শেতলাকে নগদ রক্ত দিয়ে এল। এর ওপর একথাও মনে করিয়ে দিয়ে এল মাকে যে, দোষটি আসলে এককড়ি পালের বৌয়ের, তাকে বাদ দিয়ে নয়ানকে ধরা—তাঁর কাছে এমন অবিচার মানুষেরও কল্পনাতীত।

অনঙ্গ বাঁশির ফুঁএর মত হাল্কা জীবনে অভ্যস্ত, একেবারে দিশেহারা হয়ে কাটাল কটা দিন। কাউকে ডাকেনি কখনও, ডাকতে শেখেও নি। অনুযোগও কার কাছে করতে হয় জানে না। এক-একবার বাইরে যায়, আবার ভেতরে এসে চুপটি করে যেন কার কাছ থেকে আগলে বসে থাকে নয়ানকে।

শেষের দুটো দিন একরকম অচৈতন্য হয়েই রইল নয়ান, তারপর যেন কতদূর থেকে আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগল।

ভাল হয়ে উঠল, করাল ব্যাধির নখ-দন্তাঘাতের কোন চিহ্নও নেই বাইরে। ভেতরটা কিন্তু একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল। পেটের শিশুটিও গেল নষ্ট হয়ে।

একটা একেবারে নূতন জগতে যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠল নয়ান। নিজের দেহমন থেকে নিয়ে আখড়ার যতটুকু পর্যন্ত দেখা যায় ঘরে শুয়ে শুয়ে সব যেন অদ্ভুত ভাবে হাল্কা, একটা যেন সীমাহীন শূন্যতা, তাতে কিছুই নেই, সুখ-দুঃখের অনুভূতি পর্যন্ত নয়।

অত সাধের দোল-যাত্রা, চোরের মত পা টিপে টিপে এসে কখন যে আখড়ার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল, টেরও পেল না নয়ান। ভূষণ, প্রসাদ, বিন্দু—কেউই আসেনি; মহামারির খবর পেয়ে কুমারবাহাদুর দলবল নিয়ে ওদিকেই রয়ে গেছেন।

ফাল্গুন গিয়ে চৈত্র এল, বিদায়ী বৎসরের একটি উদাস দীর্ঘশ্বাসের মতই!

শরীরটা একটু একটু সুধরে আসছে। দাওয়ায় এসে বসে থাকে নয়ান। শরীরটা একটু সুধরেছে বলেই কিন্তু মনের শূন্যতা যেন আরও গেছে বেড়ে। সেটা আর কিছু নয়, এতদিন মনটা ছিল একেবারে অসাড়, এখন শূন্যতাটুকুকে যেন একটু বেশি করেই অনুভব করতে পারে। গাছগুলো, লতাগুলো সব বিশীর্ণ, হাওয়ায় যে গন্ধটা বোঝাই হয়েছিল—মাঝে এ কটা দিন ছিল কি না সাড়ই ছিল না—এখন অনুভব করে—তার জায়গায় একটা তৃষাতুর উত্তাপ—রসের সঙ্গে গন্ধটাকেও যেন জিব দিয়ে চেটে নিয়েছে।

আর অনুভব করে নিজের অন্তরের শূন্যতা।

মাত্র চার মাসের এতটুকু একটু সঞ্চয়—বেদনাকে বহন করবার ক্ষমতাটুকু ভালভাবে ফিরে এলে কি হবে বলা যায় না, কিন্তু এখন তার জন্য তেমন কোন বেদনা-বোধ নেই নয়ানের ; সেখানেও যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে রয়েছে।

ছেলেমানুষি কতকগুলা দোষ উঠেছে ফুটে ; বায়না, আব্দার, খিটখিটেও হয়ে পড়েছে একটু। বায়না খাওয়া নিয়ে। এই নিয়ে সোনার সঙ্গে প্রায় খিটিমিটি হয় ; টক, ঝাল, নোনতা—ঠিক যে কটি খাওয়া বারণ ওর তাই চাই। অনঙ্গর এলাকা নয়, অতটা লজ্জা কাটাতেও পারে না নয়ান, তবে লক্ষ্মণ তো রয়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে জুগিয়েছিল দুদিন, তারপর তার এদিকেই আসা বন্ধ করে দিয়েছে সোনা। নয়ানকে এ নিয়ে কিছু বলেনি, তবে টের পেয়েছে নয়ান। দিন চারেক না দেখতে পেয়ে ভেতরকার ঝালটা বের করে দিল। প্রশ্ন করল—"হাঁরে, লক্ষ্মণকে দেখিনে যে আর ? আচে কেমন ?"

সোনা কাজ করছিল না ফিরেই বলল—"ভালই তো আচে।"

"ভালই আচে তো, আসে না কেন শুনি একবারটি করে ? অনুগত ঘর, মানুষটা বেঁচে আচি কি মরে গেলুম একবার খোঁজ করবে না দিনান্তে ?"

"ও খোঁজ না করলেই বাঁচবে দুটো দিন।"

কথাটা বলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল অন্য কাজে, নয়ান একেবারে ঝঙ্কার ক'রে উঠল—

"মুখ সামলে কথা বলবি সোনা, এর অর্থ আমি বুঝি, রোগেই ভুগচি তা বলে এতটা বুদ্ধিনাশ হয় নি। তাহলে ঐ সন্দোতে তুই তার আসাটা বন্ধ করেচিস। বেশ, আমার কচি খুকির মতন নোলা হয়েচে, আমি চুরি করে আনাব, খাব, তুই পারবি ঠ্যাকাতে ?······না এলেই বাঁচব! মুখের আগল নেই একটা!····· তাহলে তুইও আর এ ভিটে মাড়াবিনি। লঙ্কার ঝালের

চেয়ে তোর কথার ঝাল আরও সাংঘাতিক, বরদাস্ত হবে না আমার ধাতে বলে দিচ্চি ·····”

পাশের ঘরে কাজ করা থেমে গেছে সোনার। দাঁড়িয়ে শুনছিল, এই ঘর দিয়েই গটগট করে বেরিয়ে গেল। অনঙ্গ ছিল মন্দিরের দিকে। দূরে যায় না আজকাল ; থাকেও সতর্ক, আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি চলে আসাতে তাকে শুনিয়েই নয়ান আবার নালিশের ঝড় তুলেছে, সোনা একটা ছোট ঢাকা সরা নিয়ে হন হন করে এসে উপস্থিত হোল। ওপরের ঢাকনাটা সরিয়ে সরাটা নয়ানের সামনে ঠক্ করে বসিয়ে আধা ঘোমটার আড়াল থেকে বলল—“এ-ই ভাল, বরদাস্ত হয় তো খাও। সে আসতে পারচে না, তবে জুগিয়ে রেখেচে ঠিক।”

নুনে-লঙ্কায় জরানো দুটো কামরাঙা, গোটা চারেক ব্যাসমের ঝালবড়া, দুটো গোটা টক-মিঠে আচারের তেঁতুল।

নয়ান মুখটা একটু ঘুরিয়ে বসে রইল। কিছু বলল না ; কিম্বা হয়ত একেবারেই হঠাৎ আর অকাট্য বলেই কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেল না। তবে সেইজন্যই বোধ হয় একটা বেপরোয়া ভাব কঠিন মুখটায় রইল ফুটে।

অনঙ্গ আস্তে আস্তে অন্য ঘরে চলে গেল।

খোশামোদও করে, সেও ছেলেমানুষের মতন কাত্‌রে-কাত্‌রেই ; অভিমান ক'রে, ভয় দেখিয়েও—

“কাল তুই তোর নন্দাইয়ের সামনে অমন অপ্রস্তুতে ফেললি সোনা, ফ্যাল্, তোর ধম্ম তোর কাছে আচে, তবে সত্যি কথা বলচি আমি ওর বিন্দুবিসর্গও জানি নে ; যা দিব্যি করিয়ে নিবি। তবে একটা কথা সোনা, রাখবি তো বলি, নইলে অপমানের ওপর অপমান হই কেন? · বলতুম না, তবে নেহাতই নাকি সামনে এসে ধরলি সরাটা। · ···পেটের শত্রুটা গেল, তবে মুখে কেমন একটা বিস্বাদ রেখে গেচে, তোর নন্দাই বুঝবে না, মেয়ে হয়ে তুই বুঝবি।··· ···তাই বলছিলুম—আর কিছু না, ঐ কামরাঙা থেকে একটা। · ···তুই হিসেব নিস, আমি চেখে চেখে সাতদিনে একটু একটু করে খাব, যা দিব্যি করিয়ে নিবি।····· বাবা বাবাঃ! কি গারজেন! মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল! বেশ লো, অসুখ কিছু শুধু আমারই হয় না ; তোলা রইল···”

অনঙ্গর কাছে বায়নাটা অন্য কথা নিয়ে—বাইরে নিয়ে চলো, একেবারে ভাল লাগছে না এখানে।

কথাটা তো ঠিক, রোগে ভুগে ভুগে, নিজের চিন্তা নিয়ে বারান্দায় পড়ে থেকে থেকে জীবন যে কি দুর্বহ হয়ে উঠেছে তা কি বোঝে না অনঙ্গ, কিন্তু করে কি এখন? আখড়ার বাগানটুকু ঘুরে আসতে বে-দম হয়ে পড়ে, ক'জায়গায় বসতে হয়, বাইরে কোথায় যাবে?

সেই ভাবেই বোঝায় নয়ানকে। যেন একটা কচি মেয়েকে বোঝাচ্ছে। সত্যই নয়ান কত যে বদলে গেছে এই কটা দিনে! বছর দুয়েক আগে যে নয়ানকে ঘরে নিয়ে এসেছিল—এই দু'বছর ধরে তেজে, আদরে, অভিমানে যে-নয়ানকে দেখে এল, তার সঙ্গে যেন কিছুই মিল নেই; এ নয়ান শৈশবের কোন্ খেলাঘরের দিন থেকে যেন উঠে এসেছে। কচি, অবুঝ, আধ-আধ আবদারে কথা, একটা কচি মেয়ের মতই বুকে চেপে ধরে অনঙ্গ বোঝায়—"নিয়ে যাব, তোকে কথা দিচ্চি বৌ, কিন্তু এখন সত্ত সত্ত কি ক'রে হবে বল্? দু'পা চললে হাঁপিয়ে পড়িস।"

"পালকি করো।"

"তাই না হয় করলুম, এতই যখন তুই উতলা। তাতে পায়ের মেহনৎ যেন হোল না, কিন্তু এখনও তুই বারুণী পর্যন্ত যেতে পারলি নি একদিন; অথচ জিদ ধরেচিস অজয়ের তীরে কেন্দুবিল্ব যাবি, বৃন্দাবনের কথা বলতেও তো আটকাচ্চে না। কি করে হয় বল্? এত অবুঝ হলে চলে?"

অভিমানে বুকে মুখ গুঁজে দেয় নয়ান, বলে—"তাহলে বারুণীর জলেই ভাসিয়ে দেবে চলো আমায়; আমি অবুঝ, আমি আবদারে, আমি হয়েচি একটা আপদ, একটা বোঝা।"

এবার অভিমান হয় অনঙ্গর। গলাটা ধরে আসে, বলে—"ভাসিয়ে তো দিতেই যাচ্চিলুম নয়ান, সে কথা তুলে কষ্ট দিস কেন? কত হিম-বাতাস বাঁচিয়ে চলতে হচ্চে, যদি অসুখেই যাস পড়ে আবার, বিদেশ-বিভুঁয়ে কে দেখবে বল?"

"বেশ, তা হলে জিরেনেই নে চলো। সেখানে দেখবার লোক নেই একথা তো বলতে পারবে না।"

আরো ছেলেমানুষের মতো কথা; যে বয়সে ও-বেলার কথা এ-বেলা ভুলে গিয়ে আবদার ধরে ছেলেমেয়েরা। অনঙ্গও বুকে চেপে ধ'রে পিঠে হাত বুলিয়ে ছেলেমানুষের মতো ভোলায়—"বেশ তাই যাবি। গাঁয়ের অবস্থা তো

দেখচিস—এখনও ভাল করে টাল সামলাতে পারেনি। গাড়ি-পাল্কি যোগাড় করে উঠতে যা দেরি; হলেই তোকে নিয়ে যাব। হোল তো?"

চৈত্রের শেষাশেষি পর্যন্ত নয়ান ধীরে ধীরে কতকটা সহজ হয়ে উঠল আবার। আগের স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরে এসেচে, অসুখের সঙ্গে মনের যে-সব উপসর্গ এসে জুটেছিল সেগুলো প্রায় সব গেছে মিলিয়ে। থাকার মধ্যে রয়েছে সেই একবার বাইরে যাওয়ার ঝোঁকটা।

শুধু রয়েছে তা নয়, বেড়েছে আরও। ঐ কটা দিন পঙ্গু আর আবদ্ধ ক'রে রেখে কে যেন ওর মুক্তির পিপাসাটাকে আরও দশগুণ দিয়েছে বাড়িয়ে। কি একটা সুর যেন ঘনিয়ে উঠতে থাকে আজকাল। স্তব্ধ অলস দুপুরে বারুণী তীরের ঝিল্লী-মুখরিত সন্ধ্যায়, কোনও দিন বা হঠাৎ গভীর নিশীথে জেগে ওঠে মনে—হঠাৎ এই সুর যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কান পেতে থাকে নয়ান।

এই সুরেই না ঘর ছাড়া করে নিয়ে গেল বাবা আর মাকে? কোথায় গেল তারা?

যারা সব নিশ্চিহ্ন করে চলে গেল, আর ফিরে চাইল না, কাউকেই আর তাদের পথের ঠিকানা দিল না, তাদের কথা ভাবলেই কেমন যেন মনে হয় তারা শুধুই এগিয়ে চলেছে অনন্ত পথ ধরে; ঘর-বাঁধা নয়, এগিয়ে চলাই এদের জীবন; কার বাঁশির টানে—সে বাঁশি হয় তো কখনও স্পষ্ট কখনও স্তিমিত, কিন্তু লুপ্ত নয় কখনই।······মৃত্যুহীন বিরাট মিছিল ভেসে ওঠে নয়ানের চোখের সামনে—দোলা লাগে ওর ধমনীর রক্তে; সেই দোলা পুরুষানুক্রমে যা ওদের সবাইকে ঘর ছাড়িয়ে পথের মানুষ করেছে এক আনন্দময় বৈরাগ্যে। ভালোই হোল জিরেন গেছে, ভালোই হোল জিরেনের সব আশা মুছে দিয়ে শ্বশুর গেল ফিরে—ভালোই হোল যে আসছিল নূতন মায়ায় বাঁধতে সেও গেল চলে—

এই কথাটা যেন বেশি ক'রে এইভাবে আসে মনে আজকাল—এই যে, যে আসছিল, সে না এসে যেন মুক্তি দিয়ে গেল। অনঙ্গকেও বলল; অনঙ্গ যখন ওর বেরুবার কথায় একদিন বলল—"তোর অদ্ভুত জিদ তো বৌ! তুই একটা কথাই ধরে আচিস?"

নয়ান উত্তর করল—"এই দ্যাখো! জিদ তোমার না আমার গোসাঁই? দেখচো রাধারমণ পাততে দেবেন না ঘর—আর কত স্পষ্ট করে বলবেন, তবে বুঝবে?"

গলাটা আসে ধ'রে।

গোসাঁইঠাকুরকেও বলল; যাওয়ার আলোচনা ওর সঙ্গে তো রোজই হয়, কত জায়গায় গেছেন, কত কি দেখেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় নয়ান। সেও যে যাবে, আর সেও যাবে তার বাবা-মার মতন পেছনের সব মুছে দিয়েই।

বলল—"রাধারমণ চান না যখন ঘর বাঁধি তখন জোর করে ঘরের খড়কুটো আগলে পড়ে থাকার কোন মানে হয় দাদু? আপনিই বলুন না?"

"হয়ই না তো ভাই।"

মুখে প্রশ্রয় দেন, মনে মনে হাসেন গোসাঁইঠাকুর।

"তাই ঠিক করেচি, বাবা-মার মতন ঘরে তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে যাব। তোমার নাতজামাই বোঝে না কিন্তু।"

প্রশ্রয়ই দেন গোসাঁইঠাকুর। যদিও মনে সেই হাসিটুকু লেগেই থাকে; বলেন—"ওর জন্যে তুই ভেবে সারা হচ্চিস কেন দিদি? ··আমার নাতনী যখন বুঝতে পেরেচে তখন ঝুলবেই তালা। ভেবে দেখ্ না, এই নিয়মেই তো জগৎ-সংসারটাও চলচে—প্রকৃতিই করচে সব, পুরুষ আর কি?—একটা জড়-পদার্থ বললেই হয়, সে বুঝবেই বা কখন্, নড়বেই বা কি ক'রে?"

ওঁর মনের কথাটা প্রকাশ হয় অনঙ্গর সঙ্গে কথাবার্তায়। অনঙ্গ চিন্তিত বৈকি, বলে—"নিয়ে যাব কি, আমার ভয় হয় দাদু। আপনার নাতনীর আজকাল যেন মন বুঝে পাই না—কি যেন ভাবে, কিসের যেন স্বপ্ন দেখে, কত কথা বলে,—তাও এত বড় বড় যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। 'আমায় ছেড়ে দাও', একথা বলতেও মুখে আটকায় নি। সত্যিই আমার আজকাল ভয় হয় দাদু—যে বাপ আর যে মায়ের মেয়ে ও ·····"

"যে বংশেরই বলো না ভাই; আমি তো আদি-অন্ত সব জানি। তবে—অবশ্য শেষ অবধি রাধারমণের মনে কি আচে জানি না—হয়তো বাপমায়ের পথই ধরবে, তোকেও ধরাবে, তবে এটুকু যেন জোর করেই বলতে পারি এখনও সে অবস্থা আসেনি—এ যেন সেই ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্রোত নয়।"

"তফাতটা কোথায় দাদু? পা তো যেন বাড়িয়েই রয়েচে।"

"বলি তোমায়। ওর আজকের এই যে আকুলি-বিকুলি এর মধ্যে খাদ রয়েচে ভাই। তাই মনে হয় এ সোনা সেই সোনা যা দিয়ে রাধারমণ তাঁর সৃষ্টিটাকে সাজিয়ে রাখেন,—খাদ না থাকলে সে সোনায় তো সাজাবার মতন

কিছু তৈরি করা যায় না।—কথাটা আর একটু না হয় পরিষ্কার ক'রে বলি—নয়ান মাঝে মাঝে বড় কথা বলবেই, বড় স্বপ্ন দেখবেই, রক্তের দোষ, উপায় নেই তো, তবে আজকের যে এই বেরিয়ে পড়ার জন্যে আকুতি, এর অনেকখানিই অভিমান।—হবে বৈকি, মেয়েছেলের যা সবচেয়ে বুকের ধন, তা দিয়েও তো হরণ করে নিলেন রাধারমণ। এটা হোল সেই অভিমান।—দেখো না?—বড় কথা, বড় স্বপ্নের সঙ্গে এই কথাটাই নানা আকারে এসে পড়চে না ওর মুখে? তা অভিমান হচ্চে আকাঙ্ক্ষারই তো নামান্তর ভাই—তার একটুও থাকলে সে যে মস্ত বড় পেছ্‌টান—গা ভাসিয়ে চলে যাবে সে ক্ষমতা নেই ওর এখনও।"

একটু চুপচাপ যায়! অনঙ্গ মিলিয়ে দেখে মনে মনে। মিলিয়ে দেখতে খানিকটা সময় দেন গোসাঁইঠাকুর, তারপর হেসে বলেন—"সুতরাং আমি নিশ্চিন্দি আচি। তোমায়ও বলি, তুমিও নিশ্চিন্দি হয়েই ওকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসোগে যাও; ওর দেহমনের পক্ষে একটু যেন দরকার, নইলে এই যে আশা-ভঙ্গ এটা উলটে অনিষ্ট করবে ওর ঐ দেহমনে। একটু ঘুরে আসুক।"

"আসবে তো ঘুরে?"

কথাটা বলে একটু হাসে অনঙ্গ। গোসাঁইঠাকুরও হেসে বলেন—"এই দ্যাখো! ভয় আর ঘোচে না নাতজামাইয়ের। তাহলে আর একটা কথা বলি। হ্যাগা, কিছু কিছু তো খবর রাখি—যতই মনে করো না কেন বুড়ো বুঝি শুধু পুঁথি-পাটা নিয়েই থাকে। বলি, ধরা তো ওই দিয়েছিল।"

"ধরা দিয়েছিল বলেই ধ'রে রাখা যাবে দাদু?"

হেসেই বলেন গোসাঁইঠাকুর—"এ যে ভালো সমস্যায় পড়া গেল! নাতজামাইকে কোথায় ভেবেছিলাম পাকা নাগর—তা একেবারে যে আনাড়ি গেঁয়োর মতন কথা বলে!...যে নিজে এসে ধরা দিলে তাকে ঠেলে না দিলে সে যায় কখনও?"

অনঙ্গর মনটা একটু বেশি দ্রব হয়ে ওঠে হঠাৎ, একটু আবেগের স্বরেই বলে ফেলে—"ঠেলে দোব দাদু? নাতনীকে আপনার?"

"ঠেলে দেওয়ার অর্থটা নিয়েও ভুল হতে পারে ভাই। বনের হরিণীকে ঠেলে দেওয়া হয় যখন তাকে বেঁধে রাখা যায়। সইতে পারবে কেন বলো সে? জিরেন থেকে নিয়ে আজ পজ্জন্ত যত কিছু হয়ে গেল তাইতে এই কথাটাই কি পরিষ্কার হোল না? বলো না আমায়? আমার নাতনীকে তাই ছেড়ে দিয়েই পুষতে হবে। ওর অবাধ মুক্ত-গতি, অবাধ মুক্ত-মন—ওকে যে পেতে চাইবে

তাকেও সেইরকম গতি সেইরকম মন নিয়েই পেতে হবে। এক এক সময় আমার কি মনে হয় জান ভাই?—মনে হয় তুমি ওর বাইরেটা দেখেই ওকে নিয়েছিলে। অবিশ্যি সব পুরুষেই তাই ক'রে, দৃষ্টিটা তো আমাদের ঝাপসাই—সুতরাং সেদিক দিয়ে তোমার বেশি দোষ নেই, কিন্তু দোষ হয় তো এইখানে হয়েচে, এই যে দুটো বছর গেল, তারপর আর এ দুটো বছরে তুমি ওর ভেতরটা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করো নি। করলে আজ যা তোমার আশঙ্কা তার একটুও থাকত না। এটা এসেচে অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকেই, নইলে দেখতে নাতনীর আমার ভেতরটা আকাশের মতই এত স্বচ্ছ, এত বিরাট যে তাকে হারাবার কোন কথাই আসে না। ভেবে দেখো না ভাই, আকাশকে হারাবে কি করে?"

কম কথার মানুষ, একেবারে এতটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন, একটু অপ্রতিভ হয়েই হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন গোসাঁইঠাকুর, গলাটা একেবারেই খাদে নামিয়ে এনে একটু হেসে বললেন—"কি কতকগুলো আবোল-তাবোল বকে গেলুম দেখো না!"

অনঙ্গ বলল—"আবোল-তাবোল কি আপনার মুখ দিয়ে বেরোয় দাদু, বলেচেন ঠিকই। তবে কথা হচ্চে আকাশকে হারানো যায় না বটে তবে আকাশে তো নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয় দাদু। আমি যে কোনই কূলকিনারা পাই না আপনার নাতনীর ভেতরের।"

পঁচিশ

সোনা বলেছিল—"গোসাঁইঠাকুরকে দিয়ে ভালো একটা দিন-ক্ষ্যাণ দেখিয়ে তবে বেরিও বাপু, যেন ঘরে ফেরবার মতি হয় শিগ্‌গীর। তাঁরা দু'জনে বেরুলেন তো ঘুরে আর আসবার নামটি নেই।"

নয়ান উত্তর করেছিল—"মানুষ যে মানুষ তাদের কারুর শাসন আমায় মানতে দেখেচিস কখনও যে পাঁজির শাসন মানতে যাব?"

মুখ ভার ক'রে বলেছিল সোনা—"সে অপবাদ তোমার অতি বড় শত্তুরও দিতে পারবে না। তাহলে যা অভিরুচি তাই কোর।"

আর চটায় নি নয়ান; একে তো যাচ্ছে যে তাইতেই কতখানি আঘাত দিয়ে যাচ্ছে বোঝে তো; নিজের মনের একটা দিকও ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

সোনাকে সঙ্গে করেই গিয়ে গোসাঁইঠাকুরের কাছে দিন দেখাল। অভিরুচির সঙ্গে পাঁজির অনুশাসন মিলেও গিয়েছিল চমৎকার। এদিকে একটা না একটা কিছু দোষ থেকেই যাচ্ছে; দিন পাঁচেক পরে গিয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বেশ ভালো।

বেশ চমৎকার হোল, এদিকেও খুঁৎ রইল না, মনেও একটা খুঁৎখুঁতুনি রইল না। শুধু তুটো দিন আরও পেছিয়ে গেল। তা যাক। বোষ্টমের মন, তার গড়নটাও তো ঐরকমই—পূর্ণ-স্নন্দর কে যেন দূরে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে, অনেকখানি পথ, অভিসারে যেতে হবে।...কানায় কানায় ভরা জ্যোৎস্না রাত্রিটি তার অসীম সৌন্দর্যে, তার অনন্ত রহস্যে তেমনি ক'রেই তীর্থকুঞ্জে যেন দাঁড়িয়ে আছে নয়ানের জন্য; পাঁচটি দিনের দুঃসহ ব্যবধান।... একটি দিন কমল; আর একটি দিন...

কিন্তু একটু বাধা প'ড়ে গেল।

দলবল নিয়ে কুমারবাহাদুর ফিরে এসেছেন, অনঙ্গ দেখা ক'রে আসতে গিয়েছিল। যায়, যেদিন সকালে নয়ান ঠাকুরমশাইয়ের কাছে পাঁজি দেখিয়ে দিনটা ঠিক করাল। তৃতীয় দিন ফিরে এসে খুব উৎসাহের সঙ্গে একটা খবর দিল। নিজে হতেই কি ক'রে কুমারবাহাদুর শুনেছেন যে অনঙ্গর পরিবার নাকি খুব শক্ত ব্যারাম থেকে উঠেছে—নিজে হতেই কার কাছে শুনেছেন—অনঙ্গ কখনও ও-কথা তুলতে পারে?...তা বললেন, ভালো ভালো জায়গায় তো ওঁর নিজের বাড়ি রয়েছে—দেওঘর, কোথায় রাজগীর আছে—সেখানে, গয়ায়, কাশীতে—তীর্থক্ষেত্র সব, অনঙ্গ যদি চায় তো নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে দিনকতক; শরীরটা সেরে যায়।...অনঙ্গ সেই জন্যেই চ'লে এল তাড়াতাড়ি—জায়গাগুলো ভালো—তীর্থস্থানই সবক'টা...

নয়ান বলল—"মন্দ কথা তো নয়, ভেবে দেখি। তুমি গাং থেকে নেয়ে এসো ততক্ষণ।"

সোনা পাশের ঘরে কি কাজ করছিল, অনঙ্গ বেরিয়ে যেতে একটু অনিশ্চিত মনেই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। নয়ান বলল—"গোসাঁই-দাতুর শরীরটা ভালো নয়, সকালে নাতিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পূজো করতে। লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে দিগে, সন্ধ্যেয় শেতল দিতে যেন নিজেই আসেন কোনরকম ক'রে—না পারেন তো একটা গাড়ি করেই। বলবে, আখড়া বন্ধ ক'রে চাবিগুলো ওঁর হাতে দিয়ে দিতে হবে।"

"আজই··· ?"

নয়ান শেষ করতেও দিল না, ঝঙ্কার ক'রে উঠল—"নিজের কানে শুনলি বাগানবাড়ির ব্যবস্থা হচ্চে—এর পর পাঁজায় ক'রে তুলে নিয়ে গেলে ঠ্যাকাতে পারবি তুই ? যেতে দে, আর বাধা দিবি নি। যে অমন লোকের হাতে পড়েচে,—নিজে এসে খবর দিতে আটকায় না, তার আবার দিন আর অদিন !"

কোথা থেকে যে পৌঁছেছে কথাটা, আন্দাজ করতে দেরি হয় না। অবশ্য সরাসরি কুমারবাহাদুরের কাছে নয়, পৌঁছেছে আগে মেয়েমহলে, সেখান থেকে তাঁর কানে। আন্দাজটা অনেকখানি সাব্যস্ত হোল, বিন্দু যখন মৈনে থেকেই ফিরে বিকেলে এসে উপস্থিত হোল। নয়ান প্রসঙ্গটা একটু ঘুরিয়ে তুলতে মন্তব্য করল—"তা আজকাল কে আর কার জন্যে বলচে বলো ? নেহাত প্রাণটা বড় দরাজ কুমারবাহাদুরের···"

কথার ভাবে আন্দাজটা পাকা ক'রে নেওয়ার জন্য কথাটা তুলেছিল নয়ান, মন্তব্যটা শুনে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে রাখল। শুধু বলল—"তোরা রয়েচিস, এ দয়াটুকু বজায় থাকবেই তাঁর। অনেক কষ্টে রাজী করেচি তোদের কুটুমকে, একবার ঘুরে আসি আগে।"

কথাটা হচ্ছে, বিন্দুকে বাদ দিয়ে একটা বড় সফরের কথা ভাবা যায় না; আর তো বাবা-মা নেই।

একটু ছন্দপতন হোল যাওয়ার মুখে, তাতে কিন্তু এমন ইতর-বিশেষ কিছু হোল না। ওরা বেরুল খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে দুপুর রাতটা কাটিয়ে; অনঙ্গ, নয়ান, বিন্দু আর প্রসাদ।

আপাতত পায়ে-হাঁটা পথ। এদিককার গোটাকতক ছোট ছোট আখড়া —যা প্রায় পথেই পড়ে, সেইগুলো হ'য়ে ওরা যাবে কেন্দুবিল্ব। তীর্থ-যাত্রা, পায়ে হেঁটেই যতটা সারতে পারে। এটাও নয়ানেরই ব্যবস্থা, শক্তিতে না কুলায়, তখন গোরুর গাড়ির কথা ভাবা যাবে। কেন্দুবিল্ব থেকে দূরের পাল্লা, রেলগাড়ি-যোগে বৃন্দাবন, মথুরা। দ্বারকাও যাবে নয়ান, তবে সেটা এখন নিজের মনেই আছে; এইটুকুতে রাজী করাতেই যা বেগটা পেতে হোল ! মথুরায় পৌঁছে তখন আবার তোলা যাবে কথাটা···না রাজী হও, তুমি ফিরে যাও। আমি চললুম।

চলতে চলতে প্রতি পদক্ষেপেই দেহটা যেন হালকা হয়ে উঠছে। চলেছে

—সামনে অনঙ্গ আর প্রসাদ, প্রদাদের পিঠে একটা বেশ বড় সাইজের বোঁচকা, লাঠিতে গলানো; অনঙ্গর হাতে সেই টিনের বাক্সটা, যেটা জিরেন থেকে নিয়ে এসেছিল। কয়েকপা পেছিয়ে নয়ান আর বিন্দু। 'নিযুতি গ্রামটা ছাড়িয়ে ওরা বাইরে গিয়ে পড়ল।

পূর্ণিমা না হ'লেও ত্রয়োদশীই তো, কতটুকুই বা তফাৎ? বৈশাখের শুকনো মাঠ আর বিরল-পত্র ছাড়া-ছাড়া গাছ এদিক ওদিক যা দাঁড়িয়ে রয়েছে—সব ভাসিয়ে জ্যোৎস্নার যেন বান ডেকেছে।

আরও অনেক কিছু দিচ্ছে ভাসিয়ে। নয়ান যে এই পায়ে-পায়ে এত হালকা হয়ে উঠছে তা এই দু'কূলভাসানো জ্যোৎস্নার জন্যই নয় কি? মন্দির-তলার পর জিরেন থেকে আরম্ভ ক'রে পলাশবাটীর শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত এই তিন বছরের যা কিছু—ভালোও, মন্দও—সব কি ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে না মন থেকে? এই যে একটু আগে সোনা ঘুমন্ত পেয়ারীকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—উঠিয়ে বাধা দেবে—নয়ান বারণ করতে আঁচলে চোখ চেপে কেঁদে উঠল—"কার ভার কে বয়ে মরে·· আমি পারব না, পারব না, নিয়ে যাও তুমি···"—এই একটু আগের ওই স্মৃতিটুকুও যেন ফিকে হয়ে এসেছে।

মনে হচ্ছে এই জ্যোৎস্নাই যেন ক'রে দিয়েছে ফিকে—শীতের কুয়াসার মতো; সে যেমন নূতন সূর্য থেকে আরম্ভ ক'রে কিছুই বাদ রাখে না।

কথাবার্তা হচ্ছে, সেও হালকা ছন্দেই—

"চল্ পা চালিয়ে বিন্দু, যেন নড়তে পারচিস না!"

"না, বিন্দু কি নড়তে পারে? না নড়েই সারা ভূ-ভারতটা ঘুরে এল!··· দুজন পুরুষ যে সামনে, ছাড়িয়ে যেতে হবে?"

"হবে; পেছনে পড়ে থাকবার পুরুষ যদি হয়।"

বিন্দু হেসে চোখ তুলে চায়।

"না, এগিয়ে যাওয়ার মেয়ে গো?

একটু ইতস্তত করে নয়ান। তারপর খানিকটা বলেই ফেলে—

"তুই-ই বিন্দী; পেছিয়ে পড়ার পুরুষও, আবার এগিয়ে যাওয়ার মেয়েও।··· তাহ'লে বলি?"

মুখ টিপে টিপে হাসে। কৌতূহলে আর একটু শ্লথই হয়ে যায় বিন্দুর গতি; প্রশ্ন করে—"রহস্যটা কি?"

"আছে রহস্য।·· ভেবেচিস মথুরাই শেষ নাকি?"

"তবে ?"

"দ্বারকাধাম !"

চোখ নাচায় নয়ান। বিন্দুর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে, প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে—"সত্যি নাকি দিদিমণি ? সে যে শুনেচি অনেক দূর, আমারও হয় নি আজ পজ্জন্ত !"

"তুই সে এক বুড়োর কাছে মজেচিস। দড়ি দিয়ে খুঁটোতে বাঁধা, যতই এগুতে চাইবি ততই পাক খেয়ে খেয়ে সেই খুঁটোর কাছেই পড়বি এসে।"

বিন্দুকে মিথ্যা আত্মসমর্থনেই কিছু একটা বলতে হয়। নাকটা একটু তুলে বলে—"ক্ষ্যামা দাও ! কণ্ঠিবদল—সে নাকি আবার দড়ির বাঁধন খুঁটোর সঙ্গে ! —সে বরং তোমার···"

"তাই-তো খুঁটো সুদ্ধু তুলে নিয়ে যাচ্চি।"

একটু ছলছলিয়ে হেসে ওঠে, তারপর গম্ভীর হয়ে বলে—"না, এখন কিন্তু কাউকে নয়। মথুরায় যাই আগে।· ইস্, রাজী হবে না ! দুটো পুরুষকে দুজনে আর বাগাতে পারব না !"

"একজন তোমার পুরুষ তোমার মুঠোর মধ্যে। পেসাদ কিন্তু আমার কথা শুনবে কেন ?"

নয়ানের মুখটা আবার চটুল হাসিতে একটু রেঙে ওঠে। বলে, "তা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আয়। তা নয়, আমার মুঠোও আলগা করবার ব্যবস্থা করচে···"

বিন্দু একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটো আরও বড় বড় ক'রে বলে—"সে কি গো ! আমি মুঠো আলগা করাতে যাব কেন ? থাকো না এঁটে ধরে বাপু।"

ভেতরে একটা গলদ থাকার জন্যেই বোধ হয় আরও ভালো লাগে না কথাটা।

নয়ান বলে—"গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না আর।···এমন নিষুতি জ্যোৎস্না রাত্তির—ফুরফুরে হাওয়া—চলেচি কিনা দুজন পুরুষ একসঙ্গে, দুজন মেয়ে একসঙ্গে ! অরুচি !"

আবার কলকলিয়ে হেসে ওঠে। রহস্যচ্ছলে বলুক, কিন্তু কথাটা তো মনের কথাই, তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দেয় ; বিন্দু কি বলবার জন্য হাঁ করতেই ঠ্যালা দিয়ে ব'লে ওঠে—"আ মর ! চ' ; দাঁড়িয়ে পড়ল দেখো !"

প্রসাদ একবার ঘুরে দেখে, বলে—"তোমরা যে বড্ড পেছিয়ে গেলে গো !"

নয়ান চাপা গলায় বলে—"যখন এগুব তখন আবার দেখো! তুজনের মুখে রা সরবে না!"

দ্বারকাধামের ইঙ্গিত; আবার একটু চাপা হাসি ওঠে। চাপা গলাতেই নয়ান সাবধান করে দেয়—"এখন কিন্তু ভাঙবি নি কোন কথা বিন্দু, খবরদার!"

প্রথম দিন বেশি এগুনো গেল না। বৈশাখ মাস, সূর্য খানিকটা এগিয়ে আসতেই রোদ চড়চড়িয়ে উঠল। গাছপালা কম, কাঁকুরে মাটি উঠল তেতে; ক্রোশ চারেক দূরে রূপনগরের আখড়ায় পৌছাতে শেষের দিকটা বেশ একটু বেগ পেতেই হোল।

ছোট আখড়া; কিন্তু সমস্তটুকুই ছায়ায় ঢাকা, পরিশ্রমের পর লাগল বড় ভালো। একটু জিরিয়ে নিয়ে প্রসাদ বেরিয়ে গেল গাঁয়ের বাজারের দিকে, অনঙ্গও সঙ্গে গেল। যখন ফিরল খানিকক্ষণ পরে, দেখে একটি আমলকি গাছের তলা বেশ খানিকটা পর্যন্ত পরিষ্কার ক'রে লেপে পাশাপাশি তুটো ইঁটের উনুন করে এরা প্রস্তুত। স্নানও সারা হয়ে গেছে তুজনের; ওরা আসতে জিনিসপত্রগুলা দেখেশুনে নিয়ে রান্নার আয়োজনে লেগে গেল।

আখড়ায় লোক নেই কোন। তালা-দেওয়া ঘরের দাওয়ায় যেমন ধূলা-বালি জমে ছিল, মনে হয় মঠধারী বাবাজী কয়েকদিন থেকেই অনুপস্থিত। জায়গাটা গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা তফাতেও; নিজেদের চারজনকে নিয়ে গল্প-গুজব হাসিঠাট্টার মধ্যে বেশ কাটল সময়টা। আহারাদি সারতে তুপুর বেশ ভালো ভাবেই গড়িয়ে গেল। রাতজাগা, পথশ্রম; এদিকে এই নিরিবিলি, —ঘুমটা বেশ আচ্ছন্ন ক'রেই এল। তবে নয়ানের ঘুমটা হঠাৎ ছাঁৎ করে গেল ভেঙে। কি একটা এলোমেলো স্বপ্ন, মনে করতে পারছে না, একটু অলসভাবে প'ড়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসল। একটা সতরঞ্চিতে ও আর বিন্দু শুয়েছে। বিন্দু গভীর তৃপ্তিতে আস্তে আস্তে নাক ডাকিয়ে যাচ্ছে।

ঘুম আর হবে না। এই নূতন পরিবেশটা একটু আগে পর্যন্ত একরকম ছিল; নূতনই, তবে এখন যেন আরও নূতন আর অদ্ভুত মনে হচ্ছে। কোথায় অনেক আগে ছেলেবেলায় একটা ঘুমন্তপুরীর রূপকথা শুনেছিল—আর সব নিঝুম, শুধু কে এক বন্দিনী রাজকন্যা কিসের খোঁজে কক্ষে কক্ষে একা বেড়াচ্ছে ঘুরে।...নয়ান উঠল। সদ্য-ভাঙা ঘুমের জড়তায় এমনই একটা প্রত্যাশা নিয়ে

উঠল যেন একটু ওদিকপানে গেলেই সেই কিসের-সন্ধানে-ঘুরে-বেড়ানো রাজার ঝিকে এখনি পাওয়া যাবে দেখতে।

দাওয়াটায় ঝাঁটপাট দিয়ে জল ছিটিয়ে শুয়ে ছিল এরা দু'জন। একটু দূরে নিচে আমলকি তলার একদিকে একটা সতরঞ্চিতে শুয়ে আছে প্রসাদ আর অনঙ্গ। পাশাপাশি দুখানা মেটো ঘরের চারিদিকেই দাওয়া; নয়ান ঘুরে সামনে থেকে পেছনের দিকটায় পা টিপে টিপে চলে গেল।

সামনের মতো এদিকটা অত ছায়া-ঘন নয়; গোটাকতক হালকা গাছে যা খানিকটা বিছিয়ে রেখেছে তলায়। নয়ান একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গেরুয়া রঙের কাঁকুরে মাটির ওপর দিয়ে একটা সাদাটে রেখার পায়ে-হাঁটা পথটা সোজা চলে গিয়েছে, কোথাও একটু উঠে গিয়ে, কোথাও আবার খানিকটা নেমে পড়ে। ঐ পথে ওরা পলাশবাটী থেকে এল।···মনটাকে পলাশবাটীতে যেতে দেবে না নয়ান, কোন মতেই না; পলাশবাটীর ওদিকে জিরেনেও নয়, জিরেন ঘুরে সেই দু'বছর আগেকার মন্দিরতলায়ও নয়।···চোখ দুটো অবশ্য রাস্তার ওপর রয়েছে পড়ে।

একেবারে নিস্তব্ধ আশ্রমটা। বেশ খানিকটা দূরে রূপনগর গ্রামটা যায় দেখা। ছোট গ্রাম, মনে হচ্ছে সুপ্তিমগ্ন। এতখানি একটা চত্বরে মাত্র একটি শব্দ—আখড়ারই কোথায় একটা ঝিল্লির তান; হয়তো কয়েকটা ঝিল্লি সমতান তুলেছে। দুপুর—সে যেন কালকের জোৎস্নাপ্লুত দুপুর রাত্রিটি।···সব সুপ্ত, শুধু রাজকন্যার চোখে ঘুম নেই।·· নয়ানের মনটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সন্ধানে—না, পলাশবাটীর পথে তো পা বাড়াবে না সে—স্বপ্নপুরীর কারাগারে রয়েছে রাজকন্যা, তাকে খুঁজে বের করতে হবে—প্রশ্ন করতে হবে, কি চায় সে। কবে বন্দিনী হোল—কি ক'রে? মঞ্জীর ভেবে স্বেচ্ছায় শেকলই তো তুলে নেয় নি পায়ে?···চায় কি মুক্তি? যদি ওকে কেউ সন্ধান দেয় মুক্ত তোরণের—ধরা যাক নয়ানই পারে দিতে—পারবে কি এই ঘুমন্তপুরীর মায়া কাটিয়ে কঠিন চরণে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে?

স্বপ্ন-পুরীর বন্দিনী রাজার ঝিয়ারি—অনেক বেদনা তার বুকে—তাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, তবে নিজের বুক দিয়ে বোঝা যায় তার বুকে মুক্তি-বাঁধনের কী দুঃসহ বেদনা।···তার জন্য নয়ানের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছে।

ছাব্বিশ

মুখ থেকে ছায়াটুকু স'রে গিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে, প্রসাদের ঘুমটা ভেঙে গেল, বলল—"কুটুমকে একটু ন'ড়ে শুতে হবে যে, রোদ এসে পড়ল।"

আধভাঙা ঘুমের মাঝেই অনঙ্গ একটু স'রে গেল; একটু এগিয়ে গিয়ে প্রসাদ আবার ঘুমিয়ে পড়ল। একটা তীব্র ভয়ের ধাক্কায় অনঙ্গব বাকি ঘুমটুকু গেল ভেঙে।

এইরকমটা হয়েছে কিছুদিন থেকে, বিশেষ ক'রে সেই রাত্রি থেকে—সেই যে নয়ান বারুণীর তীরে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল—"আমায় ছেড়ে দাও গোসাঁই।"

আজকাল ঘুমটা পাতলা হয়ে আসবার মুখে এইরকম হঠাৎ আতঙ্কে একেবারে ভেঙে যায়—মনে হয় এই যে একটু নিশ্চিন্ত ছিলাম, এর মধ্যে কী সর্বনাশ একটা যেন হয়ে গেছে; সাড়া নেয়, ওরই মধ্যে কতকটা মানিয়ে-সানিয়ে বলে—"বৌ আচিস ··জেগে? · একটু জল দে।"

আজ ঘুমটা ভেঙে যেতে অভ্যাসমতো কথাটুকু বলতে গিয়ে মুখে আটকে গেল; দাওয়ার দিকে নজর পড়তেই দেখে বিন্দুর পাশের জায়গাটা খালি, নয়ান নেই।

কিছুক্ষণ যেন মাথায় আর কিছুই আসে না, আচ্ছন্নভাবে প'ড়ে রইল। একবার ভাবল বিন্দু আর প্রসাদকে ওঠায়, তারপর খেয়াল হোল আখড়ার ওদিকটা তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, পাতকুয়াটা ওদিকেই, নয়ান যদি জল খেতে বা মুখ-হাত ধুতে গিয়ে থাকে। একটু সময় দিল, তারপর আস্তে আস্তে উঠল।

দাওয়ার কোণাকুণি আসতেই দেয়ালের আড়াল থেকে নজর পড়ল নয়ান খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আছে দাঁড়িয়ে। শুধু যে নিশ্চিন্তই হোল এমন নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্বস্ত হোল এইটে দেখে যে নয়ান দাঁড়িয়ে আছে পলাশবাটীর দিকে মুখ ফিরিয়ে। আশ্বাসের সঙ্গে একটা আশা—একটা বিশ্বাসই বলা যেতে পারে—অনঙ্গ যদি পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায়, দেখবে ওর চোখদুটি জলে টল-টল করছে—ঐ পলাশবাটীর জন্যেই। একটা দুর্লভ দৃশ্য। এগিয়ে যাওয়ার জন্যে

পা নিস-পিস করছে অনঙ্গর, বলবার এমন একটা সুযোগ—"ফিরে চল্ বৌ ; গিয়ে দেখবি সেখানে পলাশবাটীর চোখ দুটোও তোর জন্যে এমনি করেই জলে সাঁতরাচ্চে" · আরও দরদ ঢেলে বলবে—মথুরা-বৃন্দাবন নিয়ে পালা গেয়ে গেয়ে বলবার তো ভাষা খুঁজতে হয় না ওকে।…নিস-পিস করছে পা, কিন্তু কি ভেবে দাঁড়িয়েই রইল অনঙ্গ। এ-ভাবে দাঁড়িয়েও তো খানিকটা দেখবার ছবি একটা।

প্রসাদ জেগে উঠে হাঁক দিল—"কুটুম কোথায় গেলে গো ?"

এইতেই সবটুকু গেল বদলে ; নয়ান ঘুরে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদকে যেমন উত্তরটা দিতে হোল, তেমনি সামনেও এগিয়ে যেতে হোল অনঙ্গকে—যেন এই আসছে, এগিয়েই যাচ্ছিল। প্রশ্নও করতে হোল—"তুই এখানে যে বৌ ? ঘুমুলি নি ?"

নয়ানকেও চোখ দুটো মুছে নিতে হয়েছে ; একেবারে সামনাসামনি বলেই টপ করে একটা উত্তর জোগাল না। তাইতেই অনঙ্গর আর একটা প্রশ্ন করবার সুবিধা হোল—"আখড়াটার জন্যে মন কেমন করচে, নয় কি ?"

এ অবস্থায় নয়ানের আর অন্য উত্তর ছিল না, বলল—"করবেই তো একটু…প্রথমটা।"

তাহ'লে ফিরেই চলুক না। কিন্তু একেবারে অতটা বলতে কেমন যেন ভরসা হোল না, একটু পর্দা রেখেই বলল - "বেরুনোও হয়েচে একেবারে তেমনি সময়—ঝাড়া বোশেখ মাস।"

নয়ান মুঠোতে মুখটা চেপে শব্দ করেই হেসে উঠল, বলল—"মতলবখানা কি বলো দিকিন গোসাঁই, ফিরে যেতে হবে ?"

"তাই বলচি ?"—একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়েছে অনঙ্গ।

নয়ান হেসেই বলল—"আর কত পষ্ট করে বলে লোকে ? এদিকে আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্ধান নেওয়াও আচে লোকটা যায় কোথায়, করে কি ?—হ্যাঁ গোসাঁই, এ সন্দেহ হবে ভেবেই তো দু'দুটো—কি বলে—বডি-গাড সঙ্গে নিয়ে এলুম… অবিশ্যি বলতে পার তারা তো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে…"

নিজের অপ্রতিভ-ভাবটা কাটিয়ে উঠে, হাসিটা আর চাপতে পারছে না নয়ান।

অনঙ্গ কতকটা যেন নিরুপায় হয়েই বলল—"তোর ঐ রকম কথা—লুকিয়ে দেখছিলুম, সন্দেহ করি—দেখলি এই দিকেই আসছিলুম তা বেশ

তো, মনে করিস সন্দেহ করচি, ফিরেই চল্ না। এইটুকু আসতেই তো দেখলি সময়টা ঠিক বাছা হয়নি।"

"তোমায় বাছতে দিলে আর কখনই বাছা হোত না গোসাঁই। তা আমিও বলি, বেশ তো, সময়টা ভালো বাছা হয়নি, কষ্ট হচ্ছে, না হয় ফিরেই যাবে!"

মিঠে মিঠে হাসতে দেখে অনঙ্গ বলল—"তার মানে একাএকাই; এই তো?"

"ক্ষতি কি?—কথায় বলে সতীর পুণ্যে পতির লাভ; আমি যখন যাচ্ছিই পুণ্যি করতে · "

"আমিও বলি?—যার চোখে জল ঝরচে পলাশবাটীর জন্যে, তারই ফিরে যাওয়া উচিত নয় কি?"

নয়ান বিজয়িনীর মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বলল—"বেশ, সে-কথাও মন্দ নয় গোসাঁই, পুণ্যিটা দু'জনের কেউ করলেই হোল, আমিই না হয় ফিরে যাই। তাহ'লে যাচ্চ তো এগিয়ে একা-একা?"

অনঙ্গ কখন্ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, নয়ান একটু ঘুরে বাঁ হাতটা তার বুকের ওপর লতিয়ে দিয়ে হেসে চেয়েছে, প্রসাদ আবার ডাক দিল—"কুটুম কোথায় গেলে গো? মেয়েই বা গেল কোথায়?"

যেন তন্দ্রাঘোরেই। বিন্দু একটু ধমক দিয়ে উঠল—"ওরা দুজনেই যখন নেই, তুমি অত ভেবে সারা হোচ্চ কেন? নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোও না বাপু।"

নয়ান হাতটা সরিয়ে নিয়ে হাসিটা টিপে চাপা গলায় মন্তব্য করল—"পোড়ারমুখী।"

বলল—"তুমি এগোও, আমি আসচি।"

এগিয়ে চলল ওরা। বৈশাখের দিনগুলা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছে, সুতরাং কষ্ট বিশেষ কিছু নেই। সামনের আড্ডার দূরত্বটা আন্দাজ করে নিয়ে ওরা মাঝরাত্রের খানিকটা পরে,—যদি দূর হোল তো খানিকটা পূর্বেই বেরিয়ে পড়ে যাতে রোদ তেতে ওঠার বেশ একটু আগেই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পৌঁছে যায়। জিরিয়ে নিতে প্রচুর সময়, কষ্ট দূরে থাক, রাত্রের চলাটা নেশায় যেন একটা দাঁড়িয়ে গেছে। টানে নেশার মতো, কখন্ রাত হবে, গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে চলেছে চার জনে, দুদিকে ফাঁকা

মাঠ, ঝিরঝিরে হাওয়া—গ্রাম এসে পড়ল। সুপ্তিমগ্ন, তারই মধ্যে হঠাৎ একটু-আধটু শব্দ জেগে উঠল; হয় তো কোনও ঘরে একটা শিশুর কান্নাই—তন্দ্রাচ্ছন্নস্বরে মায়ের ঘুম পাড়াবার চেষ্টা· ·

বুকের ভেতরটা একটু মোচড় দিয়ে ওঠেই—সোনা সেখানে পেয়ারীকে ঘুম পাড়াচ্ছে, নিশ্চয় ধমক দিয়েই, কড়া হাতে ঠুকে ঠুকে, নয়ানের ওপর রাগ ক'রে···

তবে এসব বেশিক্ষণ থাকতে পায় না মনে আটকে। হয়তো কান্নাটা থেমে গেছে শিশুর, কিম্বা হয়তো গ্রাম ছাড়িয়ে বেরিয়েই এসেছে আবার খোলা মাঠে। জ্যোৎস্না, হাওয়া, এগিয়ে যাওয়ার একটা একটানা তরতরে স্রোত—এই সবের মধ্যে আর সব কোথায় যেন ভেসে তলিয়ে যায়···

সত্যিই সব যেন ভেসে তলিয়ে যাচ্ছে—পলাশবাটী, জিরেন, মন্দিরতলা—সব। তার জায়গায় ভেসে-ভেসে উঠছে আরও কত সব কি—মন্দিরতলার ওদিককার জীবন থেকে—বাবা, মা; কত তীর্থে তীর্থে ঘোরা; কত ভালো লাগা, কত ভালোবাসা—যে ভালোলাগায়, যে ভালোবাসায় এরকম টান নেই, টানের জন্যে যাতে এরকম করে মনটা বেদনায় টনটনিয়ে থাকে না অষ্টপ্রহর।

হাওয়ায় যেন একটা পুরনো বইয়ের পাতা উল্টে দিয়ে যাচ্ছে—একটার পর একটা এইরকম অজস্র ছবি···

নয়ান আবার চলেছে ঐ জীবনের দিকে - এটা যে গেল—শঙ্করী, ভিখারী, টগর, ভূষণ, কুমারবাহাদুর, সোনা, লক্ষ্মণ, পেয়ারী—এদের নিয়ে মাঝখানের এই দুটো বছর বোঝাই করে এই যে জীবনটা গেল, এটা তো ওর জীবন নয়—তাই তো ছেড়ে দিয়ে এল।

কিন্তু অনঙ্গ?

ঠিক সামনেই মনটা কতদূর থেকে ঘুরে এসে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে পড়ল। ঐ সামনে চলেছে অনঙ্গ; মাথার বাবরি চুল আস্তে আস্তে দুলছে, সাদা ফতুয়াটার ওপর লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। গলায় একগোছা রাঙা সুতোর মালা, কুমারবাহাদুর কোন্ তীর্থ থেকে আশীর্বাদী নিয়ে এসে দিয়েছে, খোলেনি অনঙ্গ। ডান হাতে টিনের বাক্সটা—নয়ানেরই বাক্স, বাঁ হাতে বাঁশিটা—মন্দিরতলায় প্রথম যেমন দেখেছিল—টগরের ডাকে যখন সেই প্রথম এসে প্রণাম করল ওকে···

ঐ বাঁশি হাতে ও যেন দু'বছরের ওদিক থেকে নিয়ে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত জীবনটুকু নিরবশেষ ভাবে পরিপূর্ণ করে রয়েছে। ও মনে পড়লে, ওকে অবলম্বন ক'রে আবার সব কিছু যেন ফিরে আসে। শুধু এইটুকুই বা কেন?—ওকে দেখলে আজও মনে হয়—যেমন সেই প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল, কত জন্ম-জন্মান্তর থেকে ও পূর্ণ করে রয়েছে নয়ানের জীবন। তাই তো এইরকম একটি রাতে—পথ চলতে প্রতি পদক্ষেপে যখন পুলক উঠছে ফুটে গায়ে, ওর সঙ্গে এতটুকু ব্যবধান কত দীর্ঘ বলে মনে হয়। সব ছেড়ে আসা যায়, সবার বাঁধন ছিঁড়ে আসা চলে, কিন্তু অনঙ্গর বাঁধন! মনকে তো চোখ ঠারা যায় না; আজ দুপুরেরই কথা, নয়ান যখন রহস্যচ্ছলে ওকে বলল একলা পলাশবাটীতে ফিরে যেতে, কিম্বা ওই এগিয়ে যাক, নয়ানই একলা যাবে ফিরে—বলবার সময় মুখের হাসিটা বজায় রেখেছিল নয়ান, কিন্তু বুকের মধ্যে সেই ধড়ফড়ানি—কি উত্তর দিয়ে বসে অনঙ্গ—সেটাতো ভালো রকমই মনে আছে। ধরা যাক, অনঙ্গ চলেছে এগিয়ে, নয়ান চলেছে ফিরে; প্রতিপদেই ব্যবধান হয়ে পড়ছে দীর্ঘতর, তারপর পলাশবাটীতে গিয়ে উঠল —এই জ্যোৎস্না কি সেখানেও এমনিতর ফুটে রয়েছে দেখতে পাবে?

এক এক সময় কী যে হয়, দুটি মানুষের মনে একই ভাবনার স্রোত চলে ব'য়ে। নীরবে চলছিল দুজনে, বিন্দু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—"পলাশবাটীর কথা তোমার মনে পড়চে না দিদিমণি?"

নয়ানের বুকটা ধক্ করে উঠল, যেন ধরা পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে হেসে বলল—"আবার পলাশবাটী! বিন্দুর মনটা নিকুঞ্জ বাবাজীকে কোন মতেই ছেড়ে আসতে পারচে না!"

"কেন, আখড়ার কথাই কি মনে পড়তে নেই? কত্তা-গিন্নী যাওয়ার পর আবার বেশ জমজমে হয়ে উঠেছিল তো, একটার পর একটা, ফাঁক তো ছিল না। তারপর হঠাৎ এখন···কেউ যদি গিয়ে পড়ে, দেখবে···"

"বিন্দীর অমনি ভাব উথলে উঠল হঠাৎ! আমার মন তো বললুম—সেই দ্বারিকাধামে···কুঁদুলে মানুষ, শঠশিরোমণির সঙ্গে কোঁদল করচি। তাহলে রোস্, একটু দাঁড়িয়ে যা বরং।"

দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ, বলে—"থাম্, ওদের থেকে একটু তফাৎ হয়ে পড়ি। বলছিলুম—তোর প্রাণে যদি এতই ভাবের বন্যে ঢুকে পড়েচে তো সেই নতুন কোন্ পদকর্তার গানটা যে শিখে এসেচিস্ এবার সেইটে ধর বরং গলা খাটো

করে—ওদিকেও বেশ মিলে যাবে—তোদের বৃন্দাবনের মানুষটিকে তো বের করে নিয়ে এসেচি ; এদিকে আমিও বেশ প্রমাণ-সাবুদ দিয়ে ঝগড়াটা চালাতে পারব সেখানে। সেই যে রে—

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার,
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দ-নীপ
ছুটে না কলকণ্ঠসুধা পাপিয়া পিক…

নিজের কণ্ঠ হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এল। বিন্দু একটু হেসে বলল—"বুঝলুম গো, কার মন কোথায় পড়ে আচে। আমি গাই আর তুমি পথের ধুলো কাদা করো। চলো, ওরা অনেকখানি এগিয়ে গেচে।"

আর বেশি অপ্রস্তুত না করে গুনগুনিয়ে গানটা ধরল।

সাতাশ

নয়ান যে পথের ধূলা কাদা করে ফেলল না, তা কি করে সেই জানে। শেষ হ'লে বলল—"গানটা শিখে নিতে হবে, শিখিয়ে দিবি বিন্দু?"

যা হয় কিছু একটা কথা এনে না ফেললে আর সামলাতে পারছে না নিজেকে। সব চেয়ে আশ্চর্য আর অদ্ভুত বোধ হচ্ছে, অনঙ্গকে টেনে নিয়ে এল আখড়া থেকে ঠিক যে সময়টা ওর একটু একটু করে মন বসছে। সেই কথাগুলো মনে দাগ কেটে বসে আছে নয়ানের। সেই প্রথম প্রথম এসে ওর উড়ুক্ষু মনটাকে পোষ মানাবার জন্যে, একটু দায়িত্ববোধ জাগাবার জন্যে সম্পত্তিটা দেখাশুনা করতে বলায় অনঙ্গ যে ঠাটা করে বলেছিল—"আমায় তোর পাটোয়ারি করে রাখবি?" সেই অনঙ্গ এদিকে আস্তে আস্তে সবই তুলে নিচ্ছিল নিজের হাতে—আদায়পত্র, হিসাব রাখা, আখড়ার ভালোমন্দ। আখড়া থেকে সংসারেরও। আরম্ভটাও যে কি থেকে সে কথাও ভাবতে কত সুখ গেছে একসময়—আরম্ভটা হয়েছিল অনঙ্গ যখন খবরটা পেল তাদের সন্তান আসছে। সব চুকে গেল, কিন্তু অনঙ্গর ওটুকু তো থেকেই গেল। অসুখ থেকে উঠে, দাওয়ায় শুয়ে-বসে নয়ান লক্ষ্য করত না?—ভাবত না যে খোকা কোলে না এসেও ঐটুকু ক'রে গেল?

আরও আছে, মনে হল সব কাঁটা যেন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। অনঙ্গ কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে গেলই না তীর্থ-পর্যটনে! কী করে সম্ভব হোল এটা? তারপরে অসুখে জীবন-মৃত্যুর মাঝে যখন দোল খাচ্ছে নয়ান, অনঙ্গর সেই হারাই-হারাই চাউনি! তবু, একেবারে যখন চরম, সে দৃশ্য তো দেখার সৌভাগ্যই হয়নি নয়ানের। সোনা বলে—সে যে কী ঘর-বার করা, কী আগলে থাকা—আর ঐ মানুষ—অমনটিতো চোখে পড়ল না আর দিদিমণি! আমরা তো তবু হাত-পা আছড়াই, কুটুমের সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে, মুখে পর্যন্ত একটি কথা নাই।

ঐ গায়ে-ফুঁদিয়ে-বেড়ানো মানুষ। আগেও ভালো যে বাসেনি অনঙ্গ এমন নয়, কিন্তু সে ছিল ভালোবাসার বদলে—আর এ যখন কত গঞ্জনা, কত কলহের নদী মাঝখান দিয়ে গেছে বয়ে।

বিন্দু কি সব বলে যাচ্ছে, সংলগ্নভাবে কানে যাচ্ছে না। শুধু কথা জিইয়ে রাখবার জন্যে মাঝখান থেকে এক-একটা প্রশ্নও করে যাচ্ছে নয়ান। ওর দৃষ্টিটা আটকে রয়েছে সামনে অনঙ্গর ওপর। অনুশোচনায়, আতঙ্কে। কী ব'লে ওকে আবার ডেকে নিয়ে এল বাইরে নয়ান? নিজের কোন্ সর্বনাশের দিকে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে?

এক একবার মনটা আবার যাচ্ছে উধাও হয়েও জ্যোৎস্নার সমুদ্রে কত দূর দূরান্তে ভেসে—সামনে কোথায় দিগন্তে একটি মাত্র যে বৈশাখী নিশাচর পাখির তান তারও অনেক ওদিকে—এদিকের জীবনের সব অবলুপ্ত—সে যে কী এক অশ্রুত বাঁশির সুর—ধমনীর কোন্ গভীরতম প্রদেশ থেকে রক্ত যেন হঠাৎ সাড়া দিয়ে ওঠে—মনে হয় অনঙ্গর বাঁশি শত ব্যাকুল হয়ে উঠলেও আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। নয়ান গেছে হারিয়ে - নিজের কাছেও, আর সবার কাছেও···

একটা যেন কোন্ অলীক স্বপ্নলোক থেকে বিন্দুকে প্রশ্ন করে—নিজের কথাই নিজের যেন কানে যায় না—প্রশ্ন করে—"হ্যাঁরে, কথাটা কি সত্যি? তুই তো অনেক দেখেচিস, অনেক ঘুরেচিস—বলে, বৃন্দাবন নাকি নিত্যিকার —এই বৃন্দাবনেরই কোথায় সে নাকি নিত্যিলীলা চলচে—এ যমুনা থেকেও আলাদা এক নিত্যি স্রোত, আর নাকি এক অনাহত বংশীধ্বনি—বড় কথা, মানে বুঝি না অত—তবে কে বাজাচ্চে, কোথায় বাজাচ্চে, নাকি বোঝবার উপায় নেই—শোনবারও উপায় নেই—তবে যদি সেই রকমই তপিস্যের জোর হোল কারুর···"

বিন্দু শিউরে ওঠে, বলে—"ওমা, ঠিক নয়তো কি মিথ্যে? নইলে মহাজনরা এই যে সব্বত্যাগী হয়ে বেরিয়ে যাচ্চে তা কিসের জন্যে বলো না। তবে তার জন্যে আর তপিস্তে করে কাজ নেই, ক্ষ্যামা দ্যাও বাপু।"

"কেন রে?"

"ওমা, সে হোল একরকম নিশির ডাকই। কানে গেলে আর রক্ষে আচে নাকি?—একটু অসাবধান হয়ে যদি সাড়া দিয়ে বসলে তো—সব ভুলিয়ে কোন্ বিপাকে নিয়ে গিয়ে যে ঘুরিয়ে মারবে! তার চেয়ে এই বেশ আচি বাপু, খাই-দাই গাজন গাই…"

অতবড় তত্ত্বটাকে এক কথায় পালকের মতো হালকা করে দিয়ে এমন ভাবে বলে উঠল যে না হেসে থাকা যায় না। একটু ফুটেও উঠল হাসি, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না নয়ান; সত্যিই কি ও নিশির ডাকে সাড়া দিয়েই বেরিয়ে এল? একটা তুঃসহ অবস্থায় চারিদিক থেকে ঘেরে নিয়েছিল, তাই থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে মনে মনে সর্বত্যাগের সংকল্প নিয়েই বেরিয়েছে বৈকি। ওর পরনে গেরুয়া শাড়ি, জীবনে আর কখনও পড়েছে বলে মনে পড়ে না। কপালে খয়েরের টিপ ছাড়া কিছু পরত না, সেটা আখড়ার ঘরেই রেখে নাকের মাঝখানে রসকলি টেনে আপাদ-মস্তক যেন গেরুয়া রঙেই রাঙিয়ে নিয়েছে নিজেকে। মনে জানে, বাঁধন আলগা হয়েছে, এইবার অভিসারের ডাকে স্পষ্ট হয় তো এগিয়েই যাবে সব ছেড়ে; কিন্তু সব ছাড়ার মধ্যে অনঙ্গকে হারানোর সম্ভাবনাও যে লুকিয়ে আছে, বেরিয়ে আসবার আগে তা কে জানত?

ভোর-ভোর হয়ে আসছে; যে-আখড়া থেকে বেরিয়েছে আর যেখানে যাবে তুটোর ব্যবধান খুব কম বলে ওরা বেশ ভালো-রকম বিশ্রাম নিয়ে শেষ রাত্রের দিকেই বেরিয়েছিল আজ। প্রসাদ হেঁকে বললে—"একটু পা চালিয়ে নাও গো বিন্দু, এটুকু পথ তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।"

তু'একটা ভোরের পাখি জেগে উঠেছে, রাতের সেটার ডাক খুব ক্ষীণ আর খুব বিরল হয়ে এল, পূর্ব সীমান্তে অল্প একটু সিঁতুরের ছোঁয়া লেগেছে —এই সময় ওরা একটা নদীর ধারে এসে পড়ল। খেয়া পেরুতে হবে, প্রসাদ মাঝিকে হাঁক দিয়েছে, নয়ান বলল—"থাক্ প্রসাদকাকা, একটু জিরিয়ে নিই।"

প্রসাদ বলল—"এটুকু পেরিয়ে নগরবাসীর আখড়াটা আর কোশটাকও নয়, চাকা উঠতে না উঠতে আমরা পৌঁছে যাচ্চি মা, আখড়াটাও বেশ ভালো।"

অনঙ্গ বলল—"আজ তো মেহনতও হয় নি, কতটুকুই বা এসেচি…"

নয়ান অকারণেই একটু উষ্ম হয়ে পড়ল, বেশ একটু মুখ ঝামটা দিয়েই বলল—"তুমি কারুরই মেহনৎ দেখতে পাও না…লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেচ!"

এদের বেশ খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া হয়েছ, সূর্য্যোদয় হয়-হয়, খেয়া-মাঝি আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে তার চালা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রশ্ন করল—"লা খুলতে হবে নাকি গো?"

প্রসাদ নয়ানের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"মেয়ে কি বলে?

নয়ান অলসভাবে উত্তর দিল—"তা খুলবে বৈকি…তোমাদের এটা কী নদী গা?"

"বারুণী।"

একটু চকিত হয়ে উঠলই নয়ান, তারপর অবশ্য সে-ভাবটা সামলে নিয়ে নির্লিপ্তভাবেই প্রশ্ন করল—"পলাশবাটী হয়ে যে-বারুণী বয়ে গেচে?"

হ্যাঁ, নরহরি বৈরিগীর আখড়ার নিচে দিয়ে। আপনারা কোথা থেকে এসতেচ?"

নয়ানের উত্তর দিতে যে একটু দেরি হয়ে গেল তার মধ্যে বিন্দুই বলে দিল—"সেখেন থেকেই।"

মাঝি কথা কইতে কইতেই নেমে গেছে, প্রসাদ, অনঙ্গ, বিন্দু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে, নয়ান বলল—"আখড়াতে আখড়াতেই উঠব এমন কোনও দিব্যি করে বেরুই নি তো প্রসাদকাকা, আজকের দিনটা এখানেই কাটানো যায় না? বেশ চমৎকার জায়গাটি তো, একটা নদীও রয়েচে। কি বলিস গো বিন্দু?"

বিন্দু সতর্কই থাকে, কোন্ সুযোগে কি এসে পড়ে হাতে বলা যায় না তো, বলল—"কুটুমকে সুদোবে না? তিনি কি কন?…জায়গাটা তো ভালই।"

নয়ানও তার দিক দিয়ে সুযোগটা হাতছাড়া করল না, যদিও বিন্দুর কুটুমের ওপর দরদে অতি সূক্ষ্ম একটু হাসি ফুটে উঠলই মুখে। তখন একটু রূঢ় কি ক'রে হঠাৎ হয়ে গেছে বৈকি। অনঙ্গকে বলা কথাগুলো তার, কিন্তু দলের মধ্যে তো কিছু করতেও পারছিল না; বিন্দুর কথাতেই বেশ একটু হেসেই বলল—"তোদের কুটুমকে চটিয়েচি, সে তো উল্টোই বলবে। তোর

মতটা কি তাই বল না, তারপর পেসাদকাকাকেও টানব—ব্যস, ইদিকে তিন ভোট উদিকে এক—যা নাকি আজকাল চলচে।”

অনঙ্গও হেসে বলল—একটু খোঁচা দেওয়ার সুযোগও তো পেলো—বলল—“চটতে ব’য়ে গেচে কুটুমের। টের পাওয়াও তো গেল কে কত শক্ত; সোজা গাড়ির কথা না ব’লে একটু বেঁকিয়ে বলা।”

নয়ান হেসে একটু মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর করল—“চড়লুম গাড়িতে! অপরের নাম করে যার চড়বার শখ হয়েচে বা দরকার পড়েচে সে চড়ুক ব্যবস্থা করে।”

হাওয়াটা পরিষ্কার হয়ে গেল। জায়গাটা সত্যিই মনোরম। কয়েক পা গিয়েই ছোট্ট একটি গ্রাম, গুটি দশেক বাড়ি নিয়ে, তার মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা নেমে গেছে নদীর জলে। একদিকে একটি খুব ঝাঁকড়া আমগাছ, তার সঙ্গে মাথা মিলিয়ে একটা শিমুল গাছ ফুলে ফুলে রাঙা হয়ে রয়েছে। এরই নিচে খেয়া মাঝির আস্তানাটা, একটা চালা ঘর। এসব দিকে ঝোপ-ঝাড়ের বালাই নেই, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চারিদিকটা। থেকে যাওয়া একবার ঠিক হয়ে গেলে প্রসাদ এগিয়ে গিয়ে খেয়া-মাঝিকে ডেকে তুলল, ঘরটা দেখতে হবে। নয়ান যখন ঢো তুলেছে, ধরেই থাকবে, কিন্তু বাইরে তো সমস্তদিন কাটাতে দিতে পারা যায় না, গাছের ছায়াটুকুর ভরসা করে। প্রসাদ নিজের পদ্ধতিমতো লেগে গেল ব্যবস্থা করতে। মাঝি নৌকাব কাছি খুলছিল, হাঁক দিল—“ও কত্তা, একবার উঠে আসতে হয় যে, কথা আচে।”

মাঝি উঠে এল।

“নরহরি ঠাকুরের কথা বলছিলে না? ঐ তানাদের মেয়ে-জামাই।”

পরিচয়ের গুরুত্বটা পরিপাক করবার জন্যে একটু সময় দিল। মাঝি একটু মূঢ়ভাবে থেকে বলল—“অ!”

“কথা হচ্চে—মেয়ের জায়গাটা পছন্দ···আজকের দিনটা এখানেই কাটাতে চায়।”

মাঝি তার নজরে পছন্দর কোথাও কিছু ঠেকে কিনা একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে খোঁজ করে নিয়ে বলল—“তা পছন্দর মতন জায়গাটা বৈকি—পছন্দ না হয়ে উপায় আচে?”

“কথাটা হচ্চে—তা পছন্দ ব’লে গাছতলায় কাটাতে হবে? নরহরি ঠাকুরের মেয়ে-জামাই, কথাটা স্মরণ রাখতে হবে।”

মুখের দিকে চেয়ে রইল অল্প একটু হাসি ঠোঁটে করে। মাঝি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল—"সেই তো সমিস্তে—নরহরি ঠাকুরের মেয়ে-জামাই, আর আমার ঐ কুঁড়েটুকু ছাড়া—ওনাদের যুগ্যি…"

প্রসাদ নয়ানের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"কি গো, মা কি বলে? কুঁড়ে ঘরে অবতীর্ণা হ'তে বাধবে নাকি?"

নয়ান বলল—"কোন্ রাজমহলের মেয়ে পেসাদকাকা তোমাদের? কিন্তু আমি বলি আবার ওঁকে কষ্ট দেওয়া কেন মিছে। দিব্যি পরিষ্কার গাছতলা…"

প্রসাদ একটু হেসে অনঙ্গকে প্রশ্ন করল—"কুটুমের কি মত? দুপুরে গাছ-তলা তো এ-রকম শীতল থাকবে না।"

বিন্দু হেসে বলল—"শ্যামরায়ের আবার আলাদা মত আচে নাকি?—রাধের শীতল তো তাঁরও শীতল। তবে ঘরটা হ'লে রাঁধাবাড়ার সুবিধে হয়…"

প্রসাদ মাঝির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"তাহলে? মা যে বললে—হবে নাকি কষ্ট কত্তার?"

মাঝি বলল—"কষ্ট কি কন? সৌভাগ্যি একটা।…নরহরি বাবাজীর মেয়ে-জামাই—কুঁড়ের আমার জন্ম পালটে যাবে গো!"

প্রসাদ একটু হাসি ঠোঁটে নিয়ে এমনভাবে এদের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গেল, যেন ঠিক এইভাবে কথাগুলা না তুললে কার্যসিদ্ধি হোত না এবং সে না থাকলে কেউ এ-ভাবে তুলতেও পারত না কথা; মাঝির পিঠে একটু ঠেলা দিয়ে বলল—"তাহলে চলো দেখিগে।"

থাকাটা একবার ঠিক হয়ে যেতে নয়ান হঠাৎ যেন মেতে উঠল। একেবারেই অন্য এক মানুষ, কিম্বা ওদিককার কোন্ একদিনের সেই নয়ান। দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"বিন্দু চল্, আগে বারুণীতে চানটা ক'রে আসি দুজনে, যেন কতদিন…"

অনঙ্গর দিকে ফিরে বলল—"আর তুমি একটু ওঠ বাপু—বিন্দেসখী চান করবে আর তুমি যে তীরে বসে…মানলুম কদমতলা নয়, শিমূলতলাই, তবু…"

নদীটা নেমে এসে আরও একটু বিস্তারলাভ করেছে এখানে। অনেকক্ষণ গা বুড়িয়ে বসে স্নান করল নয়ান। বিন্দুর সঙ্গে গল্প করছে আর এক-একবার দুটো হাতের আলিঙ্গনে জল টেনে নিচ্ছে নিজের বুকের দিকে। একবার বিন্দুকে বললও—"বারুণী যেন কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে পা টিপে টিপে ঘুরে এসে পথ আগলে দাঁড়াল, না রে?"

অনেকক্ষণ গেল। উঠে কাপড় ছেড়ে যখন ওপরে এসেছে, দেখে মাঝি আর প্রসাদ গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, হাঁক দিল—"ও পেসাদকাকা, পেছু ডাকলুম, একবার ফেরো।"

প্রসাদ এলে প্রশ্ন করল—"বাজারে যাচ্চ নিশ্চয়।"

প্রসাদ বলল—"হ্যাঁ, ওদিকে ঘর পস্কের করে নিপিয়ে-পুতিয়ে ঠিক করে রাখলুম, যাই এবার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি, তাত বেড়ে যাচ্চে।"

"কি পাবে?"

তখনই সংশোধন করে নিয়ে প্রশ্ন করল—"কতটুকু পাবে? এই তো গাঁ দেখচি।"

প্রসাদ মাঝির দিকে চেয়ে বলল—"কত্তারও ব্যবস্থা আজ এই হেঁসেলেই তো, তাই সুদোচ্চে মেয়ে। তা জন পাঁচেকের যুগ্যি চালডাল আলুটা যাবে না পাওয়া?"

নয়ান বলল—"জন পাঁচেকের জন্যে আমি রেঁধে মরতে গেলুম! কাজ নেই তোমাদের দোকানে গিয়ে। চিঁড়ে-গুড় তো রয়েচেই, একগাল করে মুখে ফেলে দিলেই হবে।"

তিনজনেই একটু ধাঁধায় পড়ে গেছে, প্রসাদ—"তাহ'লে..." বলে কিছু আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, নয়ান মাঝিকে প্রশ্ন করল—"ছোট্ট তো গাঁ, তোমরা দুজনে নরহরি বাবাজীর মেয়ে-জামাই বলে যে-রকম ঘোট আরম্ভ করেচ, এসে জুটবে সবাই ঘেরে-ঘুরে। রান্না উঠবে কি করে নরহরি বাবাজীর মেয়ে-জামাইয়ের মুখে তা বলো।"

অনঙ্গকে জড়াবার জন্য ঘাড়টা ফিরিয়ে একটু হেসে বলল ··"জামাইয়ের হয়তো বেশ উঠবে; শ্বশুরবাড়ির দেশ তো।"

অনঙ্গও হেসে বলল—"উঠবে না কেন? তবে সম্বন্ধীদের খোঁটা খাওয়া আচে তো তার ওপর; হজম হবে?"

প্রসাদের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে আসছে; স্বভাবটা তো জানে নয়ানের। আবার বড়াই করে কিছু বলতে যাচ্ছিল বোধ হয়, নয়ান মাঝিকে প্রশ্ন করল—"কত-গুলি হবে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ছেলেয়-বুড়োয়, মেয়ে-পুরুষে?"

"সামন্তর বাড়িতে হোল গিয়ে তিনজন—বুড়ো-বুড়ি, নাতনীটা"—বলে আরম্ভ করে মাঝি ঘর গুণে গুণে তেত্রিশ জনের একটা ফিরিস্তি দিল। অত চাল ডাল গাঁয়ের দোকানে কোথায়? তাহলে বুড়গাঁয়ে যেতে হয়। পো খানেক পথ।

নয়ান বলল—"সেখেনেও যদি আলু পজ্জন্তই পাওয়া যায় তো না হয় নাগর-বাসীতেই যাবে। নরহরি বাবাজীর মেয়ে-জামাই নিজেই বা এক চচ্চড়ি ভাত কি করে মুখে দেবে আর পাঁচজনের সামনে ধরে দিয়েই বা কি করে দাঁড়িয়ে অপমান হবে?"

মাঝি বলল—"না, বড়গাঁয়ে সব পাওয়া যাবে; আজ আবার হাটবার, যেতে যেতে জুটতেও আরম্ভ করবে সব।"

ওরা এগিয়েছে, নয়ান আবার ডাকল। বলল—"আবার পেছু ডাকলুম। বলছিলুম জিনিসপত্র তো মন্দ হবে না, দুজনে বইয়ে আনতে কষ্ট হবে না এতটা পথ? তাই বলছিলুম, সঙ্গে যাব? আমিই না হয়।"

প্রসাদ বিদ্রূপ ক'রে বলল—"তাই তো গা, বোঝাটা কি কম হবে! তোর না এলে চলে!"

অনঙ্গ বলল—"যতটাই হোক, দুজনের জায়গায় তিনজন হলে তো হালকাই হবে। আমি আসচি না হয়!"

পা বাড়াল। নয়ান দুজনের কথার উত্তর দিয়ে বলল—"বোঝা না হয় হালকাই হোল, তবু একজন মেয়েছেলে হলে হাট থেকে বেছে-বুছে আনতে পারি তো, কোন্ আনাজের সঙ্গে কোন্ আনাজটা মিলবে, ঠিক মশলা কি তার —এসব তো বেটাছেলে বুঝবে না · "

বিন্দু কথাটা বুঝেও যেন বুঝতে পারছে না এইভাবে একটা হাসিকে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল, একটিপ গুল মুখে ফেলে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে বলল—"রান্নার হিসেব সে তো বিন্দির চেয়ে নরহরি ঠাকুরের মেয়েও বুঝবে না, সোতোরাং কেন, আমিই যাব।"

ওরা খানিকটা এগিয়ে গেলে, নয়ান একটু মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে মন্তব্য করল—"পোড়ারমুখী বুঝেও খানিকটা লজ্জার মাথা খাইয়ে বলিয়েই নিলে। চলো গোসাঁই, অনেক দিন বাঁশি শুনিনি তোমাব, নদীর পাড়ের আড়াল হয়ে ঐখানটায় বসিগে চলো।"

বারুণী মানেই পলাশবাটী, আর পলাশবাটী মানেই এদিককার এই জীবনটা, নিবিড়তম সুখ আর নিবিড়তম দুঃখে যেটা কাটিয়ে এল এই দুবচ্ছর ধরে। নয়ানের হয় তো সেইদিনের কথা মনে পড়ে গেছে, প্রথম যেদিন জিরেন থেকে চলে এসে প্রবেশ করেছিল এই জীবনে।

কে জানে, নিজের মনকে ঠিক বুঝতে পারছে না, ঠিক ধরতে পারছে না,

তার নিয়তি তাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে এবার। হয়তো বিদায়ই নিল সেই জীবন থেকে, বারুণীর সঙ্গে হয় তো এই শেষ দেখা। তাই সেই প্রথম দিনটিকে আর একবার এনে ফেলল বারুণীর তীরে, যতটা সম্ভব ছুটি দিনকে এক করে মিলিয়ে। উদয়রাগে আর অস্তরাগে কতটুকুই বা থাকে তফাৎ?

সেই দিনকার মতোই বারুণীর তীর সমস্তদিন উৎসব মুখরিত হয়ে রইল। সেদিনকার মতোই রান্না-বান্না, হাসি-হুল্লোড়। অল্প লোক, সে-হিসাবে আয়োজন অল্প, কিন্তু প্রাণের একটা জোয়ার এনে ফেলে সংখ্যা-আয়োজনের দৈন্য ঘুচিয়ে তাদের যেন চতুর্গুণ করে তুলল নয়ান।

সেদিনকার মতোই সব মিটে-মাটে যেতে দিন প্রায় শেষ হয়ে এল।

এর পরেই নয়ান হঠাৎ বেরিয়ে পড়তে চাইল। সবাই বিস্মিত হয়ে পড়ল বৈকি। একে তো ওদের পদ্ধতিই হচ্ছে রাত্রির বেশ খানিকটা পর্যন্ত বিশ্রাম করে নিয়ে তারপর বেরুনো, ছু'দিন যা করে আসছে। তার ওপর আজ বেশ ক্লান্তও। নয়ান কিন্তু কোন কথাই শুনল না; ওদিককার সব কিছুর ওপর যেন একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে চায়। অনঙ্গ বলল—"আমি তো বলতে যাচ্ছিলুম—ফিরেই চল্। এই শরীর, তার ওপর ঝোঁক ধরলে এইরকম মেহনৎ করতে করতে যদি যাস তো কতদূর এগুবি বল্। তার ওপর এই জিদ, সকালে জিরোবার দরকার ছিল না, কামড়ে বসে পড়লি—এখন এত দরকার অথচ…"

একটু বিরক্তির ভাব এসেই পড়ে; নয়ানও মুখ ভার করেই মাথায় ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—"আমার কি দরকার তা তুমি বুঝবে না; ক্ষ্যামতা নেই বোঝবার।"

বিন্দু অনঙ্গর পক্ষ নিয়ে বলল—"না, ক্ষ্যামতা কারুর নেই। তা বেশ, এখেনটা ভালো না লাগে—হঠাৎ নিঝুম হয়েও তো পড়ল—নাগরবাসীর আখড়াতেই গিয়ে উঠিগে চলো সবাই।"

নয়ান সেইভাবেই বলল, তবে আরও কটু করে—"তুই থাকগে আর তোদের কুটুম থাকগে। কি গো পেসাদকাকা, তুমিও থাকবে, না, আমার সাথে এগিয়ে যাবে?"

আর কেউ ঘাঁটাল না।

বৈশাখের বারুণী, সব জায়গায় স্নায়ের জল নেই, একটু ঘুরে-ফিরে ওরা

যখন প্রায় অর্ধেকটা গেছে—হঠাৎ একটা ডাক পৌছল—"মাঝি ভাই, একটু ফিরবে না? আমিও এই খেয়াতেই যেতুম তাহলে!"

সবাই ঘুরে চেয়েছে; তবে অনঙ্গ আর নয়ান একেবারে উদ্গ্রীব হয়ে। কথা ফুটল প্রথমে নয়ানের মুখেই, তীরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে ছিল, উল্লসিত বিস্ময়ে বলে উঠল—"ওমা, ভূষণ-ঠাকুরপো যে!—না গা?—মাঝি, নৌকোটা ফেরাও শিগ্‌গীর।"

আঠাশ

তীর্থ থেকে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে ফিরে এসে ভূষণ সোজা জিরেনে চলে গিয়েছিল। গিয়ে কিন্তু একতিল কি শান্তিতে ছিল? মৈনে থেকেই শুনে গিয়েছিল পলাশবাটীতে ভীষণ বসন্তর মহামারী হয়ে গেছে। আখড়ার সম্বন্ধে এইটুকুই খবর কোনরকমে যোগাড় করতে পারল যে ওদিকটায় নাকি যায় নি। তা এটুকুতে কি নিশ্চিন্ত থাকা যায়? আসবার জন্যে ছটফট করছিল, কিন্তু এমন আটকে গেল দুটো দিন যে কোন মতেই বেরুতে পারল না। তারপর কাল শেষরাত্রে বেরিয়ে সকালে পলাশবাটীতে পৌছে ব্যাপার দেখে, খবর শুনে চক্ষু চড়কগাছ!—বাড়িতে তালা ঝোলানো—নয়ান-বৌদিদির একরকম পুনর্জন্ম গেছে—তিনদিন হোল সবাই তীর্থ করতে বেরিয়ে গেছে। তখনি তখনি ছুটছিল, কিন্তু সোনা কোনমতেই না খাইয়ে ছাড়ল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নদীতে স্নান করে দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে—তারপর এই আখড়ায় আখড়ায় খোঁজ নেওয়া আর সমস্ত দিন একরকম ছুটেছুটেই আসা—এদের নাকি মথুরা-বৃন্দাবনের ধাওয়া, গাড়িতে একবার চড়ে বসলে তো আর নাগাল পাওয়া যাবে না...

ওরা এগিয়ে আসতে আসতেই সমস্ত কাহিনীটা শুনল। একেবারে তীর থেকে খানিকটা ভেতর পর্যন্ত হাঁটুর নিচে জল, তলায় বালি দেখা যাচ্ছে, ভূষণ কাপড়টা একটু গুটিয়ে আসছিল চড়বার জন্যে, নয়ান খানিকটা শিউরে উঠে বলল—"ওমা দেখো, নৌকয় চড়তে আসচে!—যে মানুষটা নিজের মুখেই বলচে একমুঠো নাকেমুখে গুঁজে বোশেখের রোদ মাথায় ক'রে ছুটে ছুটে আসচি!"

অনঙ্গর দিকে চেয়ে বলল—"কি গো, তোমার রাধার বেয়াক্কেলেপনায় কিছু বলতে হবে না?"

উত্তর দিল বিন্দু, বলল—"আসল রাধার আক্কেল ঠিক থাকলেই নকল রাধা সামলে যাবে।·· তাহলে নামাই স্থির তো?"

ভূষণ সারা কাহিনীটা বলার ঝোঁকে অন্যমনস্ক হয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল, বলল—"নামা মানে! এগুতে দিচ্চে কে আর?—সোনাদির মুখে যেমন সব শুনলুম···"

নয়ান সবাইয়ের সঙ্গে নেমে আসতে আসতে হেসে উত্তর করল—"কে রুখচে সেটাও একবার দেখতে হবে। দাদাই বড় পারলে তো ছোট ভাই!"

অনঙ্গ যেন একটু আওতায় প'ড়ে গেছে, এতক্ষণে যেন একটু চেষ্টা করেই খুঁজেপেতে একটা প্রশ্ন করল—"তা হ্যাঁরে, দুটো দিন আটকে গেলি বললি যে, খবর ভালো তো গাঁয়ের?···আমাদের বাড়ির···"

ভূষণ বলল—"তাইতেই তো বিলম্ব হয়ে গেল: বাড়িতে কেউ থাকবে তবে তো খবরটা নোব, তা···"

একটু যেন হঠাতই থেমে গেল। অনঙ্গ প্রশ্ন করল—"কেউ নেই? গেচে কোথায় সব?"

"থাকবে না কেন, ভিকিরী-জ্যাঠা আচে খালি, এরা গেচে মন্দিরতলায়—জ্যেঠীমা আর···"

আবার থেমে গেল। বিন্দু বলল—"তা মণ্ডলমশাই নিজেই যখন ছিলেন···"

নয়ান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভূষণের মুখের পানে চেয়ে শুনছিল, অল্প একটু হাসির রেখা টেনে বলল—"ও যার-যার নিজের মুখেই শোনা ভালো—তুমি কেমন আছ—তুমি কেমন আছ গা—তুমি কেমন আছ?···তা মা আর টগর-ঠাকুরঝি এলেন ফিরে?

ভিখারীকে যে কেন প্রশ্ন করা সম্ভব হয়নি তা অনঙ্গ বোঝে, তবে নয়ানের মুখ টিপে হাসির অর্থটা ধরতে পারল না; কিম্বা হয়তো খেয়াল বা চেষ্টাই করল না; প্রশ্ন করল—"তা আচে কেমন মা আর টগী?"

ভূষণ যেন একটু বিরক্ত হয়েই উত্তরটা দিল—

"আরে আসবে ফিরে তবে তো টের পাব আচে কেমন কি বৃত্তান্ত। দিন তিনেক গেচে, দলের মধ্যে সহদেবের মা, ঘোষগিন্নী ফিরে এল, ওদের আর

ফেরার চাড় হয় না, রাঙাপিসীর পাল্লায় পড়েচে তো ; পুন্নিমে কাটিয়ে আসবে! বললুম থাক্ তাহলে, আমার মন এখন অন্যদিকে পড়ে রয়েচে।··· চলে এলুম।"

নয়ানের হাসিটা স্পষ্ট হয়ে আসছে, কতকটা যেন সামলাবার জন্যেই গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলল—"কী বেয়াক্কেলে মানুষ···জ্যাঠাইমা, একটা লোক খবর নেওয়ার জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে আচে। অথচ ···"

আর চাপতে পারল না হাসিটা, ভালোভাবে স্পষ্ট ক'রে দিয়েই বলল—"থাক সেকথা ; নিজে কেমন আচ তাই বলো।"

মাঝি যে চৌকিটায় শোয় সেটা বাইরে বের ক'রে রাখা ছিল, ওরা এসে বসল তাইতে। অনঙ্গ বলল—"আচিস তো ভালোই দেখচি। তীর্থে তীর্থে ঘুরে, রাজভোগ খেয়ে দিব্যি চেকনাই হয়েচে। তারপর, কেমন ঘুরলি, কেমন সব দেখলি সেই কথা বল্।"

ভূষণ হেসে নয়ানকে সাক্ষী মানল—"কিরকম খুঁড়চে দেখে থোও নয়ান-বৌদি! অমনি চেকনাই দেখলে!"

নয়ান বলল—তুমি বলচ খুঁড়চে, আমি বলচি একচোখোমি। ভাই তীর্থে তীর্থে ঘুরে চেকনাই নিয়ে এল—অবিশ্যি আমি বলচি না ঠাকুপো, দোহাই! —এদিকে আমায় যে সেই পথে একটু ছেড়ে দেবে তা নয়।···অবিশ্যি রাজভোগটা আর কোথায় পেতুম, তবে···"

অনঙ্গ বিজেতার উৎসাহেই বলে উঠল—"অপবাদ দেওয়াটা শুনে রাখ্ ভূষণো!···অথচ আমি গোড়াতেই সেকথা এসে বলেছিলুম—কুমারবাহাদুর একটা গোটা বাড়িই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন—ওর ওরকম অসুখের কথা শুনে—আর ভালো জায়গাতেই—তীর্থেই—গয়া, বদ্যিনাথ, যেখানে পছন্দ —রাজভোগই হোত, লোক কিরকম জানিসই তো কুমারবাহাদুর ;—তা শুনলে?···আর কেউ না জানে বিন্দু জানে – কি গো বিন্দু?"

আসামী আর সাক্ষী দুজনের মুখেই একটা গাঢ় ছায়া এসে পড়েছে, তবে জ্যোৎস্না হ'লেও গাছতলায় অন্ধকারে কারুর নজরে পড়ল না। নয়ান বরং হেসেই বলল—"তাহলেই বোঝ কী অপরাধটাই না করেচি তোমার দাদার কাছে ঠাকুরপো, এমন মানুষকে আস্কারা দিতে আচে!··থাক্, খুঁজতে গেলে আরও কত বেরুবে, তুমি তোমার গল্প বলো শুনি।"

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প চলল। প্রসাদ মাঝিকে সঙ্গে করে বড়গাঁয়ের

বাজার থেকে ফিরে এসে চৌকির নিচে হাঁটু মুড়ে বসেছে, বিন্দু ঢুকেছে হেঁসেলে। দুজনেই গিয়েছিল কুমারবাহাদুরের সঙ্গে, মাঝে মাঝে তাদের অভিজ্ঞতার কথাও এনে ফেলে গল্পের গুরুত্ব দিচ্ছে বাড়িয়ে। নয়ানের নির্দেশে যতটা পেরেছে ভালো করেই আনাজপত্র এনেছে প্রসাদ; বিন্দুও বেশ ফলাও ক'রেই রান্না ফেঁদেছে। নিস্তব্ধ নদীতীরের রাত্রি গভীর হয়ে উঠল। খাওয়ার সঙ্গেও গল্প; অবশ্য এদিক-ওদিকেরও পাঁচটা গল্প এসে পড়ল। খাওয়ার পরেও। তারই মধ্যে ভূষণ একবার জিগ্যেস ক'রে বসল—"তাহলে, বৌদি কি ঠিক করলে—এগিয়েই যেতে হবে, কি ফিরবে পলাশবাটী?···এগিয়ে যাওয়া কিন্তু তোমার হবে না, এই বলে রাখলুম—এই শরীর নিয়ে মথুরা-বৃন্দাবন! নঙ্গদাও যে···"

অনঙ্গ বলল—"নঙ্গদা হার মেনে বসেচে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে; তুই এসেচিস, দেখ যদি পারিস।"

ঠিক একটা ক'রে ফেলেছে নয়ান, কিন্তু সে-কথা না তুলে বলল—"এ যে উল্টো উৎপত্তি! এলে, কোথায় ভাবলুম বেশ দল পুরু হোল, না, পেছুর দিকে টান! শরীরে কি এমন দেখলে তুমি? শরীর ঠিক না হয়ে গেলে, কি তোমার দাদাই আসতে দিত, না আমি পারতুম আসতে?—এই এতটা পথ তো এসেচি চলে।"

ভূষণ বলল—"শরীরের কথা নঙ্গদার চেয়ে যে আমি ভালো বুঝব সেকথা ভুলচ কেন?"

রান্নাঘরে বিন্দু কি করছিল, ভ্রূ কপালে তুলে মাথাটা একটু দুলিয়ে দিল; অবশ্য কে আর সেটা টের পেল? নয়ান প্রশ্ন করল—"তার মানে?"

"নয়তো কি? নঙ্গদা রয়েচেন সব্বদা কাছে কাছে, তাঁর নজরে কি ঠিকমতো ধরা পড়তে পারে? আমি দেখচি সেই কোন্ দশ মাস পরে।"

বিন্দু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কপাটের কাছে দাঁড়াল, হেসে বলল—"আমি তাহলে তোমার নঙ্গদার হয়ে একটা কথা বলি ভাই, তিনি কিন্তু যে-নজরে দেখবেন তুমি ঠিক সে-নজরে দেখতে তো পারবে না!···ঠাট্টা হিসেবেই নিও কিন্তু ভাই, মুখ-আলগা মানুষ আমি, সুবিধেটা হাতে পেলে কেমন থাকতে পারি না।"

তেমন হাসির কিছু না থাকলেও পাঁচজনের মধ্যে কথার কাটান্ পড়লে যেমন একটু হাসি এসে পড়েই, সেই ধরণের একটু হাসি ছলকে পড়ল। তবে

সবার মুখে সমান নয়। ভূষণ কথার উত্তর না পেয়ে সরলভাবে ঠাট্টার কথাটা ধ'রেই আরম্ভ ক'রেছিল—"তা ঠাট্টা করবেন বৈকি, ঠাট্টার যখন সম্বন্ধ⋯"

প্রসাদ বাধা দিয়ে বলল—"তাহ'লে আমিই বা কেন চুপ ক'রে থাকি? ওনার হয়ে বলি একটা কথা। বলি—কেন, দেওর লক্ষ্মণ কি কম ছেল নাকি? ভাই আর ভেজের জন্যেই তো ⋯"

বিন্দু ভেতরের দিকে ঘুরছিল, আবার ফিরে দাঁড়িয়ে গালে আঙুল টিপে বলল—"ত্যাখো পেসাদ ভাইয়ের ভীমরতি, আবার ওকালতি করতে আসে। লক্ষ্মণ কিন্তু ভেজের দিকে মুখ তুলে চাইতেনই না কখনও, শুধু পা-দুখানি⋯"

এবারও উঠল হাসি একটু, বেশ লাগসই কাটান্ তো। কিন্তু কোথায় যেন একটু কি হয়ে গেল, নয়ানের তীর্যক দৃষ্টি যেন আপনা থেকেই অনঙ্গর মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

গল্প-গুজব চলল। নয়ান একটু অন্যমনস্ক ছিল। বেশি দেরি নয়, অল্প কয়েকটা কথাবার্তার পর হঠাৎ বলে উঠল—"আমরা দুজনে একটু ঘাটে গিয়ে বসিগে চল্ বিন্দু, কেমন যেন ঘুম আসতে চাইচে না, শরীরটা ঠাণ্ডা হলে যদি আসে। চল্।"

নেমে গিয়ে নৌকার পাটাতনের ওপর মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে বলল—"একটা গান গা, সেই জন্যেই ডেকে আনলুম, বেশ চমৎকার রাতটি।"

গান কেউ এককথায় বড় একটা গাইতে চায় না; একটু আপত্তি করাই যেন নিয়ম বা ভদ্রতা। বিন্দু বলল—"কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেচে যে, এত রাত্তিরে ⋯⋯"

নয়ান এইটুকুরই অপেক্ষা করছিল, ওকে কথাটা আর ফেরাবার সময় না দিয়ে বলল—"তাহলে এক কাজ কর, বেশি রাত্তিরে বাঁশি বাজানো তোদের কুটুমের একটা রোগেরই মধ্যে, ওকে ধ'রে গড়গে যা—সবাই মিলে, ছাড়বিনি কোন মতে। চল্, ওঠ্।"

নয়ানের একরকম ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। আজই সন্ধ্যায় যখন মনে করেছিল বারুণীকে শেষ আলিঙ্গন ক'রে নৌকায় উঠেছে, তার পর থেকেই ওর সংকল্প গেল উল্টে! অত দোটানার মধ্যে আগের দিকে পা বাড়ান যায় না। ⋯⋯দূরের ডাক, মুক্তির ডাক, ধমণীতে বাপমায়ের রক্তের দোলা—এগুলোকে অস্বীকার করতে পারছে না, তবুও পেছনের আকর্ষণ যেন ক্রমেই দুর্বার হয়ে

উঠছে; বিশেষ করে তখন থেকে যখন মনটা ঘুরেঘারে এসে অনঙ্গর ওপর আটকে গেল। যখন খেয়াল হোল ওর মন আরও মুক্ত; বাইরে নিয়ে এসেছে, কিন্তু পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবে না ওর সঙ্গে; মুক্ত হাওয়ায় ওর বাঁশির সুরের মতোই হয়তো মিলিয়ে যাবে নয়ানকে ফাঁকি দিয়ে।

অনঙ্গকে অবলম্বন ক'রে আবার কেমন ক'রে সব একে একে ফিরে আসছে—আখড়া, ঘর, সোনা, লক্ষ্মণ, পেয়ারী, বারুণী। নৌকা যতই চড়া এড়িয়ে ঘুরেফিরে এগুচ্ছে, এইটেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে জিরেন ছেড়ে আসা আর পলাশবাটী ছেড়ে আসা এক নয়।

তবে পলাশবাটীর কাছে ঠিক যে হার মেনে ফিরে যাবে তাও নয়। নয়ান পলাশবাটীর সঙ্গে একটা আপোষ করেছে—ওকে বাবা-মায়ের মতো একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে না। একটা ব্যবস্থা করে হাসিমুখেই নেবে বিদায়। বাবা-মা তো নিজের সন্তানকেও দিয়ে গেল ভাসিয়ে; নয়ান সবার ব্যবস্থা করে আসবে এবার, সব কিছুরই—লক্ষ্মণ, সোনা, পেয়ারী; বাড়ি, আখড়া—যারাই বা যা-কিছুই মুখচুণ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল বিদায়ক্ষণে। নিজের চিন্তা নিয়ে চুপ করে বসে আছে নয়ান, নৌকার গলুইয়ের মতোই চিন্তার মোড় ফিরে ফিরে যাচ্ছে।......আবার তো সেই অনঙ্গকে বাঁধন থেকে মুক্ত করে বের ক'রে আনা! · কিন্তু অত দূর বোধ হয় চিন্তা এগিয়ে যায় না।·· ···কত কী হবে ততদিনে।......আর, সবার বাঁধন কাটানো যায়, কিন্তু নয়ানের বাঁধন কি এতই আল্‌গা নাকি যে ইচ্ছে হলেই খুলে দিয়ে চ'লে যাবে অনঙ্গ?

নৌকা চলেছে; ব্যবস্থার কথা ভাবছে নয়ান। ঠাকুরমশাই নেবেন না ভার; কতদিন পরের কথাও তো, হয়তো অথর্ব হয়ে গেছেন তখন····· বেশ তো, নাতি রয়েছে ওঁর। নাতিকে দিতে না চান, বংশে দান-পরিগ্রহের দাগ না লাগাতে চান, লক্ষ্মণ-সোনা রয়েছে। লক্ষ্মণ অবশ্য কিছু নয়, কিন্তু সোনা রয়েছে—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাকে তালিমও দিয়ে রাখবে তো নয়ান। চিন্তাটা একটা থেকে একটায় যেন লাফিয়ে চলেছে; লক্ষ্মণ সোনাই বা কেন?—পেয়ারী তো রয়েছে! আর একটু বড় হলেই ওর জন্যে একটি শ্যাম কান্তি কিশোর এনে নেবে নয়ান—তারপর···

চিন্তাস্রোতে হঠাৎ বাধা পড়ল।

"মাঝি ভাই! একটু ফিরবে না?"

মুখ ঘুরিয়ে দেখেই নয়ান উল্লসিত হয়ে উঠল, ডাকছে ভূষণ যে! সেই

থেকে উল্লাসের ঢেউ একটার পর একটা ভেঙে পড়ে এমনভাবে আচ্ছন্ন আর অভিভূত করে ফেলেছে নয়ানকে যে কী যে করে যাচ্ছে, কী হয়ে যাচ্ছে, কী যে তার পরিণাম হতে পারে—স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখবার যেন আর উপায় ছিল না। —ওর সমস্যা যে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে মিটে গেল। এই তো ভূষণ-ঠাকুরপো রয়েছে, তবে আর পলাশবাটীর ভার গছিয়ে দিয়ে আসার ভাবনা কি এত! ভূষণ-ঠাকুরপো মানেই তো তার সঙ্গে টগর-ঠাকুরঝি; এ দুজনের চেয়ে নয়ানের বেশি আপনার আর আছেই বা কে? আর, এ দুজন এক হয়ে গেলে সে যে কত আপনার তার কি কোনও হিসাব আছে?

সমস্ত রাত নয়ানের ঘুম হয়নি; এই চিন্তাতেই কাটিয়েছে; এই সম্ভাবনা-টুকুকে বুকের মধ্যে নিয়ে লালিত করেছে।

সকালবেলা যখন আবার কথাটা উঠল—ভূষণই তুলল—নয়ান অপেক্ষাই করেছিল, হেসে বলল—"কেউ ফেরাতে পারলে না, তুমি এসেই সবার ওপর টেক্কা দিয়ে জিতে যাবে ভেবেছ? তবে হ্যাঁ, দেওর, অমন মিষ্টি সম্পর্ক, এসেচও একেবারে ছুটে, মান রাখতে হবে বৈকি। ফিরব, তবে পলাশবাটী নয়। অনেকদিনের জন্যে বেরিয়েচি, একবার মন্দিরতলাটা দেখে গেলে মন্দ হয় না। আমার তীর্থও বজায় থাকবে, তোমার মান রেখে ফেরাও হবে খানিকটা।"

ভূষণ ভবিষ্যতের কিছু একটা ভেবে নিয়ে হেসেই বলল—"আচ্ছা ফেরো তো এখন, পরের কথা পরে দেখা যাবে।"

বিন্দু ছিল, অনঙ্গও ছিল। বিন্দু বলল—"যাক, ছোটভাই তাহলে দিলেই দাদার ওপর টেক্কা।···ভালো।"

উনত্রিশ

দূরের টান নেই আর, ওরা বেশ থিতিয়ে জিরিয়েই মন্দিরতলার দিকে এগুতে লাগল। কাল পূর্ণিমা, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেই চলবে। গতির লয়টা বিলম্বিত করে এনেছে নয়ান-বৌ-ই, যার হয়তো সব চেয়ে বেশি আগ্রহ তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবার। আসলে নয়ান চিন্তার জন্য সময় নিচ্ছে। ও যে বলল মন্দিরতলায় গেলে ওর তীর্থযাত্রার জিদটা বজায় থাকবে সেটা আদৌ ওর মনের কথা নয়; নয়ান চলেছে টগরের কথা শুনে। টগর এসেছে,

ভিখারী ফিরে যাওয়ার পর আটকেও গেছে, স্থতরাং যত তাড়াতাড়ি পৌছে যাওয়া যায়। কিন্তু মস্তবড় প্রতিবন্ধক যে সঙ্গেই রয়েছে, শাশুড়ী শঙ্করী, তার দৃষ্টি এড়ানো যায় কি করে ?

এ তো গেল গোড়ার কথা। তারপর টগরের সঙ্গে যে উদ্দেশ্তে গিয়ে দেখা করা।—

একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছে নয়ান, টগর আর ভূষণের মধ্যে মেলামেশা আছে, তারপর এটা বেশ ধরে নেওয়া যায় যে ভিখারী আর শঙ্করীর মতো দু'জোড়া কড়া চক্ষুতে ধূলা দিয়ে যে মেলামেশা তার আসক্তি নিশ্চয় খুবই তীব্র।

কড়া চোখ হার মেনেই বসে আছে, অথচ এদিকে নয়ানের কাছে ব্যাপারটা একদিন সামান্ত একটা চিরকুটের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে গেল, অবশ্য সন্দেহের আকারেই।

একেবারেই গোড়ার দিকের কথা, নয়ান আর অনঙ্গ সবেমাত্র এসেছে জিরেন থেকে। নয়ানের বাবা আর মা আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে ঠাকুরমশাই উদ্ধবকে দিয়ে একখানা গাডি ক'রে জিনিসপত্রগুলা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, উদ্ধব ফিরে এসে একখানা চিঠি দিল নয়ানের হাতে, ঐ চিরকুট। লেখা রয়েছে মাত্র দুটি ছত্র—'রাগ পড়ল না কি ? ইদিকে তো সব ঠিক।'

নয়ান নামটা বলতে উদ্ধবের স্মরণ হোল, বলল—"হ্যাঁ, যে দিয়েচে সে নিজের নামটা টগীই বললে বটে।"

টগর কিন্তু লিখতে জানে না। তবে লিপিকারকে বের করতে মোটেই বেগ পেতে হোল না নয়ানের। অনঙ্গর যাত্রার দলের যে সব পার্ট-লেখা হোত, দুপুরের অবসরক্ষণে টেনে নিয়ে পড়ত নয়ান। তাতে দুটি হাতের লেখাই দেখেছে, তৃতীয় নয়, অনঙ্গর আর এক ভূষণের।

কোথাও যেন লুকিয়ে ব'সে তাড়াতাড়ির মধ্যে লেখা। যে লিখিয়েছে, একেবারে সময় না থাকায় শেষের দিকে প্রায় ছোঁ মেরেই চিরকুটটা নিয়ে ছুটেছে। উদ্ধব নয়ানকে বলেছিল—গাড়ি নিয়ে গ্রামের বাইরে এসে পড়েছে, এমন সময় জামাইয়ের বোন ছুটে এসে চিঠিটা দিলে। হ্যাঁ, নামটা টগীই বললে বটে।

চিঠিটা গুপ্তধনের মতোই নয়ান বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। সাত-পাঁচ ভেবে অনঙ্গকে আর জানায় নি। সর্বদা যে মনে করেও রেখেছে এমন নয়,

তবে মনে যখন পড়েছে, স্বপ্নের জাল বুনেছে বৈকি।···ভূষণ ছেলেটা বড় মিষ্টি, ভিখারী আর শঙ্করী যাই না বলুক ; আর টগরের মতো অমন ননদ কি পাওয়া যায় ?

তারপর পলাশবাটীতে থাকার প্রায় মাঝামাঝি এসে একদিন মনে হোল স্বপ্ন যেন হঠাৎ বাস্তবের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছে।···কুমারবাহাদুরের পাঠানো যাত্রা অপেরার মরশুম চলেছে আখড়ায়। ভিখারী এসেছে। পুরনো যা-কিছু ওদিককার সব গেছে ঘুচে, সেবায়-যত্নে সরলপ্রাণ শ্বশুরকে আবার আপন করে নিয়েছে নয়ান, জিরেন-পলাশবাটী এক হয়ে গেছে, ঠিক হয়েছে নয়ান এইবার যাবে জিরেনে। টগরের বিয়েতে !

বিয়েটা অনিশ্চিত সে ভিখারীর কাছে ; নয়ানের কিন্তু সব ঠিক ঐ চিরকুটটুকুর জোরেই। সেই সফলতার আনন্দেই বারুণী থেকে ফেরবার পথে ভূষণকে তার গোপন স্থান থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসছিল বাসায়, এক মুহূর্তেই সমস্ত স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

তারপর নিজেকে নিয়ে অন্তরে-বাইরে যে বিপ্লবটা গেল তাতে স্বপ্নের জাল বোনার আর অবসর পেলে কি নয়ান ? মনে মনে এদিককার এই কটা মাসের ওপর দিয়ে ঘুরে এসে নিজের আচরণে নিজেই বিস্মিত হচ্ছে। অপরে কি ভেবেছে বলতে পারে না তবে নিজের মনটা সংশয়ান্বিতই ; সে কি প্রকৃতিস্থ ছিল ? ঘর চায় কি বাহির চায়, দূর চায় কি নিকট চায়—একটুখানির জন্যও কি স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে ? যতদিন আখড়ায় ছিল, দৃষ্টি ছুটে গেছে কেন্দুবিল্ব—বৃন্দাবন—মথুরা—দ্বারকাধাম—আরও কত অজ্ঞাত সুদূরে। তারপর প্রায় বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই উজানের টান ; শরীরটাকে নিয়ে এসেছে বটে এই এতটা পথ, কিন্তু, আর সবার কাছে যতই লুকাক, তবে সে নিজে তো জানে মনটা প্রতিমুহূর্তেই কী আতুরভাবেই না ছুটে গেছে পলাশবাটীর সেই দুখানি মৃৎকুটীর লক্ষ্য করে।

তারপর দু'দিকের তীব্র টানে নয়ানের যখন মনে হচ্ছে দুই-ই সত্য, পলাশবাটীর দাবি মিটিয়ে এসে তারপর আবার মুক্ত-তর মন নিয়ে দূরের ডাকে সাড়া দিয়ে বেরুবে একদিন, ভাবছিল গোসাঁইঠাকুরের নাতির কথা, পেয়ারীর কথা, সেই সময় ভূষণ কোথা থেকে উদয় হয়ে সব সমস্যা যেন জল ক'রে দিল।

আবার নূতন ক'রে জাল বুনতে আরম্ভ করেছে নয়ান। বেশ কৌতুক

বোধ হচ্ছে। যতই ভাবছে মনটা রসে যেন ডগমগ হয়ে আসছে। এই মন্দিরতলা; সেটা ছিল রাসের সময়। নয়ানকে তার নূতন জীবনে পদক্ষেপ করতে সাহায্য করেছিল টগর। মন্দিরে যেতে সেই কুটীর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে দাদার পথ আগলে দাঁড়ালো, নয়ানের প্রণাম নেওয়ানো, তারপর পরিচয়টা একবার করিয়ে দিয়ে একেবারেই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ানো।···বেশ কৌতুক লাগে, মন্দিরতলা হয়ে উঠেছে যেন বৃন্দাবন, সেই দূতালি, সেই অভিসার, সেই মিলন। বোধ হয় বৈষ্ণবের মন ব'লেই কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, দেবতায় মানুষে আর যেন প্রভেদ থাকে না, মনে হয় মন্দিরের যুগলমূর্তিই যেন বেরিয়ে এসে রাস-রসে বিভোর হয়ে উঠেছিল সেদিন।

প্রায় তিন বৎসর পরে সেইটেই আবার পুনরনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এবার দূতী সাজবে নয়ান, টগরের সেই রসের ঋণ করবে পরিশোধ। তারপর যে পথ ধরে চলেছিল অনঙ্গ-নয়ান সেই পথ ধরে চলবে ভূষণ আর টগর। চলবে বলাও ঠিক নয়, নয়ান চালিয়ে নিয়ে যাবে। চলায় আছে বিপদ, পথে কোথায় কি অত তো হুঁশ থাকে না। নয়ান চালিয়ে নিয়ে গেলে আর সে ভয় থাকবে না, সে যে নিজে ঐ পথের সব মাটিটুকু মাড়িয়ে মাড়িয়ে এল; জানে তো কোথায় সে পথ পিচ্ছিল, কোথায় তার কণ্টক, কোথায় লুপ্ত খানা-খন্দর।

এটা হোল স্বপ্নের বাইরের রং। বেশ সোনালী; কিন্তু ভেতরটা পূর্ণ করা যায় কি করে?

ত্রিশ

সে-চিন্তাটা পরে, সময়ও নেবে, আপাতত সবচেয়ে যা বড় চিন্তা সেটা হচ্ছে—বিন্দুকে নিয়ে কি করা যায়?

বিন্দু সেই ধরণের স্ত্রীলোক যাদের না হ'লেও চলে না, আবার হ'লেও চলে না। কত দেশ দেখেছে, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অটুট স্বাস্থ্য, অপ্রমেয় কর্মশক্তি, সেবায় অতন্দ্রতা, দক্ষতা—এই সব মিলিয়ে দূরের অভিযানে বিন্দু অপরিহার্য। তার ওপর আছে ওর সুকণ্ঠ, পদাবলী গীতের অফুরন্ত ভাণ্ডার, আর সরস বাকচাতুরী—যার জন্য, বিশেষ করে প্রবাস জীবনে সহচরী হিসাবেও পরম কাম্য। তাই ওকে সঙ্গে নিয়েছিল নয়ান।

নয়তো বিন্দু যে বিষের মতো বর্জনীয় একথাও জানে সে।

ও পলাশবাটীরই মানুষ, আখড়ার সঙ্গেও বহুদিন থেকে সংশ্লিষ্ট, ওর নিজের জীবন সম্বন্ধে একটু কানাঘুষা থাকলেও অন্য বিষয়ে সন্দেহ করবার কখনও কোন হেতু পায় নি নয়ান, অন্তত যতদিন নরহরি ছিল, নয়ানও ছিল পলাশবাটীতে, ততদিন পায়নি। তারপর শ্বশুর-ঘর থেকে ফিরে এসে, বিশেষ করে মৈনের রাজবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর থেকে বিন্দুর এক নূতন রূপ খুলেছে। বিন্দু যেন দূতালিতে নেমেছে একটা।

নয়ান যে অতটা গ্রাহ্য করে নি তার কারণ ওর মনের যেমন গঠন, নিজের কাছে যে-রকম সহজভাবে শক্ত ও, তাতে মৈনের রাজবাড়ির সম্পদ, রাজার উদারতা, পদ্মমণি গাওনা করে কোন্ সোনার মটর-মালাটা পেল—এসব বেশ হালকা কৌতুকেই নিতে পেরেছে ও। আর একটা কারণ, অনঙ্গ ছিল এসব আলোচনা থেকে দূরে।

পলাশবাটী ছেড়ে এই যে কটা দিনের পথ-প্রবাস এতে কিন্তু ঐ ব্যাপারটাই একটু অন্যভাবে দেখা দিয়েছে। ঠিক তাল বুঝে টুপ টুপ করে অনেকগুলা কথা বলল বিন্দু যাতে বেশ বোঝা যায় ও সুযোগ পেয়ে অন্য পথ ধরেছে; ভূষণকে পেয়ে তাকে সুদ্ধ জড়িয়ে ও যেন অনঙ্গর মনের বদ্ধ কপাটে লঘু করাঘাত করতে আরম্ভ করেছে। লক্ষ্মণ তাঁর ভাজের শুধু পায়ের দিকে চেয়ে থাকতেন; বড় ভাই ফেরাতে পারল না ছোটভাই এসেই করে দিলে বাড়ি-মুখো—এ কথাগুলা ভালো লাগে নি নয়ানের। অসংযত ভাবেই চোখ গিয়ে অনঙ্গর মুখের ওপর পড়েছে, দেখেছে তার মুখেও ছায়া পড়েছে।

মথুরা-বৃন্দাবন নাকচ হয়ে গিয়ে বিন্দুর আর কোন কাজ নেই, নয়ান বুঝছে এখন এই অকাজের ফিরিস্তিই দিন দিন বেড়ে যাবে ওর। ভাঙন ধরানোয় নেমেছে, দূতালিতে জোর পাবে বলে।

বিন্দুকে সরিয়ে দিতে হবে।

সরিয়ে দিতে হবে আর একটা কারণে। নয়ানও তো একটা দূতালি নিয়েই চলেছে মন্দিরতলায়; একদিকে ভূষণ, অন্যদিকে টগর; খুবই সঙ্গোপনে, অনঙ্গ পর্যন্ত এখন জানবে না। বিন্দুর চোখ কিন্তু এড়ানো যাবে না, আর বিন্দুর চোখ প্রতিকূলতাই করবে যে এটাও বেশ বোঝে নয়ান, কেননা ও ভূষণকে ষোল আনা এইদিকেই ধরে রাখতে চাইবে নিজের উদ্দেশ্যে।

সরানো যায় কিন্তু কি করে বিন্দুকে? এই চিন্তাটাই আপাতত সবচেয়ে প্রবল হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল নয়ানের মাথার মধ্যে।

একেবারে মন্দিরতলায় গিয়ে ওঠা চলবে না। কারণটা অবশ্য মাত্র এরা তিনজনেই জানল—অনঙ্গ, নয়ান আর ভূষণ; অর্থাৎ শঙ্করী রয়েছে, যদিবা দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়। মন্দিরতলা থেকে আধক্রোশটাক দূরে এদিক পানেই লালন বাবাজীর আখড়া, মন্দিরতলার আওতাতেই পড়ে, সেখানে গিয়েই উঠবে ওরা। কারণ একটা খুঁজে-পেতে নয়ানই বের করল, আর ভালো রকমই। মন্দিরতলায় মন্দিরের প্রায় সংলগ্নই পলাশবাটীর আখড়ার একটা ঘর আছে—যেটাতে সেবারে এসে নয়ানের মা উঠেছিল। তা সেটা এখন নিশ্চয় অন্য কারুর দখলে। এই মেলার বাজারে গিয়েই ওঠানো ঠিকও হবে না, হয়তো একটা হুজ্জুতও হবে। তার চেয়ে লালন বাবাজীর আখড়াতে আস্তানা গেড়ে, ধীরে স্থস্থে উঠে গেলেই হবে। প্রস্তাবটা ক'রে নয়ানই বলল—"না হয় তেমন দেখি তো ওখানেই থেকে গেলুম—পোটাক তো পথ, ওখান থেকে যাওয়া-আসা করা যাবে দিব্যি, কি বলিস গো বিন্দু?"

বিন্দু বলল—"আর ভিড় বাপু ভালোও লাগে না, তুমি নেহাৎ টেনে নিয়ে এলে, তাই···"

প্রসাদ বলল—"তা ভেন্ন কাউকে উচ্ছেদ করে ঘরে ঢোকা—শ্যামসুন্দরের মেলা দেখতে এসেচে···"

লালন বাবাজীর আখড়াই ঠিক হোল, তবে এতবড় একটা সুযোগ, বিন্দু একটু কাজ বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না? বলল—"কুটুম কি বলেন, তাঁর মতটাও জানা দরকার তো একবার।"

নয়ান বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠল—"জিগ্যেস করো না ভূষণ-ঠাকুরপো তোমার দাদাকে, বিন্দী যে কুটুম-কুটুম করে সারা হয়ে গেল!"

হঠাৎ ব্যাপারটা এমন স্পষ্ট হয়ে গেল যে কারুর মুখে কিছুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথাই যেন জোগাল না।

ওরা চলেছে—সামনে প্রসাদ; তার পেছনে অনঙ্গ আর ভূষণ; তারপর বিন্দু আর নয়ান। অন্যান্য বার একটা কড়া কিংবা বাঁকা কথা বেরিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি আবার অন্য কথা বলে সামলে নেয় নয়ান, এবার সে চেষ্টা আর করল না। এই কথাটাই বেশ ঠাট্টা করে বলা যেত, একটু শুধু টোন্‌টা নরম ক'রে দিলেই হোত, তাও করেনি. নিস্তব্ধতাটুকু সবার বুকে যেন চেপে ব'সে

রইল। আজকের পথটি বড় চমৎকার। নবাবী আমলের চওড়া শড়ক, দুদিকে পুরনো পুরনো গাছ, আম, জাম, বট, অশথ, শিরীষ ; ছায়ার মধ্যে একটুও যেন ফাঁক নেই। দুদিকের তপ্ত মাঠ থেকে হাওয়াটা উঠে আসতে আসতেই যাচ্ছে জুড়িয়ে। মনের তাপও ধরে রাখা যায় না এমন পরিবেশে, তবু যেন জোর করেই খানিকটা চুপ করে রইল নয়ান, তারপর হঠাৎ খেয়াল হোল যে ভুল হয়ে যাচ্ছে।

ভুলটা হচ্ছে এই হিসাবে যে, বিন্দুকে কি করে সরাবে যদিও সেটা ঠিক ক'রে উঠতে পারেনি এখনও তবু এটা ঠিক যে মনকষাকষির ওপর মুখ ভার ক'রে সরানো কোন মতেই চলবে না। এমনই সেটা খুব দৃষ্টিকটু তো হবেই, তার চেয়ে যা বড় কথা—অনঙ্গ পড়ে যাচ্ছে এর মধ্যে, বিন্দু যা বলছে, অনঙ্গর হয়েই তো বলছে। নয়ান কথা আবার চালু করবার জন্যই প্রশ্ন করল—"কৈ, উত্তুরটা পেলুম না যে ভূষণ-ঠাকুরপো ?"

ভূষণ অনঙ্গর কাছে কানটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শুনে নিল, ঘাড়টা ঘুরিয়ে প্রসাদের দিকে ইশারা ক'রে একটু হেসেই বলল—"বলছে উত্তরটা দেয় কি ক'রে এখন সন্থ-সন্থ ?"

শ্বশুরবাড়ির সুবাদে বিন্দুকে নিয়ে যে ঠাট্টা করা হোল সেই কথা। নয়ান বলল—"সে উত্তুর যাকে দেওয়ার তাকে দিলেই হবে সময় ক'রে, আমি বলছিলুম লালন বাবাজীর আখড়ার কথা ; একটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে তো।"

অনঙ্গই ঘুরে বলল—"ভালো ব্যবস্থাই তো।···তাহলে কিন্তু এরকম গড়িমসি চালে চললে হবে না, অবিশ্যি যদি সেখানে একটু ঠাঁই পেতে হয়। মেলার অত কাছে, ভর্তি হয়ে যাবে তো আখড়া, হয় তো গেচেই।"

এতগুলো কথা একসঙ্গে এদিকে ক'দিন মুখ দিয়ে বেরই করেনি অনঙ্গ, কোন কারণে ইচ্ছা করেই যে নির্লিপ্ত রয়েছে এটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুযোগটা পেয়ে নয়ান ওকে একটু উৎসাহ দেখিয়েই সমর্থন করল—

"ভাববার কথা তো। তা আমরা কি করব ? পুরুষরা যেমন চালিয়ে নিয়ে যাবে তেমনি চলব তো ?···আমায় আবার এক গদাই-লস্করের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েচে···"

আগেকার কথার জের যার মনে থাকবার থেকেই গেল নিশ্চয়, কিন্তু

স্তব্ধতা ঠেলে কথা আবার চালু হোল। বিন্দু হেসে বলল—"ভাগ্যিস বিন্দী পোড়ারমুখী ছিল, গজেন্দ্র-গামিনীর বলবার রইল একটা।—

চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভারে,
ক্ষণে দোষে ললিতারে ক্ষণে বিশাখারে।

বিন্দী কি চালে সারা ভূ-ভারত এক ক'রে এল না হয় দেখিয়েই দিই একটু।... পা বাড়াও গো পেসাদভাই তোমরা।"

নিজেও হেসে একটু লম্বা ক'রে পা ফেলেছে, নয়ান পথের ধারে একটা মাটি ছাড়া অশথের শেকড়ের ওপর বসে পড়ল, বলল—"তাহলে নয়ান এই রইলেন, আমার দ্বারা আর হবে না।...ও পেসাদকাকা শোন।"

ওরা তিনজনে না দেখেই এগিয়ে পড়েছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল; তারপর প্রসাদ কাঁচু-মাচু হয়ে এমন অপরাধীর মতো এগিয়ে এল যে নয়ান একেবারে খিল খিল ক'রে হেসে উঠে আঁচলে মুখটা চেপে ধরল। সবাই অবাক হয়ে গেছে, বিন্দুই একটু দেখে নিয়ে বলল—"মরণ! এত হাসি কিসের থামকা!"

নয়ান হাসির মধ্যেই তাকে ধমক দিয়ে উঠল—"নাঃ, কাজ কি হেসে।... তিনটে সা-জোয়ান পুরুষ, দুটো মেয়েছেলে—অপদার্থ ই—তা ছুটতে বললে ছুটছে, দাঁড়াতে বললে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ছে—যেন গোরা সেপাইয়ের কুচকাওয়াজ।...শোন পেসাদকাকা, আজ বিন্দীর সঙ্গে লম্বা পা ফেলে এলোধাবাড়ি এগিয়ে গেলেই চলবে না, একটা পরামর্শ করো কি করতে হবে। বোস সবাই, বিন্দুও বোস্।"

অন্যদিনের যা ব্যবস্থা—দুপুরের আগেই কোথাও গিয়ে ওঠে, সমস্তদিন, রাত্রির প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত সেইখানেই কাটায়, তারপর আবার যাত্রা। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত—সম্ভব হ'লে তার আগেই পৌঁছাতে হবে লালন বাবাজীর আখড়ায়, সুতরাং ও ব্যবস্থায় চলবে কেন?...নয়ান আচমকা ব'সে পড়লেও ওরই মধ্যে জায়গাটা দেখে নিয়ে তবে বসেছে। পুরনো গাছ, একটু এগিয়েই রাস্তার ধারে একটা বড় কুয়া রয়েছে, গোটাকয়েক উনুনও খোঁড়া রয়েছে এখানে-ওখানে, জায়গাটা পথিকদের একটা আড্ডা। পরামর্শ হোল—নয়ানেরই পরামর্শ—আজ খাওয়া-দাওয়ার পাট এইখানেই। ইতিমধ্যে প্রসাদ বেরিয়ে গিয়ে কাছাকাছি কোথায় গ্রাম আছে খোঁজ নিয়ে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে আসুক, দুখানা হ'লেই ভালো, আর যদি ছৈ-ওলা পায়। খেয়েদেয়েই ওরা আবার বেরিয়ে পড়বে।

পথটায় লোক চলাচল খুবই কম। ওদের পেছনে খানিকটা দূরে দুজন লোক আসছিল, ওরা থেমে পড়তে তারা অনেকদূর এগিয়ে চলে গেছে। অচেনা জায়গা, কাউকে একটু জিগ্যেস ক'রে নিতে পারলে স্থবিধা হোত। প্রসাদ বেরিয়েই যাচ্ছিল, নয়ানই রুখে দিল। সামনে অনেকদূরে রাস্তার মাঝখানে একটি গেরুয়ার ছোপ, ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে মনে হয় একটু একটু দুলছে—যেন এগিয়ে আসছে এদিকেই। নয়ান বলল, "একটু দাঁড়িয়ে যাও পেসাদকাকা, বোধহয় কোনও বৈরাগী-বাউল, কিছু সন্ধান দিতে পারবে হয়তো।"

প্রসাদ ঘুরে দেখে নিয়ে বলল—"দেরি হবে, ত্যাতক্ষণ নেমে এই আল দিয়ে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারতুম। তা বেশ, যখন বলছিস, আমি না হয় চুলিটে তোয়ের করে ফেলি ত্যাতক্ষণ। দেখি তোর বাউল-বাবাজীর ঝুলিতে কি আছে।"

ঝুলিতে যা ছিল তা একেবার প্রত্যাশার বাইরে। প্রসাদ যতক্ষণে মাটি খুঁড়ে উন্থনটা তোয়ের করেছে ততক্ষণে লোকটি এসে পৌছাল। বাউলই, "জয় গুরু; কমনে থেকে আসা হচ্ছে, যাওয়া হবে কমনে?"—ব'লে একটু দূরে একটা শেকড়ের ওপর বসে পড়ল।

উত্তর দিল প্রসাদই—"জয় গুরু, প্রণাম হই।...আসা হচ্চে অনেক দূর থেকে, যেতে হবে মন্দিরতলা।...তা বাবাজীর ঝুলিতে একটা জিনিস পাওয়া যাবে? মেয়ে বলছিল কিনা—সাধু-ফকিরের ঝুলি, ওতে হ্যান জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না।...একটা সমিস্তেয় পড়েছি কিনা..."

নিজের পদ্ধতিতে রসিকতাটুকু করে একবার সবার মুখের ওপর থেকে হাসি-হাসি দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে এল। বাবাজীও একটু লজ্জিতভাবে হাসল, বলল—"ভিক্ষের ঝুলি বাবা, ওতে আর কি থাকবে? তবু জিনিসটা কি শুনি?"

"দুটো ছৈ-ওলা বলদ গাড়ি।"

ওর সঙ্গে সবার মুখেই একটু হাসি ছলকে উঠল। প্রসাদ প্রশ্ন করল—"যাবে পাওয়া কাছে কোথাও? আজই মন্দিরতলায় গিয়ে পড়তে চাই কিনা। আমাদের তো পা-গাড়ি আছে, বলদগাড়ির বাড়া; কিন্তু দুটি স্থিলোক সঙ্গে যে।"

বাবাজী মনে মনে যেন অনুসন্ধান করছিল, বলল—"এমনি গাড়িই কোথায় যাবা যে ছৈ-ওলার কথা বলচ? কাছেপিঠে গাঁ-ই নেই কিনা, দেখতেই তো

পাচ্ছ। সব চেয়ে নিকট গাঁ হোল বল্লভপুর, এখান থেকে দু'কোশ। অবিশ্যি সেখানে ছৈ-ওলা গাড়ি আচে, কিন্তু সে তো আর পাওয়া যাবে না বাবা।"

প্রসাদ বলল—"আচে অথচ পাওয়া যাবে না, এ কেমন কথা হোল বাবা? তাহলে পেসাদ বুড়োরও তো থেকে না থাকা হোল।"

রসিকতার সঙ্গে বাহাদুরি মিশিয়ে এমনভাবে বলল, বাবাজী ওর দিকে চেয়ে একটু হেসে ফেলল; বলল—"তা তো ঠিক। কিন্তু দুটি গাড়ি, দুটিরই ব্যবস্থা হয়ে গেচে কিনা। গাওনা ছিল পদ্মমণির…"

নয়ান পুঁটলি খুলে রান্নার জন্য চাল-ডাল বের করছিল, একেবারে চকিত হয়ে ঘুরে চাইল, প্রশ্ন করল—"শিউড়ির পদ্মমণি?"

"হ্যাঁ, শিউড়ির পদ্মমণি। তিনদিনের গাওনা, কাল রাত্তিরে শেষ হোল, আজ ওরা যাবে গাঁ ছেড়ে …"

"কখন্ যাবে?…যাবে কোথায়?"

পুঁটলি দুটো একটু ঠেলে রেখে বলল—"পেসাদকাকা তাহলে পথটা জেনে নাও বাবাজীর কাছে—এখানে রান্নাবান্না আর থাক্; চলো।…বিন্দু পুঁটলি দুটো বেঁধে ফ্যাল।"

অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বাবাজী বলল—"গিয়ে তো ফল নেই মা। আমি সেখেন থেকেই আসচি কিনা। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়বার কথা। রান্না প্রায় শেষই হয়ে গেছল দেখে বেরিয়েচি, এখন ওরা মাঝপথে।"

"তাহলে কি হবে? হ্যাঁ পেসাদকাকা, তবু একবার না হয় দেখবে?"

উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই বেশ বিস্মিত হয়ে গেছে; পদ্মমণি একবার মাত্র এসেছিল আখড়ায়, তাও খুব ভিড় তখন।

"দেখবই না হয়।"—ব'লে প্রসাদ অনিশ্চিতভাবে একবার সামনের দিকে চাইল।

বাবাজী বলল—"ওরা এসে এই রাস্তাতেই উঠবে, পো তিনেক গিয়ে এই পথ থেকেই বল্লভপুরের রাস্তাটা বেরিয়ে গেচে কিনা। উঠবে এইতেই, তারপর কিন্তু এগিয়েই যাবে সামনে। ওরাও মন্দিরতলাই যাচ্ছে, গাওনা আচে কিনা সঠিক জানি না, তবে ওখেনেই যাবে শুনলুম।"

নয়ান অনঙ্গর মুখের দিকে চেয়ে বলল—"তাহলে তো আমরা তেমাথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি।"

বাবাজীকে প্রশ্ন করল—"ততক্ষণে কি বেরিয়ে যাবে ?"

ভূষণের দিকে চেয়ে বলল—"তা দূর থেকে দেখতে পেলেও ভূষণ-ঠাকুরপো গিয়ে আটকাবে'খন।...রও, তাহলে আমি কুয়ো থেকে একটু হাত-পা ধুয়ে আসি ভালো করে, আবার কখন ভাল জল পাব একটু।...বিন্দু আয় গো।"

"যাচ্চি, চলো"—ব'লে বিন্দু একটু মুখ টিপে হাসল ; বলল—"একটা ঢপ-উলী বৈ ত নয়,...বুঝিনে বাপু !"

চারজনেই রয়েছে, তার মধ্যে শুধু প্রসাদ আর বাবাজীর মুখের ওপর দিয়ে নজরটা ঘুরিয়ে এনে আবার একটু মুখ টিপে হেসে চ'লে গেল কুয়ার দিকে।

হাত-পা ধুয়ে এসে নয়ান বলল—"ভেবেছিলুম বাবাজীর চালটাও নিয়ে নেব আমাদের সঙ্গে, তা আর হোল কই ? বিন্দু, তাহলে বাবাজীকে একটু সিধে সাজিয়ে দিয়ে দে। ..আর আচেই বা কত ক'টি ? আক্কাড় করে দিয়ে দে চাল-ডাল আলু-পটল যা আচে ; যাচ্চিই তো মন্দিরতলায়, মিছে বোঝা বওয়া কেন আর ?...চিঁড়ে-গুড় তো রইল আমাদের।"

বিন্দু প্রসাদের দিকেই চেয়ে হাসল একটু, তবে অনঙ্গকে লুকিয়ে নয়। বাবাজীর দিকে চেয়ে বলল—"তা কম সুরাহাটা করে দিলেন ? বিদেশ-বিভূঁয়ে আর এর বেশি তো কিছু করতে পারচে না।"

তেমাথায় গিয়ে এদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল। এখানেও একটা ছোট ইঁদারা আছে। চিঁড়ে ভিজিয়ে আহার শেষ করে গল্প করছে, দূরের নীল রেখার মধ্যে থেকে দুখানি গাড়ি একের পর এক বেরিয়ে এল।

একত্রিশ

পদ্মমণির সঙ্গে ভালো ক'রে ব'সে একটু আলাপ সেই একবার পলাশ-বাটীতে, কিন্তু কী যে দেখেছিল ওর মধ্যে, পেয়ে যেন বর্তে গেল। গাড়িটা কাছে এলে ওই খানিকটা এগিয়ে নিয়ে আসতে গিয়েছিল, ছৈ-এর মধ্যে সবার বিমূঢ় ভাব দেখে পদ্মমণির দিকে চেয়ে একটু হেসে প্রশ্ন করল—"কি ভাই, চিনতে পারলেন না ?"

একটু চেয়ে থাকতেই হোল পদ্মমণিকে, তারপর মুখে হাসি ফুটল, বলল—"চেনবার কথা তো লাখের মধ্যে ভাই, কিন্তু এখানে...এভাবে..."

"সেকথা শুনবেন 'খন। আপাতত একটু জায়গা চাই গাড়িতে ; হবে ?"

তেমাথার দিক থেকে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বলল—"একা নয়, পাঁচজন।"

ধোঁকা খেয়ে যাওয়ায় একটু ভুল হয়েই গেছে, পদ্মমণি ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল—"সে কথাও জিগ্যেস করে ? আগে উঠে আসুন তো আপনি।"

ওরাও যাবে মন্দিরতলায়, তবে গাওনার ফরমাস নিয়ে নয়। এত কাছে এসে পড়েছে, বোশেখী পূর্ণিমার মেলাটা সামনেই, তাই একবার ঘুরে আসবার ইচ্ছা। অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। দুটো গাড়িতে জিনিসপত্র নিয়ে একটু চারিয়ে বসেছিল পদ্মমণির দলের ক'জন, তেমাথায় এসে ব্যবস্থাটা পালটে নিতে হোল, মেয়েরা ঝাড়া হাত-পা হয়ে একটা গাড়িতে একত্র হোল, একটা গাড়িতে এরা তিনজন বেটাছেলে মালপত্র নিয়ে উঠল।

চমৎকার কাটল পথটুকু। নয়ানের দিক থেকে ধরতে গেলে অনেকগুলিই কারণ ছিল। প্রথম তো পায়ে হেঁটে চলায় গোড়ায় যে একটা উল্লাস ছিল —কবেকার বিস্মৃত জীবনের খানিকটা ফিরে পাওয়া—অভ্যাস ছেড়ে যাওয়ায়, তার ওপর মনের ঘাত-প্রতিঘাতেও দেহটা ভারী হয়ে আসায় সেটা আসছিল স্তিমিত হয়ে। অথচ তারই ব্যবস্থা, বলার উপায়ও ছিল না। গাড়িটাতে সেদিক দিয়ে বেশ খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেল। দ্বিতীয়ত কাল সন্ধ্যায় ভূষণকে পাওয়ার পর থেকে মনটা আছেও ঢের ভালো, জীবনের দিকচক্রটা নূতন আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, একটু যে ছন্দপতন হয়েছিল— তখন বিন্দু অমনভাবে ঢুকে দেওয়ায়, পদ্মমণিকে পেয়ে সেটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে মিটে গেছে। নয়ানে নয়ান ছিল না, নিশির ডাকে বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে।

পদ্মমণি কোথায় রাখবে, কি করবে যেন ঠাহর করে উঠতে পারছে না। একটি গাড়িতে আটজন মানুষ, গাড়িটা বড় হলেও একটু ঠাসাঠাসিই হয়েছে, পদ্মমণি কিন্তু ওরই মধ্যে জোর করেই নয়ানের জন্যে একটু আলাদা ব্যবস্থা ক'রে দিল। বালিশ দিয়ে এক পাশে একটু বিছানার মতো করে দেওয়ারই যোগাড় করছিল, নয়ান তাড়াতাড়ি বিন্দুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে প'ড়ে সেটা বাতিল ক'রে দিল। এই ছোট্ট হার-জিতটুকুর হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে গল্প আরম্ভ হোল।

কত দিনের জমা গল্প—কোথায় কোথায় ঘুরল পদ্মমণি, কি কি হোল সব।

…তুদিকের মাঠের তপ্ত হাওয়া দীর্ঘায়ত নবাবী শড়কের মধ্যে ঢুকে অনেকখানি স্নিগ্ধ হয়ে ছৈ-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে। গল্প হচ্ছে।…পদ্মমণি বলছে—"আপনার কথাও কিছু শুনি ভাই…নিজের কথাই পাঁচ কাহন করচি যে!" নয়ান এড়িয়ে যাচ্ছে—"সে হবে।" পলাশবাটীকে আসতে দেবে না এখানে। হঠাৎ আনন্দে মনটা নরম হয়ে গিয়ে কী যে হয়েছে, পলাশবাটীর কথা তুলতে গেলেই সব আগে মনে পড়ে যাচ্ছে—সোনা, পেয়ারী, শূন্যঘর, গোঁসাই-দাতু, শূন্য-ঠাকুর-ঘর।…পলাশবাটীকে এনে ফেললে টাল সামলাতে পারবে না নয়ান।…"পলাশবাটী তো পালাচ্চে না, আগে বিন্দুর কাহিনী শুনুন—সারা ভূ-ভারত এক ক'রে এল…লম্বা পা ফেলে…কি লো, বল্ না।" লম্বা পা ফেলার রহস্য ওদের তুজনের কাছেই, তবু কথাটাই এমন, আর এমন হঠাৎ জুড়ে দেওয়া যে সবার মুখেই একটু হাসি ছলকে ওঠে। বিন্দু বলল—"দেখুন নেমকহারামীটা! লম্বা পায়ে মাথা রেখে সেই লম্বা পায়ের ব্যাখ্যানা!" গল্প চলে অফুরন্ত…পান-দোক্তা…মাঝে মাঝে টীকা-মন্তব্যে চাপা হাসির ছলকানি।

দিন পড়ে এল। ঘন পল্লবিত অশত্থগাছের মধ্যে দিয়ে একবার আকাশের দিকে চেয়ে নিয়ে নয়ান বলল—"এবার আমাদের প্রোগ্রাম বদল, গাড়োয়ানকে বলে দিন একটু রাশ টেনে চালাতে, পুরুষেরা এগিয়ে যাক।"

চলতি ইংরাজী কথাটার ওপর জোর দিয়ে স্বরটা গম্ভীর করে নিয়ে বলল, যেন কোন মজলিশের ব্যবস্থাপক নির্দেশ দিচ্ছে। পদ্মমণি বলল—"কেন? বেশ তো চলচে।"

নয়ান সেইরকম গম্ভীরভাবেই সংক্ষেপে বলল—"এবার পদ্মমণির গান।"

প্রথমটা প্রবল আপত্তিই ক'রে উঠল পদ্মমণি—বাঃ, বিন্দুর গল্প এখনও শেষ হোল না, এরপরে আছে নয়ানের নিজের গল্প, সেসব বাদ দিয়ে, কোথাও কিছু নেই, মাঝখান থেকে পদ্মমণির গান! এই নাকি তার সময়? আর এই নাকি গানের আসর?

আপত্তি কিন্তু টেঁকল না, ভেতরে ভেতরে তুর্বলও হয়ে এসেছিল। মুখে যাই বলুক, সময় তো অনুকূলই, প্রিয়-সমাগমের এমন একটি দিন; পরিবেশও এত সুন্দর! তা ভিন্ন এমন সাজানো আসরই কি হঠাৎ পাওয়া যায়? সুর তো বুকে আপনি উঠছে গুঞ্জরিত হয়ে। তবু, মুখের আপত্তি টেঁকল না, একটা হারই তো, মনের ভাবাবেগটুকু একটু তুষ্টুমি দিয়ে ঢেকে দিল পদ্মমণি। মুখে পান-দোক্তা দিয়ে ঠোঁটে একটু হাসি টিপে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেলে চুপ ক'রে

বসে রইল একটু, তারপর একসময় একটু গুছিয়ে ব'সে—"বেশ, যখন ছাড়ান্ নেই"—ব'লে গুন্‌গুনিয়ে আরম্ভ করে দিল—

ধরণী শয়ান করি, আছয়ে সুন্দরী,
সখীগণ মিলল পাশ,
নাহ বিমুখ হেরি, কান্দয়ে ফুকরি,
কহতহি…

"দেখেচ নষ্টামি!"—বলে নয়ান বিন্দুর কোল ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। পদ্মমণিও সঙ্গে সঙ্গে গানটা থামিয়ে চুপ ক'রে গেল, মুখ ভার ক'রে বলল—"তাহলে আমিও এই বন্ধ করলুম। বাঃ!"

গোবিন্দদাসের একটা কলহান্তরিতার বর্ণনা দিয়ে বিরহের পালা শুরু করতে যাচ্ছিল পদ্মমণি নয়ানের সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে দুষ্টুমি ক'রে একেবারে শেষের দিকের কলিটা থেকেই; জানা পদ, সবার মুখেই একটু হাসি ফুটে উঠল। জেদাজেদিতে এবার নয়ানই হার মানল, লজ্জাটা যতটুকু সম্ভব ঢাকবার জন্য বলল—"তাহলে বৃন্দে সখী মাথায় হাত বুলুক, বিরহের চোটে ঘুমিয়ে পড়লে যেন না তোলা হয় সুন্দরীকে।"

পদ্মমণি শিউরে উঠে বলল—"বাপরে, তা কখনো পারি! রাই-রাণীর ঘুম, তার ওপর কলহ করে মেজাজ বিগড়ে রয়েচে।…গান পর্যন্ত থামিয়ে দোব'খন।"

নয়ান হেসে বলল—"তাহলে কিন্তু ঘুম ভেঙে যাবে রাণীর।"

একটা যে আনন্দের জোয়ার এসেছে, যেখানেই একটু অবসর পাচ্ছে, পথ করে নিয়ে কুলকুলিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে। শুয়ে পড়ল নয়ান, বসে থাকলেও তো সেই একই কথা।

লঘু কৌতুকের মধ্যে দিয়েই আরম্ভ হলেও আস্তে আস্তে গান জমে উঠল। সুরটা চাপাই আর চাপা বলেই রুদ্ধ আবেগটা যেন ফেনিয়ে উঠতে লাগল। একটানা বিরহের সুর চলেছে ব'য়ে—কলহান্তরিতার মান, তার মধ্যেই আবার রয়েছে অনুশোচনার আকূতি—সখি, আমার মান—

সো অব কাল অনল সম হোয়,
দগধই নীরস দারু হিয়া মোয়…

ওদিকে বিরহকাতর শ্যাম…'যোড়ি যুগল কর' সখিকে বলছেন, আমার—

চন্দন চান্দ পবন ভেল রিপুসম,
বৃন্দাবন বন ভেল্ল…

জমে উঠেছে পালা—সুরের ওপর সুর পড়ছে ভেঙে, আখরের গায়ে আখর পড়ছে লুটিয়ে। ঐ একটি কণ্ঠের ধ্বনি ছাড়া আর সব স্তব্ধ।···আকাশ মলিন হয়ে এল—একটি মৌন বিষণ্ণতা ধীরে ধীরে চারিদিক থেকে আসছে নেমে, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে, আর যেন সয় না।···সন্ধ্যা নেমে পড়তে দুধারের ঘনপল্লবিত গাছগুলা একাকার হয়ে গিয়ে শুধু একটা জমাট অন্ধকার যেন মাথার ওপর রইল দাঁড়িয়ে; ছৈ-এর ভেতর আর কারুর মুখ ভালো দেখা যায় না; · অন্ধকারের কান্নার মতো শুধু পদ্মমণির সুর যাচ্ছে শোনা, বিরহিণী রাধার দশমী-দশার একটা কলি—সখিরা বলছে—রাই—

বিরহ অনলে যদি দেহ খোয়ায়বি
খোয়ায়বি আপন পরাণ···
তাহলে— তুয়া সহচরী যত, কোই না জীয়ব,
সবহু করবি সমাধান···

আখরে-আখরে নিঙড়ে নিঙড়ে সুরের অশ্রু ঝরিয়ে পদ্মমণি এবার সান্ত্বনার ভাষা ধরল—রাই, ধৈর্যং কুরু ধৈর্যং, সম গচ্ছং মথুরায়ে···

এক সুর থেকে আর এক সুরে যে মোড় ঘুরে গেল তাইতে একটু যেন সম্বিত এল সবার।

নয়ান সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি!! মুখ দেখা যায় না একেবারেই; আস্তে আস্তে চোখের ওপর হাত বুলাতে গিয়েই বিন্দু একেবারে চমকে বলে উঠল —"এ কি!"

অশ্রু নয়ানের দুটি চোখ ছাপিয়ে উঠে দুটি গাল একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছে। চোখে আঙুল পড়তেই নয়ান দিয়েছে টিপে, ঐটুকু মুখ দিয়ে বের করেই বিন্দু থেমে গেল।

পদ্মমণি জিগ্যেস করল—"কি হোল?"

বিন্দু বলল—"যা বলেছিলেন রাই; ঘুমিয়ে পড়েচেন, আপনি কিন্তু চালিয়ে যান, যদি বা ভেঙে যায় ঘুম···" শেষেরটুকু একটু রহস্য করেই ব'লে আঁচল দিয়ে আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিতে লাগল চোখ।

গান কিন্তু আর এগুল না; লালন বাবাজীর আখড়া এসে গেল।

খুব গভীর রাত্রে, বোধহয় এই ক'টা দিনের অভ্যাসেই নয়ানের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল।

ভেঙে যেতেই আর সব বাদ দিয়ে আজ সন্ধ্যায় পদ্মমণির গাওয়া—সেই শেষ কলিটুকু মন্দিরার বোলের মতো মনের কোথায় রুণ-রুণ করে উঠল—'রাই, ধৈর্যং কুরু ধৈর্যং ।' আচ্ছন্ন হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল নয়ান। মাথুরের ঐ কলিটুকু কানে নিয়ে সেই যে আখড়ায় প্রবেশ করেছিল, কোন মতেই যেন ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। নিদ্রাতেও নয়।

এখন রাত্রির স্তব্ধতায়, সবার সঙ্গ পেয়েও এই নিঃসঙ্গতায় এই একটি কলির চারিদিকে কত কথা আবর্তিত হচ্ছে তার যেন হিসাব নেই ; কে যেন নিরন্তর এক ক্রন্দনের স্বরে আখরের পর আখর যাচ্ছে লাগিয়ে।···চিত্তের নিরুপায় অস্থিরতায় নয়ান একসময় আটচালার ধারটিতে গিয়ে চুপ করে আলাদা হয়ে বসল।

দূতী চলল এবার মথুরায়, রাই একটু ধৈর্য ধরে থাক ব'সে।···কিন্তু নয়ান জানে মিলন আর হওয়ার নয়। বেশ বুঝতে পারছে কত যাত্রা-অভিনয়ে দেখা সেই নিষ্ঠুর, দুর্বার নিয়তি অলক্ষ্যে দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিন-দিনই ব্যবধান ক'রে তুলছে অলংঘ্য। কত ভুল হয়ে যাচ্ছে পদে পদে ; শুধু ভুল কেন, জ্ঞানতও কত কী যে হয়ে যাচ্ছে—কেন হচ্ছে, কি ক'রে হচ্ছে বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। অথচ অনিবার্যভাবেই যাচ্ছে হয়ে।·· বিন্দুকে কেন সঙ্গে নিল, অত জেনেও ওকে?···আবার এই ভূষণ কেন পড়ল এসে?··· নয়ান তো ফিরছিলই, মাঝখান থেকে উপলক্ষ্যটা দাঁড়াল ভূষণ! · নয়ান স্পষ্ট শুনছে যেন যাত্রার নিয়তির তর্জনী তুলে সেই অট্টহাস্য। ··এক-একবার আইঢাই করে উঠছে মনটা। মেয়েরা এরা সব শুয়ে আছে আটচালার পোতাটায় ; নিচে খানিকটা দূরে নিমগাছের তলায় একটা চত্বর, তার ওপর শুয়ে আছে অনঙ্গ। এরা যখন রাত্রের ব্যবস্থা করায় ব্যস্ত ও তখন কি মনে হতে বাঁশি নিয়ে বহুদূরে কোথায় গিয়েছিল চলে—ভূষণকে সঙ্গে নিয়ে নয়, অথচ, ভূষণ কাছে থাকলে যা হয় না—বহুদূরে কোথায় বাজানো সেই বাঁশির কান্না শুনেছিল নয়ান ; ঘুমন্ত অনঙ্গর বুকের কাছে রয়েছে বাঁশিটা প'ড়ে।

এইটুকু তো ব্যবধান, আইঢাই করে উঠছে বুকটা। ইচ্ছা হচ্ছে যাই নেমে, পথশ্রান্তিতে গভীর সুপ্তিমগ্ন সবাই, আস্তে আস্তে মাথায় হাত দিয়ে তুলি,—বলি—"চলো গোসাঁই, বাঁশিটা তুলে নাও, কোন্ সুদূর চাও তুমি, সেইখানে, সবার থেকে আলাদা হয়ে বসি দুজনে, জানাই তোমায় আমার মর্মের কথা, তুমিও বাঁশিতে তোমার বেদনা দাও ঢেলে ; চোখের জলে আবার

দুজনে দুজনকে নিই চিনে।… কেন, আরও চলো না সুদূরেরও ওদিকে, সব ছেড়ে, সবার থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে—শুধু তুমি-আমি আর তোমার বাঁশি।

কতটুকুই বা, নেমে গেলেই হোল; মাত্র কয়েক পা। কিন্তু হবার নয়।

এই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার আড়ালে, তার কুটিল হাসি ঠোঁটে নিয়ে নিয়তি রয়েছে লুকিয়ে, নয়ান স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।…যত হালকা পায়েই না গিয়ে দাঁড়াক ওখানে, আগে জেগে উঠবে ভূষণ—

"বৌদি নাকি? ঘুমোও নি?"

অনঙ্গ জেগে উঠে কিছুই না বুঝে ফ্যালফ্যাল ক'রে থাকবে চেয়ে, তারপর সব বুঝে · সব উল্টো বুঝে বলবে—"বৌ!…হঠাৎ এখানে যে?"

সাজিয়ে রেখেছে যাত্রার নিয়তি; আগে শুয়ে ভূষণ, ওদিকে প্রসাদ, মাঝখানে অনঙ্গ।…

ক্লান্তিও এসেছে। সামনেই মন্দিরতলা, খোলা মাঠের ওদিকে তার গাছপালার আবছায়া যাচ্ছে দেখা। ঐ মন্দিরতলার ওদিক'কার মুক্ত জীবনের সেই শেষ দিনটির কথা মনে পড়ছে। এই জ্যোৎস্নার মতো মুক্ত, অথচ এই জ্যোৎস্নার মতো সব কিছুকেই বুকে-করা সে জীবন।…ক্লান্তি আসছে; অপরিসীম ক্লান্তি।…আর কেন? কেন এই দ্বিধা, ভয়, সংশয় বুকে ক'রে পথ চলা? কিসের আশাতেই বা এই অনন্ত ধৈর্য বুকে ক'রে দিন গুণতে থাকা আর?

বত্রিশ

লালন বাবাজীর আখড়া বলতে শুধু একটা টানা আটচালা, সেটাকে ঘিরে কিছু কিছু গাছ, একদিকে একটা পাতকুয়া।

লালন বাবাজী ছিলেন বাউল সম্প্রদায়ের একেবারেই মুক্ত পুরুষ একজন। তাঁর কোন বন্ধন ছিল না, সঞ্চয় ছিল না; যেমন পর ছিল না তেমনি আপনও ছিল না কেউ। মরবার সময় আখড়ায় কাউকে বসিয়ে যান নি, শুধু বলে গিয়েছিলেন আখড়ায় কোন ঘর উঠবে না, আটচালার কোনদিকে বেড়া পড়বে না, পথিক আসবে, থাকবে, চলে যাবে। কারুর নয় বলে সবারই,

গ্রাম থেকে মেয়েরা এসে পথচারীর জন্যে নিকিয়ে-পুতিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে; লালন বাবাজীর আশীর্বাদ নিয়ে যায়।

এখন মন্দিরতলার টান, আখড়ায় কোন লোক ছিল না। আটচালাটা বেশ বড়, বেশ হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যাবে। মেলা ভাঙতে ভাঙতে পূর্ণিমার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে পর্যন্ত থেকে যায়; নয়ানের যে রকম ব্যবস্থা, মনে হয় শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়ারই ইচ্ছা; পদ্মমণিকেও জপাচ্ছে।

অবশ্য যদি দরকার হয় শেষ পর্যন্ত থাকা, যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা তার গোড়াপত্তন যদি করতে পারে। দুটো চিন্তা সমান্তরালে চলছে ওর মনে; কি ক'রে করবে সেটা, তারই পাশে পাশে, বিন্দুকে কি করে সরাবে। পদ্মমণি আসার পর থেকে বিন্দুর জিভ যেন আরও শাণিত হয়ে উঠেছে। ভূষণকেও অনঙ্গর প্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে তুলে ধরবার চেষ্টা করছে, এক উদ্দেশ্যে, ওর দূতালির পথ পরিষ্কার করবার জন্যে; পদ্মমণি কিন্তু ওর নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এসে উঠল, নয়ানের কাছে বিন্দুর প্রয়োজন কমবে, খাতির কমবে। বরদাস্ত করতে পারছে না ওকে।

দুটো চিন্তার মধ্যে বিন্দুকে সরানোর চিন্তাটাই বেশি প্রবল। ভূষণ-টগর নিয়ে ওর মনে যে পরিকল্পনা সেটাকে রূপ দিতে হলে পদ্মমণির সঙ্গে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে পরামর্শ করা দরকার, বিন্দু থাকলে যা একেবারেই অসম্ভব। ঠিক যেমন ওকে সরানোও অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। খুবই অশান্তিতে আছে নয়ান, তারপর হঠাৎ অদ্ভুত উপায়ে একটা সুরাহা হয়ে গেল। সুরাহাটাও অদ্ভুত।

বিকাল হয়ে এসেছে। দিবানিদ্রা সেরে মেয়েদের সবাই নিমগাছের তলায় চাতালটাতে ব'সে গল্পগুজব করছিল। প্রসাধনের কাজও একটু-আধটু হচ্ছে। পদ্মমণি তার স্টাইলটা একেবারে বাদ দেয় নি, একজন সঙ্গিনী তার চুলের গোছাটা হাতে ক'রে বসেছে। পানের বাটা রয়েছেই সামনে। বিন্দু একটা কিছু ভেবেই নয়ানের চুলটা নিয়ে বসবার জন্যে জিদ ধরেছিল, নয়ান রাজী হয় নি। পদ্মমণিও একটা কিছু যেন ভেবে নিয়ে মুখটিপে একটু হেসেছিল। তারপর আবার গল্পগুজব চলছে, মন্দিরতলায় সবাই যাবে সন্ধ্যা নামলে।

বেটাছেলেরা গেছে মন্দিরতলায়। অনঙ্গ সকালেও একবার গিয়েছিল, টগরের খোঁজে, কোনও সন্ধান পায় নি। দুপুরে তিনজনেই গেছে, অবশ্য

আলাদা হয়ে, প্রসাদ আর ভূষণ একসঙ্গে, অনঙ্গ একা। টগর যদি থেকেই গিয়ে থাকে (পূর্ণিমাটা কাটিয়ে যাওয়াই সম্ভব), তো ভূষণকে সঙ্গে দেখলে সুবিধা হবে না মোটেই; সঙ্গে শঙ্করী রয়েছে। ছেলেকে দেখেও যে শঙ্করী গলে গড়বে তার সম্ভাবনা অবশ্য কিছুমাত্র নেই, বরং উল্টোটাই সম্ভব, হয়তো মেলার মাঝখানে একটা বিপর্যয় কাণ্ডই করে বসতে পারে। সেটাও সামলে নেওয়া যায়; সঙ্গে ভূষণ থাকলে কিন্তু আর কোন উপায়ই থাকবে না।

গল্প-গুজবে দিন আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। পদ্মমণির চুলের পাট সারা হয়ে গেছে। নয়ান পাশেই বসেছিল, পদ্মমণি একটু হাসিমুখ ক'রে কেউ কিছু বোঝবার আগেই একটু সরে গিয়ে তার পিছনটিতে বসল, সঙ্গে সঙ্গেই খোঁপার বেণীতে হাত রেখে বলল—"বিন্দু-ঠাকরুণকে দিলে না, আমি কিন্তু শুনব না ভাই।" মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ওজর করতেই যাচ্ছিল নয়ান পদ্মমণি তার আগেই বেণীটা খুলে নিয়েছে, বলল—"মানছে কে ওজর আপত্তি?—মন্দিরতলায় পূর্ণিমা, সে না হয় ছিল রাস-পূর্ণিমা, এ না হয় বোশেখী-পূর্ণিমা··"

কথাটা ধক্ করে নয়ানের বুকে লেগে মুখের দীপ্তিটা দিল নিভিয়ে; একটা মুহূর্ত, তখনই সামলে নিয়ে হেসে বলল—"বেঁধে মারে সয় ভালো, কি আর করচি?"

পদ্মমণি বেণীটা খুলে চুলের গোছাগুলা এলিয়ে এলিয়ে নিচ্ছে, দেখা গেল মন্দিরতলার রাস্তা দিয়ে অনঙ্গ একটু যেন হন্তদন্ত হয়েই চলে আসছে।

পদ্মমণিরই দলের একজন হেসে বলল—"মা-মণির হাতের পয় আছে।"

পদ্মমণি সামনে দেখে নিয়ে যেন বিব্রত হয়েই বলল—"এত পয় থাকলে চলবে কি ক'রে? খোঁপাটা বাঁধাই হোক আগে!"

একটু চাপা হাসি উঠল।

এর মধ্যে অনঙ্গ রাস্তা ছেড়ে আখড়ায় ঢুকে পড়েছে, দূর থেকেই বলল—"ওরে সুখবর! টগীকে দেখলুম, কথাও হোল···"

বলতে বলতেই এগিয়ে এল, মুখটা উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পদ্মমণি চুলের গোছাটা ছেড়ে মাথার কাপড়টা তুলে দিয়েছে, অনঙ্গকে এদিকেই আসতে দেখে উঠে পড়ল; দলের সবাইও উঠল।

অনঙ্গ খুবই অন্যমনস্ক, নইলে বোধ হয় অপেক্ষা করত; ওরা ওঠবার এক-রকম আগেই চাতালটার এককোণে ব'সে পড়ল।

ইতিমধ্যে একটু ব্যাপার হয়ে গেল। ওঠবার মুখে সোনার চেনে লটকানো একটি বেশ বড়ো পান্না বসানো সোনার লকেট একটু ছিটকেই কাপড়ের বাইরে বেরিয়ে এল। কতকটা যেন বিব্রত হয়েই পদ্মমণি সামলে নিয়ে নেমে গেল।

ব্যাপারটা সামান্যই। হ'তে পারে, পদ্মমণির গয়না দেখানোর অভ্যাস, ওদের শ্রেণীর মেয়েদের যেমন একটু বেশি করেই থাকে; আকস্মিকও হ'তে পারে; কিন্তু বিন্দু আর সামান্য থাকতে দিল না। মোটা মানুষ উঠতে একটু দেরি হয়ই, সেটুকুর সুযোগ নিয়ে হাতে ভর দিয়ে গা দুলিয়ে উঠতে উঠতে একটু থেমে গেল, ঠোঁটের কোণ টিপে বলল—"এটা এবার কুমার বাহাদুরের কাছে পেলে, তিথি থেকে ফিরে আসতে। কী খাতির মাগীর। সে কুটুমও তো জানেন।"

আস্তে আস্তে নেমে চলে গেল।

কালকের কথাটার সঙ্গে বেশ একটি মিল আছে—"একটা ঢপউলী বৈ ত নয়···বুঝিনে বাপু!"

আবার একটু অন্যমনস্কতা এসে গেছে অনঙ্গর; নয়ানই সেটা ভাঙল, প্রশ্ন করল—"তারপর,—কি কথা হোল? আচে কেমন?"

ভালোই আছে টগর। আর একটা সুখবর, শঙ্করী নেই সঙ্গে। অনঙ্গ মেলার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ খানিকটা দূর থেকে দেখতে পেল টগরকে, সঙ্গে রাঙাখুড়ী, ঘোষালগিন্নী আর দুলে-বৌ। টগর দেখতে পায় নি, মুখটা একটু পাশে ঘোরানো ছিল। অনঙ্গ একটু ঘুরে আড়াল হ'য়ে অনেকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর চোখোচোখি হয়ে যেতেই টগর চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই অনঙ্গ আঙুলের ইশারা করে দিয়ে স'রে পড়েছে খানিকটা পাশে। "কি হোল?" বলে এরা তিনজনে ঘুরে চাইতেই সামলে নিল টগর, সামনেই একটা নাগরদোলা, বলল—"মনে হোল একটা বুঝি ছিঁড়ে পড়বে!"

তারপর ওরা ঘুরে বেড়াতে লাগল, অনঙ্গও বেশ খানিকটা দূরে দূরে থেকে সুযোগ খুঁজতে লাগল। এক সময় ওরা একটা বাজীকরের তাঁবুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হোল; গলা-কাটা, হাত-পা কাটা মানুষ কথা কইছে, এইরকম একটা কারচুপি দেখাচ্ছে ওরা। ঘোষালগিন্নী এগিয়ে দরদস্তুর করল খানিকটা, ঠিক হোল, কিন্তু টগর কোন মতেই ভেতরে যেতে চাইল না—ভয়ঙ্কর ভয় করে ওর,

ভির্মি গিয়ে একটা কাণ্ড বাধাবে শেষকালে? ওরা ওকে চুপ করে একটু দোর ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ভেতরে চলে গেল। প্রায় পনের কুড়ি মিনিট সময় পাওয়া যায়, একটু থেমে গিয়ে অনঙ্গ ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শঙ্করী এসেছিল; আজ দুলে-বৌ গাঁ থেকে এসে খবর দিল, ভিখারীর শরীরটা একটু খারাপ, দিন চারেক হয়েও গেল, ডেকে পাঠিয়েছে। শঙ্করী সকালেই চলে গেছে, টগরকেও নিয়ে যেত, টগর ঘোষালগিন্নীকে ধরে থেকে গেছে, আজ নেহাৎ পূর্ণিমা। জিরেনের পাঁচুর-মা এবার মেলায় একটা মাঝারি গোছের চালা নিয়ে বেগুনি-ফুলুরি-পাঁপর-আলুর চপের দোকান করেছে। তাইতে জিরেন আর পাশের গ্রামের কয়েকজন থাকে; আসছে যাচ্ছে, মাথা পিছু কিছু করে নিচ্ছে পাঁচুর মা, ভাড়াটা উঠে যাচ্ছে। অনঙ্গ এদিককার খানিক-খানিক বলল টগরকে, আজ এই পর্যন্তই হয়েছে। সন্ধ্যার পর দেখা করবার জন্য একটা জায়গা ঠিকও করেছে অনঙ্গ—দোকানটার পাশেই, ওরা সবাই যখন আরতি দেখতে চলে যাবে, টগর মাথা-ব্যথার নাম করে থেকেই যাবে।

খবর এই। অনঙ্গ বলল—"তোকে দেখবার জন্যে টগী একেবারে ছটফট করচে—একবারটি কোনরকমে দেখাও দাদা বৌকে।...যাবি আমার সঙ্গে, এদের সবাইকে আরতির কাছে দাঁড় করিয়ে? বললেই হবে গাঁয়ের একজনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, তার সঙ্গে গল্প করছিলাম।"

নয়ান ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বলল—"প্রথম দিনটা অত সাহস করা ঠিক হবে না। দুজনের একজনও যদি চোখে প'ড়ে যাই..."

মনটা খুব ভাল আছে। আস্তেই কথা হচ্ছিল, আর একটু গলাটা খাটো করে নিয়ে অনেকদিন পরে একটা রসিকতাও করল অনঙ্গ, বলল—"হ্যাঁ, আমি কালো মানুষ, সন্ধ্যেয় অনেকটা ঢাকা প'ড়ে যাব, তুই তো জোচ্ছনায় আরও বরং..."

নয়ান একটু হেসে বলল—"হয়েচে।...তুমি বরং এক কাজ করো, যাতে ওরা থেকে যায়—অন্তত কাল পর্যন্ত, তার ব্যবস্থা করো একটু।"

অনঙ্গ বলল—"কি করে?"

নয়ান বলল—"বাবাঃ বাবা! বোন, তাকে একটা দিন কি ক'রে আটকাবে তাও আমায়ই ব'লে দিতে হবে!...আচ্ছা দাঁড়াও।"

একটু ভাবল, তারপর বলল—"এক কাজ করো, বোলো, ওদের যেন বলে—

শিউড়ির পদ্মমণি একটা গাওনা দেবে কাল, আরতির পর। ঘোষালগিন্নী হুজুগে আছে।"

"পদ্মমণি রাজী হবে? বায়না তো নেই।"

"সে আমি বুঝব।...বলব—একজন বড় বায়না ধরেচে, তাইতেই হবে।"

অনঙ্গ চোখের কোণে হাসল একটু। বলল—"নিজের পায়ে মার্ কুড়ুল, আমার কি? বদনাম আচেই, তার ওপর আবার মন্দিরতলা..."

নয়ান বলল—"সরো এবার, একটু বরং ওদিক পানে যাও। ওরা আজ আমার চুল বাঁধবে ব'লে জিদ ধরেচে..."

একটু চোখ তুলে চাইল অনঙ্গর দিকে। তারপর আবার অল্প বিরতি দিয়ে বলল—"তোয়াজ করি একটু। কাজ আদায় করতে হবে তো।"

দিনটা ভালো যাচ্ছে, ভালো দিনে মাথাও বেশ খোলে। বিন্দুকে সরাবার মন্ত্র পেয়ে গেছে নয়ান। পেয়েছে একটু আগে ওর কথা থেকেই, ওর কুটিল টিপ্পনিটাকেই কাজে লাগাবে। শয়তানীর কাছে বড় তা-বড় শয়তানী সেজে না দাঁড়ালে তো কাজ হাসিল হবে না। খুবই বিপজ্জনক; খুবই। কিন্তু সামলে নেবে নয়ান, আত্মবিশ্বাস আছে, এমন একটা দিনে বাড়েই আরও, তা ভিন্ন তার মনে রয়েছে শুচিতা, শ্যামরায়ের কাছে রয়েছে একটা জোর, একটা ভরসা; সেই মন্দিরতলাই তো।

আর নিজের কথা অত বেশি ক'রে ভাবাও যায় না, যে কাজ করতে এসেছে—তার এদিককার জীবনের শেষ কাজ—সেটা সমাধা করতে হবে তো; এই তো তার শেষ সুযোগ।

ঠিক করে ফেলেছে নয়ান; বিন্দু মনে করুক তার দূতালি সার্থক হোল এতদিনে। আর এমন কিছুই নেই যাতে বিন্দুকে এ আসর থেকে সরানো যায়। এমন অব্যর্থও কিছু নেই।

সেদিন মন্দিরতলায় যাওয়ার পথে নয়ান আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে এমনি যেন বিন্দুর সঙ্গে আলাদা হয়ে গেল। বিন্দুকে বার দুই টিপেও দিয়ে দূরত্বটা বাড়িয়ে নিল। পদ্মমণি একবার টুকলও। নয়ান বলল—"কি করব, গদাইলস্করী চাল, একজন তো সঙ্গে থাকাই চাই; নইলে বলবে—দেখেচ, নতুন মানুষ পেয়ে পুরনোকে ভুলল।...একে নিয়েই তো ঘর করতে হবে।"

দূরত্বটা আরও একটু বাড়িয়ে বলল—"বিন্দী, একটা কথা বলব; অবিশ্যি শুনলেই বুঝতে পারবি খুব লুকুনো…"

বিন্দু কান খাড়া করে ফিরে চাইল—

"কি কথা?"

নয়ান একটু আত্মীয়তা দেখিয়েই আরম্ভ করল—"জানিস না বোধ হয় টগর ঠাকুরঝি এসেচে, তোদের কুটুমের বোন। বলেচি তোর কাছে আগে—ও তখন সেই কথাই বলছিল।"

বিন্দু বলল—"সত্যি নাকি? তা আসবে ভাইয়ের কাছে? বেশ হয় তাহলে, জমে যায় বেশ।"

"সে পরের কথা। আসবেই। এখন মা রয়েচে সঙ্গে, তাকে বলবে তো; ওর সঙ্গে দেখা হয় নি এখনও।…সে কথা হচ্চে না। আমার কি মনে হচ্চে জানিস?—ঐ তুই যা জমে যাওয়ার কথা বলছিলি। সত্যি এখন সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া, এমন একটা জায়গায়—যাদের কাছে চাই, ভালোবেসেচি, কি, উপকার পেয়েচি…তাই মনটা খুঁতখুঁত করছিল—সবাই তো এল, শুধু একটি মানুষ…"

চুপ করল একটু। বিন্দু সমস্ত চৈতন্য কানে জড়ো ক'রে যেন কাঠ হয়ে চলছে।

নয়ান আবার আরম্ভ করল—"বুঝেচিস কি বুঝিস নি বলতে পারি না, না হয় পষ্ট করেই বলি, তোর কাছে তো কিছু লুকুই না ··কুমারবাহাদুরের কথা বলচি—যদি আসতেন…"

বিন্দু দাঁড়িয়ে পড়ে মুখের দিকে চাইল। নয়ান একটু ঠেলা দিয়ে বলল—"চল, ভাববে, কী-না-কি-এমন কথা হচ্চে।…রাজী হবেন?"

"ওমা! হবেন না আবার? কথায় বলে…"

নয়ান বলল—"তাহলে আর একটা কি কাজ হয় জানিস?—তাহলে পদ্মমণিকে দিয়ে দু'রাত গাওনা করানো যায়। আমাদের কথায় হয়তো গুঁইগাঁই ক'রে হতে পারে একটা রাতের জন্যে রাজী; কিন্তু সে খাতিরের ব্যাপার জমবেও না, আরও উচিত হয় না আমাদের,—একে তো ক্ষতি করে আটকে রাখলুম।…কি বলিস?"

খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে বিন্দু। মেঘ না চাইতে জল! একটু যেন চমকে উঠেই বলল—"অ্যাঁ?…ও, হ্যাঁ, তা বৈকি।"

"তাহলে তোকে এটা হাতে নিতে হয়। যেতে হয় তোকে। এ তো পেসাদকাকাকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কাজ নয়। কারুর জানলে তো চলবে না। যাবি ?"

বিন্দু বলল—"ওমা, যাব না ? একটা ভালো কাজ ! মন্দিরতলা থেকেই বেরিয়ে যাব ?"

"অত তাড়াতাড়ি ঠিক হবে না। সন্দেহ করবার লোক আচে তো। একটা ছুতো খোঁজ, আমিও ভাবচি, তারপর কাল বিকেল পজ্জন্ত বেরিয়ে পড়। আমি ভাড়াটা দিয়ে দোব, খানিক গিয়ে একটা গাড়ি ক'রে নিস্, আজকাল অনেক যাওয়া-আসা করচে। একটানা চলে যাবি।···ঠিক তো ?"

"কাল সকালেই বেরিয়ে পড়লেও তো হয়।"

"হয় না এমন নয়, বরং আরও ভালোই হয়। শুধু একটা ভালো ছুতো হওয়া দরকার, ভাবচি তো দুজনে। কথাটা হচ্চে—তুই যেন নিজের একটা কাজে যাচ্চিস, আর কুমারবাহাদুর যেন আপনা হতেই পড়লেন এসে। নয় কি ?"

বিন্দু বলল—"অনেক ছুতো আচে আমার হাতে, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ি।"

"বরং এক কাজও কর এই সঙ্গে। ফিরতি পথে একবার আখড়াটা অমনি দেখে আসবি।"

এতবড় সার্থকতা, একটু সরসও করে দিল শেষদিকে—"আর নিকুঞ্জ-বাবাজীও তো ঝুরে মরচে ওদিকে।"

সামনে চেয়ে গলা তুলে ওদের বলল—"তা বলে আমাদের এতো পেছনে ফেলে গেলে চলবে কেন ? বাঃ !"

তেত্রিশ

সেই রাত্রেই অনঙ্গর সঙ্গে গিয়ে টগরের সঙ্গে দেখা করল নয়ান।

মনটা ছটফট করছে, এত সুবিধা পেয়েও আবার একটা দিন যদি অপেক্ষা করতে হয় তাহলে বাঁচবে না। এদের কাছ থেকে যে লুকিয়ে গেল এমনও নয়। মৈনেয় যাওয়া নিয়ে কথাটা ঠিক হয়ে যেতে বিন্দুর কাছ থেকে লুকোবার আর কোন প্রয়োজন রইল না। বরং কথাটা বললে যেন আরও একটু আপন

ক'রে নেওয়াই হয়। বললেও সেইরকম আত্মীয়তা দেখিয়েই, খানিকটা ভেতরের কথা পর্যন্ত ব'লে একটু সহানুভূতি জাগিয়ে—"জানিসই তো বিন্দু, মায়ে-বেটায় তেমন বনিবনাও নেই এদের, ছেলের কাছে দেওর-ঝিকে শাশুড়ী আসতে দেবে কি দেবে না কে বলতে পারে? দেখেই আসি একবারটি। অবিশ্যি এ ঘরের কথাটা পদ্মমণি জানবে না, কিন্তু তুই তো আর পর নয়।"

পদ্মমণির কাছে লুকোলে চলবে না; ওকে তো অনেক কথাই বলতে হবে এরপর, ওকে দিয়ে তো অনেক কাজ নিতে হবে এ ব্যাপারে, ওর কাছ থেকে বুদ্ধিও নিতে হবে অনেক। বলল—"তখন এসে ননদের কথা বলছিল। এসেচে, এসে নাকি একটু অসুখে পড়ে গেচে। একটু দেখে আসি, কি বলুন? আপনার আরতি দেখতে দেখতে ফিরে আসব।"

মন্দিরতলার পূর্ণিমার সে ইতিহাস কতকটা তো জানেই পদ্মমণি, যা থেকে অত ঘটা করে খোঁপা বেঁধে দেওয়া, নয়ানের কথাটাকে আধা-সত্য আধা-মিথ্যার মতো ক'রে ধরে নিয়ে একটু হেসে বলল—"না হয়—দেরিই হোল খানিকটা, তাতে হয়েচে কি?"

দু'বৎসর পরে ননদ-ভাজে আবার দেখা হলো। নয়ান অনঙ্গকে সরিয়ে দিল। বলল—"দু'বছর পরে দেখা, আমাদের এখন অনেক কথা, এদিকে সময় তো আরতি পজ্জন্ত, এতে আর দাদার ভাগ বসালে চলবে না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, সেখানেই থেকো, আমি ঠিক সময়েই চলে আসব।"

অনঙ্গ সরে যেতে প্রথমে দুজনে গলা জড়াজড়ি ক'রে কেঁদে নিয়ে দু'বছরের জমা চোখের জল নামিয়ে দিল খানিকটা। দোকান থেকে একটু সরে একটা পুকুর, তারই একদিকের ঘাটে বসেছিল টগর; দুজনে পাশাপাশি বসে রইল একটু। তারপর টগরই কথা কইল—দুবছর আগের সেই শেষ কথা—"আমিই তোকে তাড়ালাম বৌ…আমি না থাকলে…"

দু'চোখ দিয়ে দরদর ক'রে আবার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। নয়ান মুছিয়ে দিতে দিতে বলল—"চুপ করো ঠাকুরঝি। পৃথিবীতে নিজের কপাল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে সবাই, তুমি করবে কি?"

"নিমিত্ত তো হলাম আমি, এ আপসোস কোথায় রাখি বল্‌?"

"ভালোর নিমিত্ত কি মন্দর নিমিত্ত তা কি ঠিক করে বলতে পার ঠাকুরঝি? …গিয়ে দেখি বাবা মা নেই, একেবারে সব মায়া কাটিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে বেরিয়ে গেচে। গিয়ে পড়লুম তাই সম্পত্তিটা তো রক্ষা হোল।"

"রক্ষা হোতই বৌ। কথাটা চাপা থাকবার নয়, দেখ্ না, একটা দিন বাদ দিয়েই তো পলাশবাটীর গাড়ি এসে পড়ল। বেশ ধীরে সুস্থে মানিয়ে-সানিয়ে হোত ব্যবস্থাটা…"

"তোমাদের বৌ কিন্তু মানিয়ে-সানিয়ে থাকতে পারত ততদিন? সেই কথাটা ভেবে দেখো না ঠাকুরঝি। মনে ক'রে দেখো না, কী সামান্য কথা—কিনা শ্বশুরবাড়িতে ঘোমটা দিয়ে থাকতে হবে—চিরকাল যেটা হয়ে আসচে—তা মরতে এমন জিদ এসে গেলো মাথায়…"

দোষ নিজের গায়ে মাথা নিয়ে যেন রেষারেষি পড়ে গেছে, টগর কথাটা উল্টে নিয়ে, হেসে একটু হালকাও ক'রে নিয়ে বলল—"থাক্ সেসব। তোর কথায়, যদি ভালোর নিমিত্তই হয়ে থাকি তো ভালোই, কপালে যশ লেখা ছিল।…কিন্তু আবার এ কি শুনচি, ভাবনার কথা যে…"

নয়ান একটু চকিত হয়েই ফিরে চাইল, প্রশ্ন করল—"কি?"

"দাদা বলছিল। বলে—বৌয়ের আবার সেইরকম উড়ু উড়ু ভাব হয়েচে; আসবে, তুই একটু বুঝিয়ে বলিস টগী।…তা সত্যি, সব শুনলাম তো দাদার কাছে, অমন একটা অসুখ গেল—যমে মানুষে টানাটানি বললেই চলে, তার ওপর অমন একটা সর্বনাশ হয়ে গেল—দু'দুটো ধকোল, শরীরের অবস্থা তো দেখচি, এ সময় এভাবে বেরুনো, এই বোশেখ মাস…"

প্রায় তিরস্কারের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

অনেকখানি বলে যাওয়ায় এদিকে একটা উত্তরও গ'ড়ে নেওয়ার সময় পেয়েছে নয়ান, আর বেশ ভালো উত্তরই। যে উদ্দেশ্যে আসা তার কথাটা বেশ এনে ফেলা যায়; একটু হেসে বলল—"ভাই সে বোনের কাছে যতই নালিশ করুক, স্বভাব পাল্টাতে পারবে ভাজের?…চিরকালের উড়ুক্কু মন, এতদিন ভাইকে নিয়ে উড়ে ছিল, আজ তার বোনের জন্যে আবার উড়ে এসেচে…"

টগর এবার চকিত হয়ে ফিরে চাইল, প্রশ্ন করল—"কি রকম?"

"কাকের মুখে খবর পেলুম, তুমি মার সঙ্গে এখানে এসেচ।"

একটু থেমে মুখের ওপর চটুল দৃষ্টি তুলে বলল—"চেনা কাক্, থুড়ি, চেনা কোকিল।"

চোখে-চোখে মিলতে টগর একটু ভ্যাবাচাকা খেয়েই দৃষ্টি নত করল। নয়ান দুটি হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি হাত ধ'রে নিল, বলল—"বেশি সময়

হাতে নেই ভাই, আরতিটুকু পজ্জন্ত তো।·· সবার কাছে লুকিয়ে এসেচ, কিন্তু নয়ান-বৌয়ের কাছে লুকুতে পার নি; আমার কাছে পাকা দলিল-দস্তাবেজ রয়েচে। ঠাকুরপোরও মন জেনেচি, অবিশ্যি যার জানা দরকার সে আগে থাকতেই আমার চেয়ে ভালো ক'রে জেনে নিয়েচে, এখন যা করতে উড়ে এসেচি···"

"কি করতে?"—আবার একটু চকিত হয়ে চাইল টগর।

"আমি এসেচি মন্দিরতলার ঋণ শোধ দিতে।"

"সে আবার কি?"

"দেখো, আবার ন্যাকা সাজে! তিন বছর আগের কথা। একজন এই মন্দিরতলায় একদিন একজনকে দাঁড় করিয়ে আমায় একটা চালার মধ্যে থেকে বের ক'রে নিয়ে এল; বলল—'দাদা, তোমায় প্রণাম করতে এসেচে।' সেই ঋণটি শোধ করব; সেটা ছিল রাস-পূর্ণিমা, এটা বোশেখী-পূর্ণিমা।··· চালাটা দেখলুম, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েচে।"

মুখ তুলেই শুনছিল টগর, একটু ভয় ফুটে উঠেছে দৃষ্টিতে, প্রশ্ন করল—"বুঝলুম না। না, না,···বুঝেচি, কিন্তু—কিন্তু সে আমি পারব না বৌ, কোন মতেই নয়।"

"তোমায় পারতে হবেও না তো। বৌ ছিল অজানা-অচেনা, দূতালি ক'রে ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। এ তো কাজ এগিয়ে রয়েচে, এখন শুধু শ্যামরায়ের সামনে—দাদা আর বৌ যেমন ক'রেছিল···"

টগর স্পষ্টই শঙ্কিত হয়ে উঠল, বলল—"বাবা! তা কি ক'রে হবে? তোর সাহস কম নয় তো!"

ভয় পেয়ে যেন একটা দোষারোপ করার ভাব। নয়ানও গম্ভীর হয়ে গেল, প্রশ্ন করল—"তাহলে এমন কাজে নেমেছিলে কেন ঠাকুরঝি—একজনের জীবন নিয়ে খেলা? ··খোলামকুচি, না?"

টগর মাথা হেঁট করে রইল। একটু চুপচাপ, তারপর নয়ান তাগাদা দিল—"সময় নেই ঠাকুরঝি। এও বলি,—উপায়ও নেই।"

মুখ তুলল টগর, সভয় প্রশ্ন করল—"তারপর?"

"তারপর আর কি?—ঐ তো শেষ।"

"পরিণাম?"

"ধং নয়ানের করেচ!"

টগর একটু চুপ করল, তারপর যেন না বললেই নয় এইভাবে একটু স্খলিতকণ্ঠে বলল—"ভালো হয়েচে পরিণাম ?"

এবার নয়ান একটু চুপ করল, ভেবে নিয়ে বলল—"পরিণাম ভালো হোল কি মন্দ হোল সেটা তো একেবারে শেষের দিকে ভেন্ন বোঝবার উপায় নেই ঠাকুরঝি…"

কতকটা যেন অন্যমনস্ক হয়েই কথাটা ব'লে নয়ান আবার সচেতন হয়ে উঠল, বলল, "ঠিক তাও নয়। কথাটা কি জান ঠাকুরঝি, বোষ্টমরা আমরা হচ্চি সব রাধা-প্যায়ারীর জাত, অত পরিণাম ভেবে কাজ করতে গেলে আমাদের পরিণামে শুধু জাত খোয়ানো ভেন্ন আর কিছু থাকে না। বাঁশির সুরে যদি কান দিলুম তো আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে ভালো-মন্দ সব কিছুর কথা ছেড়ে।…পরিণামের কথা একেবারেই গোড়ায় ভাবা উচিত ছিল, একবার যখন শুনেচ কান পেতে, বুকের মধ্যে যখন ভরে নিয়েচ তার সুর, তখন আর পরিণামের কথা ভাবলে—বোষ্টমের যা ধর্ম—অর্থাৎ কিনা নিজের প্রাণের তাগিদের ·"

নিজের ঘোরেই বলে যাচ্ছিল নয়ান, অতটা বুঝতে পারে নি। টগর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে শুনছিল, একেবারে দু'হাতে মুখ ঢেকে নয়ানের কোলে মাথা গুঁজড়ে পড়ল। কান্না নেমেছিল নীরবে, আর সামলাতে পারল না।

নয়ান মাথাটা চেপে চুপ ক'রে বসে রইল খানিকক্ষণ। সান্ত্বনা দেবে না, এ কান্না যেন একটু কেঁদে যাওয়াই দরকার। তারপর হাতটা মাথার ওপর আস্তে আস্তে টেনে দিতে দিতে বলল—"চুপ করো ঠাকুরঝি। শুধু তো এইটুকুই নয়, আরও কথা যে আচে সেটা কি আমি বুঝি না ? বুঝি। সে-সম্বন্ধে একটা কিছু না ঠিক ক'রে কি আমি এ কাজে নেমেচি ?—শত্রু নয় তো তোমার। শ্বশুর-শাশুড়ীকে তো চিনি, সত্য পরিণাম যে কি হবে তা তো বুঝতেই পারি। যার জন্যে ঘরের বৌকে তাড়াতে বাধল না তাকে নিজের ঘরে বরণ করে তোলা। বুঝি সব, ভেবেচিও, তবে মনে হয় তার একটা ওষুধও খুঁজে পেয়েচি—মুঠোর মধ্যেই রয়েচে আমার…"

সবটা বলা এখন ঠিক হবে কিনা আবার একটু ভেবে নিল নয়ান।… উৎকণ্ঠার মধ্যে টগরের কান্নাটা যেন একটু নরম হয়েছে। কি ওষুধ সে কথাটা একেবারেই ধোঁয়াটে রাখলে চলবে না, মাঝামাঝি একটা ঠিক ক'রে নিয়ে ইঙ্গিতের আকারে বলল—"গুরুজন, বলা উচিত নয়, তবে ওঁদের একটু লোভ

আছে ঠাকুরঝি—বিশেষ করে শাশুড়ীর তো আছেই। বাবা-মা চলে যেতে পলাশবাটী থেকে তাঁদের সব জিনিসপত্র যখন পাঠিয়ে দেওয়া হয়—মন্দিরের পুরুত আমার গোঁসাই-দাদুই দিয়েছিলেন—তা সেসব জিনিস আর ফিরে যায় নি। লোভটা কার বেশি তা তুমিই জানো, তবে যারই হোক আমি তত দোষ দিই নে, বিষয়ী মানুষ তো। আমি সেই লোভের জোগান দোব···”

আর একটু চুপ করে থেকে বলল—“জানি এতেও বোধ হয় সমিস্তেটা মেটে না; ঠাকুরপোর ওপর রাগটা কত বেশি জানি তো। কিন্তু সে-রাগটা যাতে না থাকে বা কমে তার উপায়ও করব আমি, যখন নেমেচি এ কাজে।”

এইটেই সবচেয়ে বড় সমস্যা তো তার এই জীবন-মরণের ব্যাপারে; একটু সুস্থিরও হয়েচে, টগর কোলের মধ্যে মুখটা চেপেই প্রশ্ন করল—“কি ক’রে বৌ?”

“পুরোপুরি ভেবে উঠতে পারি নি অবিশ্যি। তবে কি জানো ঠাকুরঝি? —আমরা হচ্চি সেই মেয়ে যারা শতছিদ্র একেবারে ঝাঁঝ্‌রি কলসীর জল বন্ধ করিয়ে শ্যামরায়কে দিয়ে শ্রীমতীর কলঙ্ক-ভঞ্জন করিয়েচি। যেখানে একেবারে শুদ্ধ নিয়ে কারবার ঠাকুরঝি সেখানে ভয়টা কিসের? ঠাকুরপো যে কত ভালো, কত নিদাগ তা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি।···আমার সাহস আচে ষোল আনাই, ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও—একেবারে নিশ্চিন্দি হয়েই দাও ছেড়ে। তারপর···”

আরতির দিকে কান পেতেই কথা হচ্ছিল, কাঁসরঘণ্টা থেমে গেল। নয়ান একটু চঞ্চল হ’য়ে উঠল। বলল—“আর সময় নেই ঠাকুরঝি, সাঁটে প্রায় সব কথাই তো বললুম।···কাল আর আমি নয়, ঠাকুরপো আসবে এই সময়···”

টগর চকিত হয়ে মুখ তুলল, “কিন্তু আজই শেষদিন যে এখানে আমাদের···”

“ও! আসল কথাই বলতে ভুলে গেচি। কাল শিউড়ির পদ্মমণির দলের গাওনা—একদিনেই আমাদের কাজ সাঙ্গ হবে না—পরশুও ব্যবস্থা করেচি—মোহান্তকে দিয়ে আজকের আরতির পরই সবাইকে কথাটা শুনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েচে, এতক্ষণ সাড়া পড়েও গিয়ে থাকবে, ঘোষাল-গিন্নী হুজুগে—তোমরাও ধোর’ আবদার একটু, তারপর···”

মন্দিরের ওদিক থেকে ভিড় চারিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল নয়ান, বলল—“আমি এদিক দিয়েই চলে যাচ্চি, ওঠো গিয়ে ঘরে।···দাঁড়াও —একটুখানি।”

তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে পুকুর থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে এসে, কিছু বোঝবার আগেই টগরের মাথায় চাপড়ে দিল। টগর বিস্মিত হয়ে বলল—"এ কি কাণ্ড!"

নয়ান হেসে বলল, "আমরা চতুরা সহেলী, কত চাতুরালী! মাথা-ব্যথার চোটে পুকুরে এসে জল চাপড়াতে হবে না!…যাও, এ মানুষ সব সামলাতে পারবে ব'লে হোল ভরসা?"

এত সুখ, এত আনন্দকে, আনন্দ বলে যেন বিশ্বাসই করা যায় না, যেন কত বড এক দুঃখ-বেদনা ছদ্মবেশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে আবার সেই অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠল নয়ান। দূরে মন্দিরতলার কাছাকাছি থেকে বাঁশির সুর আসচে ভেসে, যে-বাঁশির সুরে কান ভরে নিয়ে একদিন নয়ানও ভালমন্দ সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল নিজেকে অর্ঘ্য ক'রে সাজিয়ে। এক যুগ যেন চলে গেছে কত বিরহের মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত ব্যথা নিয়ে, বাঁশি আবার কান্নার সুরে আকুল হয়ে উঠেছে।…নয়ান জানে কোথায়! মন্দিরতলা থেকে খানিকটা এদিকে, এই রাস্তারই গায়ে খানিকটা মাঠে নেমে একটা অল্প উঁচু ডিহি, বুনো কুলগাছ হলদে অমূল-লতার বেড়া-পাকে ঘেরা, তারই পাশে · তিন বৎসরের ওদিকে একটি অবিস্মরণীয় রাত…

বাঁশির কান্নায় ভরে আসছে কান। নিঝুম হয়ে শুয়ে আছে নয়ান—যাবে কি যাবে না?…এত লোকের মাঝখান থেকে যায়ই বা কি ক'রে?…কিন্তু সহ্যও যে হয় না আর! নয়ান উঠল সন্তর্পণে। পাশেই বিন্দু, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দুষ্টুমির তন্দ্রাজড়িমার মধ্যে থেকে বলল—"আর কতো কাঁদাবে বেচারীকে?"

রগের কাছে ছোট্ট একটা ঠোনা মেরে সন্তর্পণে সবার মাঝখান থেকে উঠে পড়ল নয়ান।

লজ্জা নয়, সঙ্কোচ নয়; ঘন ঘোর, দামিনী-দমকিত শ্রাবণ রজনীর অন্তরাল নেই, বোশেখী-পূর্ণিমার নিরাভরণ, নগ্ন জ্যোৎস্নার মাঝখান দিয়ে চলল নয়ান তার অভিসারে।…পথের ধারে কি একটা বুনো ফুলের গাছ, জ্যোৎস্নার মত সাদা ফুলে আলো করা—সরু, একটু দীর্ঘ-ছন্দ, কড়া-মিঠে গন্ধ একটা—গোটা-কতক গুচ্ছ তুলে নয়ান খোঁপায় নিল গুঁজে…

চৌত্রিশ

একেবারে সকালেই বেরিয়ে যাওয়া হোল না বিন্দুর। এত বড় একটা যোগাযোগ, সেটাকে পূর্ণভাবে যদি নিজের উদ্দেশ্যে না লাগিয়ে যদি তাড়াতাড়ি আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে তো সে আপসোস জীবনে মিটবে? মুস্কিল হয়েছে, লালন বাবাজীর আখড়া একেবারে খোলা মাঠ, এতটুকু প্রচ্ছন্নতা নেই কোনখানে, সুযোগ খুঁজে বের করতে সময় নিল···বিন্দু বেরুল খাওয়া-দাওয়া সেরে, সবাই যখন দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় একটু গা ঢেলে দিয়েছে।

নিদ্রা ভেঙে যেতে বিন্দুর একটু খোঁজ পড়ল, নয়ান বলল—"যাবে কোথায়? এগিয়েই গেছে নিশ্চয় মন্দিরতলায়। টো টো ক'রে বেড়ানো অব্যেস, পা চুলকোয় তো।"

অনঙ্গ আগে থেকে উঠে হাঁটু মুড়ে উল্টো দিকে মুখ করে চাতালটার ওপর বসে ছিল, ঘুরে চাইল। কড়া দৃষ্টি নয়, তবে নয়ানের বোধ হোল একটু যেন কি রকম।

পূর্ব দিনের মতো গাড়ি করেই যাবে মেয়ের দল, সন্ধ্যার একটুআগে প্রসাদ গিয়ে একটা ছৈ-ওলা গাড়ি ঠিক ক'রে নিয়ে এল।

নয়ান পদ্মমণিকে বলল—"আমিও এদের সঙ্গে হেঁটেই আসচি ভাই; আপনারা এগোন্, আবার আসর দেখেশুনে নেওয়া আচে।"

পদ্মমণি উদ্দেশ্যটা যে-রকম আন্দাজ করল তাতে একটু মুখ টিপে হেসে বলল—"কেউ সঙ্গে আসবে না?"

প্রসাদ আর ভূষণকে উদ্দেশ করে বলল—"ওঁরা দুজন তো আসতে পারেন।"

নয়ানও একটু মুখ ঘুরিয়ে হেসে বলল—"পুরুষ একজন থাকা নেহাৎ দরকার হয়, আপনাদের কুটুমকে ছেড়ে দিতে পারি।" দু' পক্ষের একটু মুখটিপে হাসির মধ্যে গাড়ি এগিয়ে গেল।

ভূষণকে দরকার ছিল নয়ানের, টগরের কথাটা তো বলবার সুবিধা হয়নি; একটু পরেই গিয়ে দেখা করতে হবে। গোপনে কথা কইবার উপায় নেই। তার প্রয়োজনও নেই, আর সময়ও নেই, কেননা এবার তো অনঙ্গকে সব জানাতেই হবে। যাওয়ার সময় নয়ান ভূষণকেই সাথী ক'রে নিল, বেমানানও

হোল না, বরং এইটেই মানানসই। হাত তিন-চারের আগুপিছু হয়ে চলল সবাই। খানিকটা গিয়ে নয়ান বলল—"পেসাদকাকাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি চলতে পারবো না ঠাকুরপো···তাহলে তোমরা তিনজনে······"

অনঙ্গ বাধা দিয়ে বলল—"আমরাও তোদের ল্যাং-বোটের মতন টেনে নিয়ে যেতে পারব না ; এগুচ্চি, আয়।"

নয়ান ভূষণের দিকে একটু আড়ে চেয়ে হেসে বলল—"দাদার বুদ্ধি যে একেবারে নেই তা নয়। · একটা কথা আচে ঠাকুরপো ·····"

আরম্ভ করে দিল। পলাশবাটীতে একদিন একটু দিয়েই ছিল ইঙ্গিত ; কি থেকে তার সন্দেহ, তারপর কি ক'রে সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে ; তারপর কি উদ্দেশ্যে ফেরা নয়ানের, কালকে দেখা করে কি কথা হোল টগরের সঙ্গে, কি ঠিক হোল, সব এক এক ক'রে বলে গেল। তন্ময় হয়ে বলে চলেছে, একবার চোখ তুলে দেখল ওরা দুজনে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।···সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল, আজ চাঁদ উঠবে এক দণ্ড বাদ দিয়ে, খানিক পরে ভূষণ চোখ তুলে দেখে নিয়ে বলল—"একটু পা চালাতে হবে বৌদি, ওদের আর দেখা যাচ্চে না।"

ওরা যতক্ষণে পৌঁছাল, ততক্ষণে আসর তোয়ের হয়ে গেছে, পদ্মমণি গড়িমসি করে ওদের জন্য অপেক্ষাই করছিল। জিরেনের সবাই রয়েছে, একেবারে দেখতার হয়ে বসলে এদের চলবে না, একটা একটু আড়ালে জায়গা ঠিক হয়েছে। প্রসাদও একটা সাঙ্কেতিক জায়গায় অপেক্ষা করছিল, এরা এলেই গিয়ে খবর দেবে পদ্মমণিকে, একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"কুটুম এলেন না ?"

নয়ানও একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"আসেনি তোমার সঙ্গে ?"

"বললে তুমি এগোও কাকা, আমি ওদের সঙ্গেই আসচি, পা-টা ভেরে গেচে। ব'লে মাঝ রাস্তাতেই সেই সাঁকোটার ওপর বসে পড়ল সে।"

নয়ানের সমস্ত শরীর থেকে রক্ত যেন নেমে গেল। তখুনি কিন্তু সামলে নিয়ে বলে উঠল—"ও! হয়েচে। ওর যে এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল। একটু ঘুরে আসবে। তুমি যাও, পদ্মমণিকে আরম্ভ করে দিতে বলগে। আমরা সবাই সেইখানে বসিগে।···আর শোন।"

প্রসাদ চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াতে বলল—"তুমি আসরেই থাকবে বরাবর, উঠে এসো না। যদি কিছু দরকার হয় ওদের······"

প্রসাদ চলে যেতে ভূষণকে বলল—"এবার তুমি যাও। আস্তে আস্তে

কাছাকাছি কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো, তারপর গৌরচন্দ্রিকাটা আরম্ভ হোলে গিয়ে উঠবে। ঠাকুরঝি আসবে ঐ সময়টায়। যেমন বলেচি কিন্তু মনে থাকা চাই।"

গৌরচন্দ্রিকা ওঠার পরও নয়ান সাঙ্কেতিক জায়গাটায় কিছুক্ষণ রইল ব'সে; প্রসাদই তো, কিছু ভেবে যদি পড়ে এসে, কিম্বা যদি কিছু দরকারই হয়ে পড়ে। ...ইচ্ছে করছে না আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতো ছটফট করছে মনটা, তবু আধ ঘণ্টাটাক কোন রকমে দাঁতে দাঁত চেপে রইল ব'সে, তারপর উঠে সোজা লালন বাবাজীর আখড়ার রাস্তা ধরল।

সেই চিরপরিচিত বুনো কুল আর আলোক-লতার ডিহি। জ্যোৎস্না বেশ উঠে গেছে, অনঙ্গ পিছন ফিরে বসেছিল, ছায়ার মতো পড়তে একটু চমকে বলল—"কে?"

ঘুরে নজর পড়তেই প্রশ্ন করল—"চলে এলি যে!"

নয়ান পাশে, আজ একটু যেন তফাৎ হয়েই বসল—প্রতি-প্রশ্ন করল—"তুমি গেলে না যে গোসাঁই?"

অনঙ্গ একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর ওর দিকে না ফিরেই প্রশ্ন করল—"আর ক্ষতি আচে সেজন্যে?"

নয়ানের সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে উঠল, ঘুরে সোজাসুজি চেয়ে বলল—"আর ক্ষতি মানে! · এতদিন তুমি সঙ্গে না থাকলে ক্ষতি হোত, আজ আর হবে না? ··তার মানে কি গোসাঁই? বলো পষ্ট করে—বলতে হবে।"

অনঙ্গও ঘুরে মুখে সোজা দৃষ্টি তুলে বলল—"না বললে পষ্ট হবে না তো শোন্...বিন্দুকে সরিয়ে দিলি কেন? সহ্যি হোল না?"

"কে বলে আমি সরিয়েচি?"

"বিন্দু বলেচে।"

সমস্ত দেহটা যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে, মুহূর্ত কয়েক শুধু মুখের পানে চেয়ে রইল—চোখ দুটো ভয়ে-বিস্ময়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তারপর আস্তে আস্তে বলল—যেন পরাভবে কণ্ঠ এলিয়ে এসেছে—"বিন্দী যাওয়ার সময়ও বিষ ঢেলে যেতে ছাড়ল না খানিকটা!...হ্যাঁ, আমি সরিয়েচি, সত্যিই কথাগুলো ওর সহ্যি হচ্ছিল না—কেউই পারে না সহ্যি করতে—শুনতে তো তুমিও, তা একদিনও যদি একটু প্রতিবাদ বা আপত্তির মতো কিছু শুনতুম তোমার মুখে—অন্তত একটু হেসে উড়িয়ে দিতেও দেখতুম..."

"মিথ্যে—যে হেসে উড়িয়ে দোব ?"

নয়ান যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল—

"ও গোসাঁই !···বলতে পারলে তুমি এ-কথা ?—আমার মুখের পানে চেয়ে ?"

"চোখে দেখেও বিশ্বাস করব না ?"

"কী চোখে দেখেচ গোসাঁই ? এ তিন বছরে আর কিছুই কি চোখে পড়েনি যা তোমার এসব ভুল সঙ্গে সঙ্গেই দিত ভেঙে ? বলো না, বলো।"

"যেখানে ভুল মনে করেছিলুম নিজ হাতেই ভেঙে দিয়েচি।···মনে করে দেখ্‌ না।"

পড়ে মনে, তার জন্য খুব বেশি চেষ্টাও যে করতে হয় না নয়ানকে ; একদিন বারুণীর তীরে, এইরকম একটি জ্যোস্নাদীপ্ত রজনী—অনঙ্গ কুমারবাহাদুরের জন্য তুলে রাখা মালা নয়ানের খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বলল—"কোন দোষ নেই বৌ, দোষ ভাবলেই দোষ।" সেই ভুল-ভাঙা, সেই বিশ্বাস বুকে করেই তো এত ঘাত-প্রতিঘাত আজ পর্যন্ত কাটিয়ে এল, সে কি ভোলবার ? স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে নয়ান ; বুকটা একটা অব্যক্ত বেদনায় যেন এবার ভেঙেচুরে খান খান হয়ে যাবে। হাত দিয়েই চেপে ধ'রে ক্লিষ্ট স্বরে বলল—"মনে আচে গোসাঁই, নয়ান অত সহজে ভোলে না।···কিন্তু আজ কি হোল ? সেই নয়ানই তো।"

"কিন্তু সেদিন যার ছিল···"

আরও আকুল আর্তনাদ করে উঠতে মাঝখানেই থেমে গেল অনঙ্গ। নয়ান তার গায়ে মাথাটা লুটিয়ে বলে চলল—"আজও তারই আচে গোসাঁই —তোমার নয়ানের এক কণাও অন্য কারুর নয়—ও গোসাঁই, তুমি আর কিছুই দেখলে না—শুধু বিন্দুর কথায়—বিন্দু গোসাঁই !—সে যে কী তা জানো—শুধু জানলে না—কী সর্বনাশের ফন্দি নিয়ে সে কি-ভাবে লেগে রয়েচে তোমার-আমার পেছনে···তার কথায় ভুলে···তার চক্রান্তে প'ড়ে······"

একেবারে রূঢ় না হলেও একটু শক্ত হয়েই অনঙ্গ নয়ানের মাথাটা তুলে দিলে। বলল—"শুধু কথায় ভুলে নয় বৌ ·"

স্পষ্ট প্রত্যাখান। মাথা গুঁজে নয়ানের চোখে বোধ হয় অশ্রু ঠেলে আসছিল ; অপমানে, নিরাশায় যেন এক মুহূর্তেই গেল শুকিয়ে। ব্যবধানটা বেশ স্পষ্ট করে দিয়ে আর একটু স'রে বসল। চোখ দুটো জ্বলছে,

নাকের প্রান্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে। কথা কইতে পারছে না বলেই কিছু বলল না।

অনঙ্গও বেশ কড়া হয়েই বলল—"শুধু কথায় ভুলে নয়। কথা শুধু প্রমাণটাতে জোর দিয়েছে · ···"

"প্রমাণ !!"

তারপর হঠাতই শান্ত হয়ে গেল নয়ান। চোখের দৃষ্টি গেল বদলে—একেবারে সর্বহারার দৃষ্টি—সর্বহারা বলাও ঠিক নয়, যে চরমে এসে সব বিসর্জন দেবে বলে ঠিক করে বসেছে—নিজের হাতে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে! শান্ত কণ্ঠে বলল—"কি প্রমাণ গোসাঁই !···আচ্ছা থাক্, আগে বলো কি বলেচে বিন্দু তোমায়, কিসের জন্যে তাকে সরিয়েচি ব'লে গেচে ?"

"ও কিছু বলে নি। আমার নিজের আন্দাজ..."

"কি সেটা ?···বলো, বলো না।"

তাগাদাতেও মুখ দিয়ে বের করতে একটু দেরিই হোল, অনঙ্গ বলল—"ভূষণ আসতে · ···"

থেমে গেল। বোধহয় খুব একটা উগ্র বিস্ময় দেখবে নয়ানের দৃষ্টিতে ফুটে উঠতে এইভাবে রইল চেয়ে। নয়ান সেই রকম কণ্ঠেই পূরণ করে দিল—"ঠাকুরপো আসতে দিলুম সরিয়ে।···হুঁঃ! 'বললেই যদি, বিষ ঢেলেই গেল তো একেবারে সবটুকুই গেল না কেন ঢেলে ?···যার জন্যে বিন্দুকে পাঠিয়েচি তার সামনে ঠাকুরপো এমন কি গোসাঁই ?···আমি বিন্দুকে পাঠিয়েচি মৈনেতে—কুমারবাহাদুরকে খবর দিতে আমরা এখানে।···উঠি গোসাঁই।"

উঠতে যাবে অনঙ্গ কড়া হাতে বাঁ হাতটা ধরে ফেলল, বলল—"বোস্ বৌ। ভাঁওতা নয়, 'থাক্' বলে প্রমাণটার কথা এড়িয়ে যাবি তাও হবে না।···কুমার-বাহাদুর নয়, ভূষণই। কুমারবাহাদুরকে ভালো করে না জানলে সেদিন অতবড় ভরসার কথাটা বেরুত না আমার মুখ দিয়ে। তুই কি বুঝবি আমার জ্বালা ? ···বল্, এ প্রমাণের সামনে তুই আর আমায় কত ভাঁওতা দিবি ? · অবিশ্যি এর চেয়েও বড় প্রমাণ—তুই আজ নিজে মরেও ভূষণকে চাইচিস বাঁচাতে··· কুমারবাহাদুরের কলঙ্কটা ইচ্ছে ক'রে মাথায় তুলে নিয়ে।···এই দেখ্।"

অন্য হাতটা পকেটে সাঁদ করিয়ে দিয়েছিলঃ একটা ছোট্ট চিরকুট। জ্যোৎস্নার আলোয় পড়া যায় না, কিন্তু চেনা যায়।···"রাগ পড়ল ? এদিকে সব ঠিক।"

যত্ন করে রেখে দিয়েছিল নয়ান। টগরের হুকুমে ভূষণ দিয়েছিল লিখে। আজ যার জন্য নয়ান এখানে এসেছে, যা-কিছু যাচ্ছে করতে তা এটুকুর জোরেই —এইটুকু তো ওরই প্রমাণ যে ভূষণ টগরের আজ্ঞাধীন। বাইরের বিরূপতা শুধু লোক-দেখানো—ভেতরে বইছে নিবিড় অন্তরঙ্গতার ফল্গু।

কিন্তু আর স্পৃহা নেই। আজ দীর্ঘ তিন বছরের তিল তিল করে সঞ্চিত ভালোবাসা, তার মোহ, অলীকতার সঙ্গে তার বিক্ষোভ আর ক্লান্তি নিয়ে চলে গেছে। দরকার কি আর ভাঙা স্বপ্ন জোড়া দেওয়ার জন্য আবার ঘুমের ঘোরকে ডেকে আনা?

স্থির দৃষ্টিতে চিরকুটটুকুর দিকে চেয়ে ছিল নয়ান। অব্যর্থ প্রমাণের বিজয় গৌরবে অনঙ্গ তার নত দৃষ্টির দিকে চেয়ে শ্লেষ নিক্ষেপ করল—"বল্, আর কিছু আচে বলবার?"

নয়ান দৃষ্টি তুলে ওর মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল একটু। তারপর হঠাতই দুহাতে মুখ ঢেকে—আর অনঙ্গর কোলে নয়—নিজের বুকেই মাথা গুঁজে হু-হু করে কেঁদে উঠল—"না গোসাঁই—না, না, আর কিছু বলব না—একেবারে কিছু নয়—শুধু এইটুকু যে একদিন নিজেই টের পাবে—নিজের উত্তুর নিজেই দেবে তুমি—তারও উত্তুর চাইবে নয়ানের কাছে, খুঁজবে তাকে, কিন্তু তখন আর···উঃ! উঃ! বাবাগো, আর সয় না যে!"

উগ্র, অসহ্য বেদনার উচ্ছ্বাসেই উঠে প'ড়ে ওদের প্রথম মিলনের কুঞ্জ থেকে অন্তিম প্রত্যাখানের বিদায় নিয়ে নেমে গেল নয়ান।

পঁয়ত্রিশ

উত্তর পেয়েছিল অনঙ্গ; খুঁজতে বেরিয়েও ছিল।

রাত্রিটা যে কোথা দিয়ে কি ক'রে গেল কেটে, সংলগ্নভাবে কিছুই মনে নেই। অসহ্য একটা বিষের জ্বালা—সেই যে দুপুরবেলায় বিন্দু আস্তে আস্তে উঠিয়ে কানে ঢেলে দিয়ে গেল—তারই তাড়সে ছটফট করে বেরিয়েছে অনঙ্গ। ···কুলগাছের ডিহিতে ব'সে ছিল।···নয়ান আসে। নয়ান এলেই জ্বালা জুড়ায় —যত তীব্র জ্বালাই হোক, হেসে, কেঁদে, গায়ে প'ড়ে মিটিয়ে দিয়েছে নয়ান, বরাবরই। আজ কি সব হয়ে গেল যেন, বাড়িয়েই দিয়ে গেল জ্বালাটা।

…অনেকক্ষণ ডিহি আগলেই বসেছিল অনঙ্গ, উঠেছে, ঘুরে বেরিয়েছে, আবার এসে বসেছে।…তারপর মন্দিরতলার কোথায় কোথায় যেন ঘুরল।…শ্যামরায়ের মন্দিরের চাতালে অনেকক্ষণ বসেছিল। ঘুমন্ত মেলাযাত্রীদের দল চারিদিকে রয়েছে ছড়িয়ে…স্বপ্নের মতো জ্যোৎস্না। তারপর…তারপর এই এসে ঘাটে বসেছে।

সিরসিরে হাওয়ায় ঘুমটা ভেঙেই আসছিল, কার ডাক কানে যেতে যেন আরও হঠাৎ গেল ভেঙে। পাশে ভূষণ, বলল—"আখড়ায় গেলে না নঙ্গদা! নয়ান-বৌদি কোথায়?…টগরের…"

একটু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল অনঙ্গ। তারপর আস্তে আস্তে বুদ্ধি ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। একটা উদাস নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল—"যায় নি আখড়ায়, না?"

বিস্ময়ে ভূষণের চোখ দুটো কপালে ঠেলে উঠল, বলল—"যাবে কোথায়… একলা একলা! আমরা জানি তোমার সঙ্গে আসবে…ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি কোথায় কে! এমন কিছু ব্যস্ত হয়েও তো আসি নি—জানি দুজনেই রয়েচে। …গেল কোথায় বৌদি? টগরের ঘরে নেই তো?"

উত্তর দিল না অনঙ্গ। কতকটা যেন অন্যমনস্ক হয়ে ফতুয়ার পকেটে ডান হাতটা সাঁদ করিয়ে দিয়েছিল, চিরকুটটা বের ক'রে সামনে ধরে বলল—"এটা তোর হাতেরই লেখা নয়?"

একেবারে থতমত খেয়ে গেল ভূষণ, সম্মোহিতের মতো একদৃষ্টে চিরকুটটার দিকে চেয়ে আমতা আমতা ক'রে কি বলতে যাচ্ছিল, অনঙ্গ হঠাৎ রুক্ষ হয়ে বলে উঠল—"তোরই তো। চিনি না তোর হাতের লেখা আমি?"

"পেলে কোথায়?"—কণ্ঠস্বরটা একেবারে মগ্ন হয়ে গেছে।

"তোর বৌদির বাক্সয়, খরচ বের ক'রে দিতে চাবি দিয়েছিল…কাপড়ের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে পড়ে।"—স্থির দৃষ্টিতে প্রশ্নটা লেগে রয়েছে।

ভয়ের মতো সাহসটাও হঠাতই এসে গেল ভূষণের। নয়ান তো গোড়া-পত্তন করেছেই কাল। তবু একটু গুছিয়ে নিতে হ'ল নিজেকে, বলল—"লেখাটা তো আমারই। বলছিলুম · বলছিলুম—আজ পেলে?"

কথার অভাবেই এমন প্রশ্ন, আরও রুক্ষ হয়ে উঠল অনঙ্গর স্বর, বলল—"সেইটেই বড় কথা হ'ল? কাকে লিখেছিলি? কি ভেবে?"

"লিখেছিলুম…মানে, হ্যাঁ লিখেছিলুম তো আমিই, কিন্তু…"

"থামবি নে অমন ক'রে, বলে যা। কেন লিখেছিলি—নাম লুকিয়ে?"

"টগী লিখিয়েছিল—আমাকে দিয়েই—লিখিয়েছিল নয়ান-বৌদিকেই—তাড়াতাড়ি—পলাশবাটীর গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল গাঁ ছেড়ে। হুকুব কেন?—বসাতে যাচ্ছিলুম নামটা ওর, তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে ছুট্রে চলে গেল। ওখান থেকে গাড়িভর্তি জিনিসগুলো আসাতে কাকা-কাকীমার মনটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেচে তো—সেই কথাই সাঁটে লিখিয়ে দিলে—বৌদির রাগটা যদি প'ড়ে থাকে..."

বলে যাচ্ছে, কথাটার গোপন অংশটা স্পষ্ট হয়ে যেতে বলতে তো আর তত বাধা নেই; কতটা শুনছিল না শুনছিল বলা যায় না, চিরকুটটা হাতে মুড়ে পাকাতে পাকাতে অনঙ্গ হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন ক'রে উঠল—"টগীর চিঠি · তুই যে লিখবি...জানতুম না তো এসব!"

মুখটা হঠাৎ যেন পাঁশুটে হয়ে গেল ভূষণের। কিন্তু আর তো লুকালে চলবে না; দরকারও নেই তো লুকাবার, জড়তা কাটিয়ে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠেই বলল—"কেন, বৌদি তোমায় কিছু বলে নি?"

"না তো।...কি বলবে?"

"সে কি! আর এদিকে যে..."

কি ভাবে, কি ভাষায় বলবে খুঁজে না পেয়ে মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে গেল, তারপর আস্তে আস্তে অন্যদিকে চেয়ে কি সব ভাবতে লাগল।

অনেকক্ষণ গেল চুপচাপ। কারুর কাছে কারুর যেন আর কোন প্রশ্ন নেই, সব উত্তর পাওয়া হয়ে গেছে। এক সময় ভূষণই চমক ভেঙে ভয়ে-উদ্বেগেই বলে উঠল—"তা, হ্যাঁ নন্দদা, কোথায় যাবে বৌদি? একবার না হয় টগীর ঘরেই গিয়ে দেখো...খোঁজ করতে হবে তো। আমি—আমি যাই না হয়, পেসাদকাকাকে ডেকে আনি, ওরা তো জানে—দুজনে আচ, যখন আসবার আসবে।·· ওঠ, দেখে এসো টগীর ঘরটা, আমার তো যাওয়ার জো নেই ··"

"আমারই আচে জো যাওয়ার আর?...নেই ওখানে। আনবি না হয় পেসাদকাকাকে ডেকে? যা।"

খুঁজতে বেরিয়েছিল। অনঙ্গ একা নয়, সবাই। পদ্মমণি গেল কেন্দুবিল্বের দিকে; নয়ান তীর্থে বেরিয়েছিল—কেন্দুবিল্ব হ'য়ে যাবে বৃন্দাবন, মথুরা, আরও দূরে।...ভূষণ গেল জিরেনে—এবার পলাশবাটী-জিরেন এক ক'রে ফেলবার আয়োজন করছিল না নয়ান?

অনঙ্গ ধরল পলাশবাটীর পথ। কারুর সঙ্গ ভালো লাগে না, প্রসাদ জোর করেই রইল সঙ্গে। তার পরদিন সন্ধ্যার মুখে মাঝ-পথেই বিন্দুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নয়ান মৈনের জন্য যে গাড়ির খরচ দিয়েছিল, সেই গাড়িতে আসছিল ফিরে।

বিন্দু নিজে কিছু দেখতে পায় নি। ভিন্ন ভিন্ন মুখে যা শুনেছে তাই বলল—সোনার মুখে, কিছু গোসাঁইঠাকুরের মুখে, কিছু খেয়ার পাটনির মুখে।

কাল সন্ধ্যার সময় নয়ান পলাশবাটীতে গিয়ে পৌঁছাল। সোনা বলে—পৌঁছাল বটে কিন্তু সবই যেন কেমন-কেমন ভাব।··· হ্যাঁগা, তা আর সব কোথায় ? না, তারা আসছে, আমি এগিয়েই এলুম, কতদিন দেখি নি সবাইকে,—আখড়াটা—মেয়েটাকে। আদরে আদরে তো একসা ক'রে দিল মেয়েটাকে। কিন্তু কেমন যেন ছমছমে ভাব। ঘুরল খানিকটা, আখড়ার চারিদিকে, বারুণীর ধারে। তারপর গোসাঁইঠাকুর আসতে মন্দিরে গিয়ে বসল।

বিন্দু গোসাঁইঠাকুরের কাছেও গিয়েছিল, সকালে আর তিনি তো আসেন নি পূজো দিতে, নাতিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মেঝেয় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন, বিন্দু যেতে উঠে বসে বললেন—পূর্ণিমার উপোসটা বড় লেগেছিল। পড়ে আছেন।

কাল সন্ধ্যার পর ঠাকুরঘরে ব'সে শেতল দেওয়ার উজ্জুগ করছেন—মনটা ভালো নেই—এক-একদিন যেমন হয়, রাধারমণ যেন নিতে চাইছেন না পূজো ···বকা অব্যেস তো, একটু অভিমান করেই বলছেন—'তাহলে আমারই বা কি গরজ এত ?' শেষও করেন নি, এমন সময় নয়ান চৌকাঠ ডিঙিয়ে বলল—"আমি এলাম দাদু; দুদিন গেচি, আর অমনি নতুন কার সঙ্গে মান-অভিমানের পালা শুরু হ'ল ?"

গোসাঁইঠাকুর জিগ্যেস করলেন—"তুই কখন্ এলি ?"

"না, আর সবাই গাড়িতে আসচে, আমি নেমে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলুম··· দেখচি যা ভয় করেছিলুম তাই—দাদু হয়েই গেচেন হাতছাড়া।"

গোসাঁইঠাকুর বললেন—"বেশ করেচিস, পূজো প্রায়ই নিতে চাচ্চেন না, তাই বলছিলুম আমারই বা গরজটা কিসের ? নমো নমো ক'রে সেরে উঠে পড়ি।"

নয়ান বলল—"রাধারমণের ভয় নেই দাদু ? নয়ানকে ডেকে পাঠিয়ে একা তোমার হাতের পূজো নিয়ে ফাঁকি দিয়ে যাবেন ?"

আরম্ভ হয়ে গেল নাতনী-ঠাকুরদার কথা কটাকাটি। তারই মধ্যে শেতলের ব্যবস্থা। গোসাঁইঠাকুর বলেন, সে এমন যে সকালের পুজোও সব্‌দিন সেরকম ক'রে হয়ে ওঠে না। নয়ান যেন পূজোর উপোসী হয়ে রয়েছে, আখড়ার যেখানে যা ফুল ফুটেছিল নিয়ে এল তুলে, চন্দন ঘষতে ঘষতে সেই আগেকার মতন গল্প—রাধারমণকে নিয়ে কত কথা. মান-অভিমানে, আর হাসিঠাট্টায়ও। তার সঙ্গে তত্ত্বকথাও। বেশি ক'রে বাঁশি নিয়ে—কোথায় কি ক'রে মাথায় কবে সেঁদিয়ে গিয়েছিল কি অনাহত বংশীধ্বনির কথা—ঘুরে ফিরে সেই কথাতেই আসে ফিরে—'জিনিসটে কি দাদু? কেউ যখন বাজাচ্চে না, কোথাও যখন বাজচে না তখন মনে করলেই তো হ'ল ঐ যেন শুনচি।···উদ্ভট কাণ্ড তোমার রাধারমণের দাদু, একবার দেখা পেলে বাঁশির কেরামতিটা ঘুচিয়ে দিতুম। একরকম? কোন্‌টে মায়া কোন্‌টে সত্যি গুলিয়ে দিয়ে যেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাজেহাল ক'রে দিলেন···তবু এখনও যেন আশ মেটে নি।'···হেসে ওঠে, আড়চোখে চায় রাধারমণের দিকে।···যেমন করে ও।

"হ্যাঁ রে, ওরা এল না এখনও যে?"

নয়ান কাটিয়ে দেয়, বলে—"আসবে, যাবে কোথায়? বলদ দুটোও জুটেচে যে তেমনি, চলে আর দাঁড়িয়ে পড়ে; সাধ ক'রে কি আর নেমে এগিয়ে এলুম?"

গোসাঁইঠাকুর বলেন—"বিন্দু, এই কথাটাই যদি একটু ধরে বসে থাকি, তা রাধারমণের একবার কি পোড়া মনে পড়িয়ে দিতে নেই যে, ওঁর মন্দিরে বসে মিথ্যে বলাটা ও একেবারেই গ্রাহ্য করত না; কথায় কথায় দেমাক দেখিয়ে হেসে বলত—'ও চাতুরালি না হলে যে আমাদের একদণ্ড চলে না দাদু; ভুলচ কেন চতুরশিরোমণির সঙ্গে ঘর করতে হয় আমাদের।'·· ও যে কত চাতুরালি শিখেছিল বিন্দু!"

কথা যেন গলায় আটকে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলেন, "আর, অত অনাহত বংশীধ্বনিরই বা খোঁজ কেন রে বাপু, কচিমুখে বুড়োর কথা!"

বিন্দু এসেছে শুনে শঙ্কর পাটনিও গোসাঁইঠাকুরের ওখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

সোনা কিছু জানে না—সবাই আসবে, হেঁসেল নিয়ে ব্যস্ত—নয়ান নিশ্চয় গোসাঁইঠাকুরের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে। নয়ান এদিকে বারুণীর ধারে গিয়ে

উপস্থিত। উপরোউপরি দুটো ঢল নেমেছে, একেবারে ভরা গাঙ। "শঙ্কর কাকা, পারে যেতে হবে একবার, নৌকা খোল।"·· "সে কি গো! ভরা গাঙ, পহর রাত্তির, তুই একা, পারে যাবি কি? যাবিই বা কোথায়?"—"যাব জিরেনে। একা নয়, পারেই তোমাদের কুটুম আসবে, বোধ হয় এসেও গেচে এতক্ষণ, কথা হয়েচে ওপারে থাকবে, আমি গিয়ে উঠব। না এসে থাকে, তুমি ততক্ষণ একটু থাকবে বসে।" কেমন লাগছে একটু, কিন্তু ঐ কথা—এমন সাজিয়ে বলা, মানুষের মনে কি সন্দেহ হবার জো আছে?···"বেশ, চল তাহলে। একলা হা-পিত্তেস ক'রে থাকবে তো, কুটুম মানুষ।" বিচ্ছিরি গাঙ, বইঠের জোরে নৌকা নিয়ে যাওয়ার জো কি?···লগি না নামিয়ে কোনগতিকে চলল এগিয়ে। ছৈ-এর এদিকে নয়ান রয়েছে ব'সে, গাঁঙের জলে পা দুটো একটু ডুবিয়ে,—নায়ে উঠলেই যেমন করত। মাঝে মাঝে একটু ঝুঁকে পড়ে হাতের তেলোয় জল নিয়ে খেলাও করছে। ছৈ-এর একটু আড়ালেই প'ড়ে গেছে তো, তার ওপর লগি ঠেলতে শঙ্করের মুখটা উল্টো দিকেই, তবু বার দুয়েক ঘুরে ঘুরে বলল—"গাঙ বড্ড বিচ্ছিরি গো—আজ না হয় বাদ দিলিই তোর খেলা।" ··শোনে? বলে—"তুমি বরং পলাশবাটীর গল্প বলো শঙ্কর-কাকা, ক'দিন তো ছিলুম না, আবার এই চলে যাচ্চি।" নিজের খেয়ালে গল্প করতে করতেই নৌকো ঠেলে নিয়ে এসে ঘাটে লাগাল শঙ্কর, ডাকল—"নেমে আয় গো মা এবার।" বলতেই যাচ্ছিল—কৈ, তোকে নিতে তো কেউ আসে নি।—শেষ করতেও হ'ল না, নায়ের গলুইটা জলের তোড়ে গেল ঘুরে—কোথায় কে? লগি নামাবার শব্দের সঙ্গেই কখন নিঃসারে গেছে নেমে। একবারটি যদি হেঁকেও বলে শঙ্করকাকা, চললুম গো!

তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজল সারা দরিয়া, উদ্ধব আর লক্ষ্মণকে ডেকে গাড়ি পেরোবার বড় নৌকোটাও দিল খুলে। নিতে এসেছিল বারুণীই, আর ফিরিয়ে দিল না।

চোখ দুটো মুছতে গিয়ে আরও জলে ভাসিয়ে বিন্দু বলল—"দেয় কখনও? কাদের ভরসায় আর দেবে ফিরিয়ে, কুটুম?"

সমাপ্ত